প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০
প্রকাশক : অমল সাহা
সৃষ্টি প্রকাশন, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯।
প্রচ্ছদ : অশোক মল্লিক
মুদ্রক : নিউ জয়কালী প্রেস
৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬।

'সৃষ্টি'র কথা

উনবিংশ শতাব্দীকে বলা হয বইযের শতক। বিংশ শতাব্দীর গর্ব, তা নাকি ফিল্মের, আর একবিংশ শতাব্দী পূর্বচিহ্নিত হযে রযেছে টেলিভিশনের জন্য। এই বাতাবরণে দাঁড়িযে একটা কথা এখন প্রায স্লোগানে দাঁড়িযে গিযেছে— বই আর কেউ পড়তে চায না। ওটা সেকেলে অভ্যেস। বই পড়ুন, বই পড়ান— পোস্টার নিযে বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীদের পদযাত্রা সেই ভাবনাকেই আরও উসকে দেয।

আমরা কিন্তু এই ভাবনার শরিক নই। আমরা বিশ্বাস করি, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার আগুনে পুড়তে পুড়তেও ফিনিক্স পাখির মতো বেঁচে থাকবে, ডানা মেলে আকাশে উড়বে এবং দিগন্তের মৃত্তিকা স্পর্শ করবে বই। বিদেশে গ্রন্থপাঠের সাম্প্রতিক প্রবণতা আমাদের বিশ্বাসকেই বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করে। এই চিন্তা থেকেই জন্ম সৃষ্টি প্রকাশনের— সৃষ্টি পরিবারের প্রথম সন্তান। জন্মলগ্নেই যে শুনেছে প্রকাশকের কান্না, চোখ খুলেই যে অনুভব করেছে লেখকের হাহাকার। জ্ঞান হওয়ার আগেই যার মনে হযেছে বাংলা প্রকাশন আজ মুমূর্ষু শিল্পের অন্তর্গত।

অথচ এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না। বাংলা ভাষায় সাহিত্যসেবীরা যে বিশ্ববন্দিত সে কথা আজ আর অজানা নয। সেই সুমহান ঐতিহ্যকে মাথায় রেখেই সৃষ্টি প্রকাশন তাদের কাজ শুরু করেছে। আমাদের ব্রত বাংলা প্রকাশনা জগতের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনা। আমরা বিশ্বাস করি, যে জমি একদা সুফলা ছিল তা কখনও বন্ধ্যা হতে পারে না। দরকার যুগোপযোগী সার দিয়ে তাকে উর্বর করে তোলা, যাতে নবীন-প্রবীণ লেখকেরা শুধু তাঁদের সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধ থেকে লেখার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। বাকি দায়িত্ব তো আমাদের। আমরা মনে করি, বাংলা বইয়ের পাঠক ছিল, আছে, থাকবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি যাতে বাংলা প্রকাশনা জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে।

সূচিপত্র

প্রথম গানের প্রেরণা

।। মোহররমের মর্সিয়া ।।

আমার নাম ছিল শৈশবে শ্রী সেখ আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মদ। গ্রামে তথা সমস্ত কুচবিহারে মুসলমান সমাজে এক আন্দোলন উঠল—নামের পূর্বে এই 'সেখ' কথাটা তুলে দিতে হবে। আমার তখন বয়স হবে আট বছর। পরিষ্কার মনে পড়ে আমাদেব মহকুমা তুফানগঞ্জে আমি সেদিন বাবাব সাথে গিয়েছিলাম এক বিরাট সভায় যোগদান কবতে। এক পয়সার কার্টিজ কাগজের শত শত কাগজে সবাই নাম লেখা আরম্ভ করল 'সেখ'টা বাদ দিয়ে শ্রী অমুক বলে—সেই দস্তখতনামা কাগজগুলো দরখাস্তসহ সেখানকার কাছারীতে জমা দেয়া হয়েছিল। এর কারণ তখন বুঝিনি। পরে বুঝেছিলাম যে তখন সাধারণত শিয়া মুসলমানরা নাকি নামের আগে ঐ শব্দটি ব্যবহার করতেন। অতএব আমাদেব সুন্নীদেব এটি পরিত্যাগ করতে হবে। গ্রামে আরও প্রচার হতে লাগল যে এবার যারা মোহররমের সময় বাড়ীতে তাজিয়া তৈরী করবে তাদের সংগে সামাজিকতা চলবে না। আমাদের গ্রামের সমাজে তখন সত্যিই বড় কড়াকড়ি নিয়ম ছিল। ছোটখাট মামলা-মোকদ্দমা আমার বাবা মৌলবী জাফর আলী আহ্‌মদ, বড় মামা ও কুচবিহার মহারাজার নাজিরের বংশধর কুমার গৌরনারায়ণ সিং এঁরাই মীমাংসা করে দিতেন। আমি অতশত বুঝতাম না, তবে মনটা বেশ খারাপ হল এই ভেবে যে গ্রামে আর তাজিয়া দেখতে পাব না। কী অপূর্বভাবে কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে সূক্ষ্ম কারুকার্যের পরিচয় দিত গ্রামের তাজিয়া তৈরী করার দল—এমন সুন্দর জিনিস উঠে যাবে গ্রাম থেকে...আর বন্ধ হয়ে যাবে মোহররমের বাজনা এবং সংগে সংগে মোহররমের জারী।

মোহররমের বাজনা সত্যিই গ্রামে বন্ধ হল কিন্তু ভিন্ গাঁয়ে উঠল কাড়ানাকাড়া শানাইয়ের বাদ্য। তারা যখন আমাদের গ্রামের গঞ্জে দলে দলে এসে বাজনা এবং লাঠিসোটার খেলা দেখাতে লাগল তখন আমাদের গ্রামের যুবকরা যারা সমাজের ভয়ে দল ভেঙেছিল তারাও লুকিয়ে গিয়ে 'ডম্প' (এক রকম ঢোল বাদ্যবিশেষ) নিয়ে দলের সাথে ভিড়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের গ্রামের আশেপাশে প্রায় দশ বারোখানা গ্রামের মোহররমের দল ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

বাড়ী থেকে প্রায় দুই তিন মাইল দূরে সত্য-পীরের গান শুনতে গেলাম একদিন। সেখানে সেই দলের মূল গায়েন গেয়ে উঠল,

ও ভাই আল্লা বলরে রসুলের ভাবনা
দিনে দিনে হইল ফারাজি সিন্নি খাওয়া মানা।।

অবশ্য এ গান শুনেছিলাম মোহররম উপলক্ষ্যে। তাজিয়ে দিয়েছিল কালজানি নদীর ওপারে বিরাটভাবে এক জোতদার। তখনকার দিনে শুনেছি পাঁচ টাকার নাকি গোলমরিচই কিনেছিল সেই মেজমানীতে লোক খাওয়াবার জন্য। গান শুনে আমার মনে হয়েছিল যারা শিয়াদের রীতিনীতি পরিত্যাগ করে খাঁটি সুন্নীমত গ্রহণ করেছিল তাদের উদ্দেশ্য করেই এ গান রচনা। ফারাজি মানে নামাজী , সিন্নি মানে তাজিয়া উপলক্ষ্যে যে সিন্নি বা খাওয়ার আয়োজন করা হয়।

গ্রামের অধিকাংশই ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। তাঁরা রূপান্তরিত হলেন সুন্নী মুসলমানে। কাজেই গান বলতে মর্সিয়া আর মোহররমের বাদ্য গ্রাম থেকে নিল চিরবিদায়।

কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল, আমার গ্রামে ছিল বহু ভাওয়াইয়া গায়ক, সারা গ্রামটা সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত গানের সুরে মুখরিত হয়ে থাকত। বাড়ীর পূর্বে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। আমাদের আধিযারী প্রজারা হাল বাইতে বাইতে পাট নিড়াতে নিড়াতে গাইত ভাওয়াইয়া গান। সেইসব গানের সুরেই আমার মনের নীড়ে বাসা বেঁধেছিল ভাওয়াইয়া গানের পাখী।

ক' ভাবী মোর বঁধুয়া কেমন আছে রে?
তোর বঁধুয়া আছে রে ভালে
দিন কতক কন্যার জ্বর গেইছে রে
ওকি কন্যা চায়া পাঠাইছে জিয়া মাগুর মাছ রে।

এ গানের সুর আমার সমস্ত সত্তায় এনে দিত আলোড়ন। গ্রামের চাষীর কণ্ঠের সুর অবিকল আয়ত্ব করে ফেলতে আমার এক মিনিটও লাগত না। বাড়ী থেকে ছাত্রবৃত্তি স্কুল পায়ে হেঁটে প্রায় বিশ মিনিটের রাস্তা। বাড়ীর আড়াল হয়ে বন্দরে কুঞ্জ পালের দোকান ছাড়লেই ধরতাম সেই গান। ঠিক বন্দরের মুখেই করতাম গান বন্ধ— কারণ সেখানে থাকত লোকজন। এমনিভাবে হঠাৎ দু'একদিন বাবার সামনে পড়ে যেতাম, তিনি হয়ত বন্দর থেকে বাড়ীর দিকে ফিরছেন, আমি চলেছি স্কুলে। কিছুই বলতেন না গান শুনে। একটু হেসে আমার গালে একটা চুমু দিয়ে বলতেন, "ভাত খেয়ে এসেছো তো বাবা, যাও স্কুলে যাও।" আমার মামাদের সামনে পড়ে গিয়েছি অনেকদিন, তার মধ্যে অন্য মামাদের চাইতে বড় মামাই কেবল ধমক দিয়ে বলে উঠতেন, "পাজী ছেলে, মুসলমানের গান গাইতে আছে?" তাই বড় মামাকে বড্ড ভয় করতাম, কিন্তু বাবার মৌন সম্মতি আছে বুঝতে পেরে মামার এই ধমককে কোনো দিনও গ্রাহ্যের মধ্যে আনতাম না।

।। আমার ফুল প্রীতি ।।

গানের মত ফুলও আমি ভালোবাসতাম ছোটবেলা থেকেই। আমাদের বাড়ীর খুব কাছেই পি. ডব্লিউ. ডির ডাকবাংলো। সেখানে গোলাপ, বেলি, গন্ধরাজ ও আরও নানান ফুলের সুন্দর এক বাগান। সেই বাগানে রোজ অতি ভোরে গিয়ে ফুল চুরি করতাম। একদিন মালীর কাছে ধরা পড়ে যাই। মালী বললে, "না বলে ফুল নাও কেন? বরং ফুলের ডাল নিয়ে যাও, বাড়ীতে পুঁতে দিও, ফুল হবে।" খুব ভাল কথা...এমনি করে গড়ে উঠল

আমার বাড়ীতে ফুলের বাগান। দেখতে দেখতে এক বছরের মধ্যে গন্ধরাজ, গোলাপ, বেলি, নানারকম পাতাবাহারে আমার বাগান ভরে উঠল। রোজ ভোরবেলা উঠে তবু ডাকবাংলো থেকে ফুল চুরি করে আনতাম। মালীর কাছে আবার ধরা পড়ে গেলাম। বললে, "দুষ্টু ছেলে, তোমাদের বাগানে তো এখন খুব ফুল ফোটে, আমার এখান থেকে ফুল নিয়ে যাও কেন?" আমি সরলভাবে বললাম, "মালী, আমার নিজের বাগানের ফুল ছিঁড়তে বড় মায়া লাগে।" মালীটা দেখলাম এ কথায় রাগ করল না। সে বলল, "ঠিক কথা খোকা, নিজের বাগানের ফুল ছিঁড়তে বড্ড মায়া লাগে। তবে আমার বাগান থেকে না বলে নিলে সেটা তো চুরি করা হয়। আর ওতে আমারও তো ফুল কমে যায়, আমিও দুঃখ পাই।" আমার এই ফুলের বাগান করা দেখে গ্রামে অনেক সহপাঠী তাদের বাড়ীতে ছোটখাট বাগান করেছিল।

ভোরবেলা বাবার শিয়রের কাছে বেলফুল, গন্ধরাজ রেখে আসতাম। কোনো কোনো দিন মালা গেঁথে মাস্টারমশায়ের জন্য স্কুলে নিয়ে যেতাম। মালাটা মাস্টারকে দিতাম, তিনিও খুব উৎসাহ দিয়ে বলতেন, "যারা ফুল ভালবাসে তাদের মনটা চিরকাল ফুলের মতো নির্মল থাকে।" আজো আমার ফুলের নেশা যায়নি। এ ফুল আমার জীবনে এক পরম কৌতূহলের জিনিস। আমার বাগানে যখন অসংখ্য রজনীগন্ধা ফোটে, তখন তার বর্ণ আমার মনে নিয়ে আসে বিস্ময়। ডালিয়া, যুঁই, শেফালি, গেঁদা সবাই নিয়ে আসে নব নব পুলকের ডালি, নিয়ে আসে ঋতুর আগমনী-বার্তা। গোলাপের কুঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকি...আস্তে আস্তে দিনে দিনে সে কুঁড়ি স্ফুটনোন্মুখ হয়, তারপর যেদিন প্রথম সূর্যোদয়ের মত আমাদের চারিদিকে আলোর দ্যুতি ফেলে সূর্যের আবির্ভাব হয়, গোলাপ ফোঁটার প্রথম মুহূর্তটি ঠিক তেমনি মনে হয় আমার কাছে। ভোরবেলা স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ পাপড়ির দিকে চেয়ে থাকি। চোখের সামনে ফুটে উঠে, মনে হয়, প্রথম সৃষ্টির দিনও বিধাতা পুরুষ আঁধারের দিকে চেয়ে চেয়ে অকস্মাৎ 'কুন' বলার পরে এমনিভাবে আলো-ঝলমল পৃথিবী তাঁর চোখের সামনে জন্মলাভ করেছিল। তাই এই ফুলের দিকে তাকালেই সৃষ্টির রহস্য জাল বুনতে থাকে মনের কোণে। বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি এই ফুল।

ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি হিন্দু ছেলেরা ভোরবেলা উঠে ফুলের ডালি নিয়ে ছোটে এর বাগান ওর বাগান। সাজি ভর্তি করে বাড়ী ফেরে। জিজ্ঞেস করতাম স্কুলে, "তোরা এত ফুল তুলিস ভোরবেলা! কই দু'এক খানা মালা গেঁথে তো মাস্টারমশায়ের জন্য নিয়ে আসতে পারিস?" ওরা বলতো, "দূর বোকা কোথাকার, ফুল দিয়ে মালা গাঁথব কি, বাড়ীতে যে রোজ পুজো হয ফুল দিয়ে?" সে পূজা কল্পনায় ঠাঁই পেত না, পরে স্কুলে যখন সরস্বতী পূজা আরম্ভ করল ছেলেরা তখনই দেখলাম প্রতিমার সামনাটি ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিল একেবারে। কি সুন্দর বড় বড় পদ্মফুল দিয়ে সাজিয়ে দিল প্রতিমার চারধারটা। তারপর দুপুরবেলা ছেলেরা বামুন ঠাকুরের দেখাদেখি ফুল দিয়ে অর্ঘ্য দিতে লাগল সেই প্রতিমার পায়ে।

।। গ্রাম্য যাত্রাদল।।

মনে পড়ছে জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলির কথা। অতি ছোটবেলা থেকে গান-বাজনার ওপর কী নিদারুণ ঝোঁকটাই না ছিল আমার। ভিন্‌গাঁ থেকে যে সমস্ত মোহররমের দল আসত তার বাজনা শুনে তাদের সাথে সাথে আমি চলে যেতাম পাঁচ মাইল সাত মাইল দূরে। আমার বাবা লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে আমাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন। স্কুলে একটা দল করেছিলাম। ছুটির পর একজনের বাড়ীতে গিয়ে সেইখানে কেরোসিনের টিন দিয়ে মোহররমের বাজনার মতো করে বাজাতাম প্রায় বিশ-পঁচিশ জন ছেলে। বয়স আমার যখন বছর দশেক, তখন সেই টিনের কনসার্ট পার্টির সাথে পাটের দাড়ি গোঁফ, বাঁশের তলোয়ার তৈরী করে রীতিমত যাত্রার রাজা, মন্ত্রী সেজে যাত্রার অভিনয় করতাম। শ্রোতা জুটত পাড়ার যত ছেলেমেয়েরা।...যাত্রাগান শোনার জন্যই কি কম কষ্ট করেছি! গ্রামে বড় বড় যাত্রাপার্টি আসত। প্রতি বছর ঠিক শীতের সময়। ভোরবেলা থেকে যাত্রাগান শুরু হবে—রাতে ছটফট করতাম কখন ভোর হবে—কারণ আসরের প্রথম জায়গাটি দখল করে বসা চাই কিনা! বেলা প্রায় দুটোর সময় আসর ভংগ হত। কোথায় ক্ষুধা তৃষ্ণা? সব ভুলে যাত্রার সখিদের গানের সুর যেন গিলতাম! যাত্রার দল চলে যাওয়ার পরেও আমরা আমাদের সখের যাত্রা পার্টিতে গাইতাম,

দাদা, কেবা কার পর কে কার আপন
পথিকে পথিকে পথের আলাপন।।

আমাদের গ্রামে যখন প্রথম থিয়েটার দেখি, তখন আমার বয়স দশ বছর। গ্রামের যুবকরাই সে থিয়েটার করেছিল। তার মধ্যে দু'জনকে বহু বয়স হয়ে লোকান্তরিত হতে দেখেছি। একজনের নাম কালীমোহন চৌধুরী আর এক জনের নাম আইনুদ্দিন। এঁরা অবশ্য পরে আমাদের গ্রামেই রীতিমত যাত্রার দল খুলেছিলেন এবং সে দল সারা কুচবিহার রাজ্যে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সে দলে এক সংগীত মাস্টার নিয়ে আসা হয়েছিল কুচবিহার শহর থেকে। সেই মাস্টার আমার গলা শুনে অবাকই হল। বলল, "এই ছোঁড়াকে পেলে আমাদের দলের ভীষণ নাম হবে।" কিন্তু আমাকে যাত্রার দলে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করবে আমার বাবার কাছে, কার এমন সাহস?

একবার এক যাত্রার দল আমাদের গ্রামে প্রায় দশ বারো পালা গান করে। তাহলে বুঝতে হবে গ্রামে সবাই খুব অবস্থাপন্ন লোক। আসলে তা নয়। তখনকার দিনে যাত্রাগান বাড়ীতে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল একেবারেই অন্য কারণে। ধরুন, কারো বাড়ীতে যাত্রা গান হবে। অধিকারী মশায়ের সাথে ঠিক হল এক পালা গান এক রাত্রির জন্যে পঞ্চাশ টাকা। গৃহস্বামী গ্রামবাসী সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। নিমন্ত্রিত অভ্যাগতেরা গান শুনে কেউ আট আনা, কেউ এক টাকা, কেউ বেশী জোর দু'টাকা দিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেন। তাতে যাত্রার অধিকারীকে পঞ্চাশ টাকা দিয়েও গৃহস্বামীর লাভ দাঁড়াতো কোনো সময় পঞ্চাশ টাকা, কোনো সময় বা একশো টাকা। কাজেই এইভাবে গ্রামে অনেক দিন ধরে এর বাড়ী ওর

বাড়ী গান হত। এইভাবে এক যাত্রার দল গ্রামে দশ-বারো দিন যাত্রার জন্য থেকে যায়। আমার গান শুনে অধিকারী মশাই সত্যি সত্যিই বাবার কাছে এসে প্রস্তাব করল তাঁর ছেলেটিকে যাত্রার দলে দিতে তিনি রাজী আছেন কিনা! গৃহে অতিথি এলে অপমান করতে নেই, তাঁকে যথাযথ অভ্যর্থনা জানিয়ে বাবা বিনীতভাবেই তাঁকে বলেছিলেন, "ছেলে হয়ত ভবিষ্যতে গাইয়ে হবে, কিন্তু তার আগে তাকে উচ্চশিক্ষিত করে তুলতে হবে—সুতরাং...।"

।। প্রথম গ্রামোফোনে গান শোনা ।।

উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে বসে আছি। কোনো কাজ নেই, খাওয়া-দাওয়া আর বিকাল তিনটা বাজতেই ফুটবল নিয়ে মাঠে গিয়ে সেই তিনটার রোদ্দুর থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত শ্রান্তিবিহীন বল খেলা। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, "আব্বাস, তোমাদের বাড়ীতে কলের গানের গান হচ্ছে...." শুনেই ভোঁ দৌড়। তাজ্জব কাণ্ড— চোঙ্গাওয়ালা এক কলের গান থেকে সত্যিই গান বেরুচ্ছে। অবাক হয়ে গেলাম। কী করে একটা বাক্সের ভেতর থেকে গান হয় এ কৌতূহল আর দমন করতে না পেরে লোকটাকে বললাম, "খুলে দেখাও তো ভেতরে কে গান গাইছে?" লোকটা কিন্তু বাড়ী বাড়ী দুই-চারখানা রেকর্ড শুনিয়ে দু'সের এক সের চাউল বা পয়সা যে যা দেয়, তাই নেয়। বললে, "পাঁচ ছ'সের চাউল নিয়ে এসো খোকা, আমি দেখাচ্ছি ভেতরে কে গায়।" মহাউল্লাসে বাড়ীর ভিতরে ছুটলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না রান্নাঘরে। ডেকে হয়রান...মা কোথায়, বোনরা কোথায়! ও খোদা, তারা যে সবাই আমাদের দক্ষিণের ঘরের ভেতর জানালা জুড়ে বসে গান শুনছিল খেয়াল করিনি। মাকে বললাম, "মা পাঁচ-ছ'টালা (চাউল মাপার পাত্র, এক টালায় দেড়সের) চাউল দাও, কলের গানের ভেতরে লোক আছে, সেটাকে খুলে দেখাবে লোকটা।" ....চাউল দিলাম, কিন্তু যন্ত্র খুলে দেখাল, না আছে লোক, না আছে কেউ! বললে লোকটা, "নারে বাবা, ভেতরে লোক নাই, এই যে কুকুর মার্কা প্লেট মানে রেকর্ডখানা দেখতে পাচ্ছ, এই ছোট্ট সুঁই মানে পিনটা লাগিয়ে দিলেই দেখ কী সুন্দর গান হয়!" আজো মনে পড়ে সে গান...

'বুড়ী তুই গাঁজার জোগাড় কর
ওলো তোর জামাই এলো দিগম্বর।'

সে গান প্রসিদ্ধ কৌতুক অভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর।

সেই প্রথম কলের গান শোনার অভিজ্ঞতার সাথে বাংলাদেশের বহু ছেলেমেয়ের অভিজ্ঞতার মিল আছে, এ কথা হলপ করে বলতে পারি।

ঐ কলের গানের গান শুনে সেই শৈশব থেকেই প্রাণে-মনে দোলা লেগেছিল, আমি কি কোনোদিন ঐভাবে কলের গানে গান দিতে পারব না? আমাদের বাড়ীতে প্রকাণ্ড ইঁদারা, সেই ইঁদারায় পানি তুলতে তুলতে হঠাৎ যেন কার ডাকে সাড়া দিয়ে উঠেছি, ইঁদারার ভেতরে একটা সুন্দর প্রতিধ্বনি হল। মনে হল এ প্রতিধ্বনিটা ঠিক কলের গানেই শুনেছি।

একবার 'আ' করে উঠলাম, ঠিক 'আ' এর প্রতিধ্বনি হল 'আ'। আর একবার বললাম 'ই' উত্তর হল 'ই'....একখানা গান ধরলাম, গানের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। মনে কী উল্লাস, মাকে ডাকছি, ভাইদের ডাকছি, শোন শোন শুনে যাও কলের গান!...এইভাবে যতবার ইঁদারার পারে যেতাম গলাটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গান গাইতাম-ই!! একটু সঙ্কোচ হত বাবাকে। কিন্তু অনেকদিন দেখেছি আমার ঐ চীৎকার বা গান শুনে তিনি এসে দূরে দাঁড়িয়ে শুধু হাসছেন।

।। আমার শৈশবের কথা ।।

ধনীব ঘরের দুলাল না হলেও বাবার অবস্থা মোটামুটি ভালো। পঁচিশ ত্রিশ খানা হালের গরু, প্রায় দেড়শো বিঘা খাস আবাদী জমি আর পাঁচ হাজার বিঘা প্রজাপত্তনী জমির মালিক ছিলেন তখন আমার বাবা। এত বড় সম্পত্তি দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকার, পাইক, বরকন্দাজ রেখেও বাবা ওকালতি ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি তখন ফিফ্‌থ ক্লাসে পড়ি।

এই রকম অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। আমাদের শৈশবটা কিভাবে কেটেছে এখনকার ছেলেরা হয়ত সেকথা ভাবতেও পারে না। তখনকার দিনে, মানে উনিশ শো চৌদ্দ-পনের সালে, ধুতি পরতাম ; ধুতি ছিল একখানা, গায়ে ছিল একটা সার্ট। আমাদের গ্রাম বলরামপুরের স্কুলটা প্রকাণ্ড এক পুকুরের ধারে। সকাল দশটায় ভাত খেয়ে স্কুলে গিয়ে বইপুঁথি রেখে স্কুলের প্রায় সব ছেলেই সার্ট আর ধুতি পুকুরের পারে রেখে দিগম্বর হয়ে পুকুরে লাফিয়ে পড়তাম। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল না হওয়া পর্যন্ত সাঁতার কাটতাম। তারপর পণ্ডিত মশাই, যিনি সকাল থেকে এগারোটা পর্যন্ত নিজের সামান্য জমিতে হালচাষ করে স্কুলে আসতেন তাঁর গর্জন শুনে পুকুর থেকে উঠতাম। পাঁচ ছ'দিন পরে পরে পুকুরে নামবার আগেই ধুতি কেঁচে শুকোতে দিতাম তারপর সেই ধুতি পরতাম। জুতা বলে কোন জিনিস গ্রামে ব্যবহারও হত না, আমাদের দরকারও হত না। প্রত্যেক হাটের বার বাবা আমাদের দু'টি করে পয়সা দিতেন। এক পয়সায় দশ গণ্ডা মানে চল্লিশটা মোয়া কিনতাম, আর এক পয়সায় বাতাসা, তাও প্রায় পঁচিশ ত্রিশটা। এই দিয়ে ভোর সকালবেলা হত আমাদের নাস্তা। আটমাস দশমাস পরে নতুন সার্ট বা ধুতি পেতাম। সেই নতুনের গন্ধ যাতে ফুরিয়ে না যায় সেজন্য কাপড় প্রথম পানিতে ভেজাতাম তা প্রায় পনের বিশ দিন পরে। বাবুগিরি কাকে বলে হাইস্কুলে না যাওয়া পর্যন্ত জানতাম না।

আগেই বলেছি, আমাদের বাড়ীর পুবে দিগন্ত মাঠ—তারপর বয়ে চলেছে কাল্‌জানি নদী। বর্ষায় চেয়ে দেখতাম তার অপরূপ শোভা। সারাটা মাঠ সবুজ ধানে ভরে উঠত। পূবালী বাতাসে সেই ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যেত। সাদা মেঘ নদীর পারে বৃষ্টির জাল বুনতে বুনতে আসত মাঠের মাঝখানে, পড়ত আমাদের বড় বড় টিনের ঘরে ঝমঝম ঝমঝম শব্দে। তখনকার দিনের বৃষ্টির কথা জীবনে ভুলতে পারব না। বৃষ্টি যখন আরম্ভ হত এক মাস দেড়মাসের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য বিরাম হত না। অনেকের বাড়ীতে জ্বালানী

কাঠ থাকত না। বর্ষার আগে তাই দশ পনের দিনের উপযোগী চিড়ামুড়ি তৈরী করে রাখত অনেকে। বৃষ্টিতে ভিজতাম, বড় ভাল লাগত অহেতুক বৃষ্টিতে ভিজতে। কোনো কোনো বছর বৃষ্টিতে ভেজার জন্য হত সর্দি, জ্বর কখনো বা ম্যালেরিয়া। ছেলেরা দল বেঁধে বড়শী নিয়ে যেত মাঠের দিকে, আমারি নাকের ডগার উপর দিয়ে, শুয়ে শুয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতাম জ্বরের উপর। তখনকার দিনের ম্যালেরিয়ার একমাত্র সুহৃদ ছিল "ডি, গুপ্তের টনিক"। মাকে বলতাম, "হোক তেতো, বেশী করে ওষুধ দাও, জ্বরটা তাড়াতাড়ি মরে যাক। দেখ না সবাই কেমন মাছ ধরতে যাচ্ছে—আমি ক'দিন থাকব বিছানায় শুয়ে?" মা বলত, "পাগল ছেলে, এক সাথে এক দাগের বেশী ওষুধ খেলেই কি জ্বর পালিয়ে যায়? নিয়মমত খেতে হয়।"

বসন্তের কোকিল-ডাকা প্রভাত-বেলায় কে আমায় ধরে রাখতে পেরেছে ঘরের মায়ায় বন্দী করে? কত ভোরে উঠে একাই বেরিয়ে পড়তাম। দু'ধারে বিরাট বিরাট শিশু-গাছের অ্যাভিনিউ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড রাস্তার উপর দিয়ে প্রায়ই নদীর পাড় পর্যন্ত। অত ভোরে কোকিল, বৌ কথা কও, ফটিক জল, ঘুঘুর ডাক—সারাটা গ্রামে যেন পাখীর ডাকের ঐকতান বেজে উঠত। গ্রামে জীবনে কেউ পাখী মারার জন্য বন্দুকের আওয়াজ কখনো শোনেনি। তাই গ্রামে বসত বেঁধেছে নানা পাখীর দল নির্ভয়ে।

গরমের দিনে কাছারী ঘরের বারান্দার নীচে বেঞ্চ পেতে শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে থাকতাম অনন্ত নীল আকাশের দিকে। এক এক সময় মনে হত মাথার উপর এই নীল আকাশটা কেন? ওটার উপরে যেখানে আর কিছুই নেই, অমন নীল রাজ্যও নেই, সেখানে যেতে পারব না কোনদিন? মন তখুনিই ছিল কল্পনাপ্রবণ! ঘর থেকে দেখা যেত হিমালয় পাহাড়, আকাশের মতই নীল। মনে হত আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে আর একটা নীল আকাশ ঘুমিয়ে আছে। ঐ নীলের কি শেষ নেই? অসংখ্য চিল উড়ত মাথার উপর সেই মহাশূন্যে। ভাবতাম আমারও যদি অমনি পাখা হত, কি মজার হত! এই ছোট্ট গ্রামে আমাকে বেঁধে রাখতে পারত না—উড়তাম, উড়তাম, উড়তাম।

দিনের বেলা এমনি কতশত কল্পনা মনে জাগত। জ্যোৎস্না রাতেও মনে হত চাঁদের দেশে যাব, ঐ ছোট ছোট তারার দেশে যাব; কিন্তু আঁধার পক্ষ এলেই সব গুলিয়ে যেত অর্থাৎ যত কল্পনা সব ছুটি নিত মন থেকে। অতি শৈশব থেকে ভাবপ্রবণ ছিলাম আমি। বিছানায় শোয়ামাত্র আর সব ছেলে যেমন ঘুমিয়ে পড়ত আমার ঠিক তা হত না। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকটা যেন মনে হত রাত্রির গান। তাই সন্ধ্যা হলে খাইয়ে দাইয়ে মা বিছানায় যেতে বললেই যে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম, তা নয়। চুপটি করে শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, বড়রা যখন খেয়ে দেয়ে শোবে, আর কোনো রকম শব্দ হবে না কারুর, তখন শুনব ঝিঁ ঝিঁ পোকার গান। এ গান সারা প্রাণ দিয়ে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম।

শুধু কি তাই? ভোরবেলা বিশেষ করে শীতের রাতে অতি ভোরে গ্রামে যখন প্রথম মোরগটা ডেকে উঠত, সেই মোরগের ডাক থেকে এর ডাকে আর একটা তার ডাক শুনে বহু দূরের বাড়ীর আর একটা মোরগ ডেকে উঠত তখন মনে হত ঐ অত ভোরে এরা কে

কাকে কি বলছে? মাকে জিজ্ঞেস করতাম, "মা, মোরগগুলো কি বলে?" মা বলতেন, "সত্যকাল হোক।" এখন ভাবছি সত্যকাল তখনি ছিল—সে কাল তো আর এখন নেই। অত ভোরে শীতের দূরগ্রামে শিঙা ফুঁকত কি করুণ মিষ্টি সুরে! "অত ভোরে ওঠে কেন ওরা, ওটা কি বাজায়?" মাকে জিজ্ঞেস করতাম। মা অনেক সময় বিরক্ত হয়ে বলতেন, "আঃ ঘুমাও বাবা—এখনো অনেক রাত আছে। ওরা শিঙা বাজাচ্ছে, আজ হয়তো কোথাও বাহইতে নদী মারবে।" এ কথার অর্থ বুঝতাম না। বয়স হলে বুঝেছি—ভোরবেলা ঐ শিঙা ফুঁকালে বহু গ্রামের লোক একসাথে সেদিন কোন বিল বা নদীর ছাড়ায় দল বেঁধে মাছ মারবে। ভাওয়াইয়া গানের একটা লাইনে পাওয়া যায়—"ওরে বাহইতে নদী মারে জোর শিঙা দিয়া রে।"

তারপর ডেকে উঠল শিয়াল। এক শিয়াল ডেকে উঠল, হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া....অমনি কিছু দূরে আর একটা, তারপর খানিকটা দূরে আর একটা, তারপর মনে হত গ্রামে শুধু বুঝি শিয়ালই থাকে! আরম্ভ হল সব্বাই মিলে হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া শেষে শুধু হুয়া হুয়া হুয়া। মনে হত সবাই মিলে যাত্রা গানের ছেলের দলের মত কোরাসে যেন গান ধরেছে।

শীতকাল চলে গেল। এলো ফাল্গুন মাস। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যায়। গ্রামে তো আর গাছ-গাছালির অভাব নেই। সেইসব গাছ থেকে ভোরে ডেকে ওঠে কী মিষ্টি সুরে কোকিল, শ্যামা, দোয়েল আর পাপিয়া। সকাল হয়। বিছানা থেকে উঠে ভাইবোনদের কাছে কোকিলের সুর নকল করে বলে উঠতাম--কু-কু-কু!

আসে বোশেখ মাস। আকাশের উত্তরে মেঘ জমে—রাতে আসে ভীষণ ঝড়। ঝড় থেমে যায়—আকাশে চাঁদ ওঠে। বাড়ীর উত্তরে কাঁঠাল গাছটার উপর দিয়ে একটা পাখী উড়ে যায়, গেয়ে যায় "বউ কথা কও, বউ কথা কও।" কী মিষ্টি সুর, বুকটা যেন মোচড় দিয়ে উঠত! আহা অমন মিষ্টি করে যদি আমি গাইতে পারতাম!

জষ্টিমাসের কাঠফাটা রোদ্দুর। মা বলতেন, "খবরদার এই দুপুর রোদ্দুরে কোথাও বেরুবি নে, ঘরে শুয়ে থাক, ঘুমোও।" মট্‌কা মেরে ঘুমাবার ভাণ করে শুয়ে থাকি। পূর্বের ঘরের পাশে বড় আমগাছটায় ঘুঘু ডাকতে থাকে, ঘুঘ্ ঘুটু ঘুঘ্ ঘুটু....মনটা যেন কেমন করে ওঠে ;ও পাশে গোলাঘর, পায়রাগুলো গেয়ে উঠত বাক বাকুম্ কুম্ কুম্—বাক্ বাকুম্ কুম্।

জষ্টি মাসের শেষ, এই আষাঢ় মাসের প্রথমের দিকটায় আমাদের পুকুরের পানি বৃষ্টির পানিতে কানায় কানায় ভর্তি না হলেও বেশ পানি থৈ থৈ হয় আর কি! পুকুরের পাড়ের নীচু জমিগুলো পানিতে ডুবে যায়। পাশে বাঁশঝাড়। ভোরবেলা আম কুড়োতে যেতাম, পুকুরের পাড়ের নীচু জমি যা বৃষ্টির পানিতে ভর্তি হয়ে আছে, সেসব জায়গায় দেখি হলুদ গায়ে মেখে ইয়া বড়া বড়া ব্যাঙ একটা আর একটার পিঠে চড়ে কী মিষ্টি একটানা গান জুড়ে দিয়েছে, কী ঘ্যাকোঙ্ কি ঘ্যাক। ওরে আম কুড়াব কি, থ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি ওদের কাণ্ডকারখানা। একটা দুটো কি ব্যাঙ, রাশি রাশি হাজার হাজার শত শত, কত শত তখন কি ছাই গুণতে শিখেছি, মোটকথা মনে হচ্ছিল হলুদ গায়ে মেখে যেন হল্‌দে পরীর বাচ্চারা আনন্দে গান গেয়ে চলেছে।

রাতে খেয়েদেয়ে ঘুমাতে যাব, মেঘে ভর্তি, হয়ত বা বৃষ্টি আসবে, হঠাৎ কানে এল সেই ব্যাঙের ডাক, থামে না, কী মিষ্টিমধুর মনে হতে লাগল। একটানা সেই সুর, তার সাথে ঝিঁ ঝিঁ পোকার সুর, সেই সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম।

ছোট্টবেলা থেকে ঐ মোরগের ডাক, শিয়ালের ডাক, ঘুঘুর ডাক, পায়রার ডাক, ব্যাঙের ডাক, কোকিল, দোয়েল, বউ কথা কও, পাপিয়ার সুর শুনে শুনে আমার গলায় সুর বাসা বেঁধেছিল। এমন কি, স্কুলের যখন ঘণ্টা পড়ত, সেই ঘণ্টার শব্দের শেষ সুরটুকু—ঢং...এর অং...টুকু গলায় তুলে নিতাম।

আমার শৈশবের সেই কল্পনা-প্রবণ মন আজ হাতড়ে দেখি কোথায় কবে বিদায় নিয়েছে। শত জঞ্জালে চিরকালের জন্যই হয়ত ও মনের চিরসমাপ্তি ঘটেছে। অথচ মনে হয় এই তো সেদিনকার কথা।

'পাগারু' নামে এক বুড়ো খুব ভাল দোতারা বাজিয়ে গান গাইত। প্রথম দোতারা বাজনা তার কাছে শুনি। গান গেয়ে যখন সেই সুরটা দোতারায় বাজাত মনে হত দোতারা নিজেই গেয়ে উঠল। গ্রামে কোন বাড়ীতে পাগারুর গান হলে বাড়ীতে ধরে রাখে কার সাধ্য? কুশান গান অর্থাৎ পালা গান প্রথম শুনি অতি ছোটবেলায় আমাদের গ্রামের বন্দরে। ছোট ছোট ছেলেরা মেয়ের পোষাক পরে কি সুন্দর নাচে! তাদের নাচগান শুরু হত সন্ধ্যায়—অবিরাম তিন চার ঘণ্টা নেচে গেয়েও যেন পরিশ্রান্ত নয় কেউ। কত ছন্দ, কত তাল, কত হাসি, কত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় সে গানে। সেই কুশান গান গাওয়া হত খোল, করতাল আর 'বেণা' নামক এক যন্ত্র সহযোগে। এই বেণা জিনিসটা অনেকটা বেহালার মত। তবে তাতে চারটা তার নেই। একগুচ্ছ ঘোড়ার লেজের চুল দিয়ে এই বেণা তৈরী। গ্রামের বয়োবৃদ্ধ ছেলেদের ধরে গ্রামের এক ঘোড়াকে দড়ি বেঁধে লেজ কাটতে গিয়ে কি বিপদ! একটা ছেলে তো ঘোড়ার লাথি খেয়ে অজ্ঞান! গ্রামের লোক বহু কসরৎ করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। যাক, ঘোড়ার লেজ কেটে জোগাড় করতে পেরেছি 'বেণা' তৈরীর সরঞ্জাম, মনে কী স্ফূর্তি! তারপর বেণা তৈরী করে বেণা বাজিয়ে যেদিন গান গাইতে শুরু করলাম সেদিন আরও কি আনন্দ! বাবা তো একদিন বলেই বসলেন, "তুই কি গানবাজনাই করবি, পড়াশুনা করবি নে?"

।। তুফানগঞ্জে ।।

ফিফ্‌থ্ ক্লাসে উঠে কুচবিহার শহর থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে চলে আসি তুফানগঞ্জ স্কুলে। কোথায় কুচবিহার শহর, আর তুফানগঞ্জ একটা মহকুমা মাত্র। গ্রামের মত। তুফানগঞ্জ আসার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলাম এর গ্রাম্য পরিবেশের জন্য। শহরে তো কোথাও গলা ছেড়ে গান গাইতে পারি না—তাই তুফানগঞ্জে আসার জন্য বাবার কাছে জেদ ধরলাম। তাঁরও কর্মস্থল এই তুফানগঞ্জ। তিনিও এখানকার আদালতে ওকালতি করতেন, তাই হয়ত বা মত দিয়েছিলেন। এই স্কুলে এসে গান শুনবার সুযোগ পাই প্রথমে ওখানকার সরকারী ডাক্তার মোবারক হোসেন সাহেবের কাছে। তিনি বেশ রবীন্দ্র-সংগীত

গাইতেন অর্গান সহযোগে। হোস্টেল থেকে কাছেই ডাক্তারের কোয়ার্টার। রোজ যেতাম তাঁর কাছেই। তিনি গাইতেন, দু'বার শুনেই সুর আয়ত্ত করে ফেলতাম।

ফিফ্থ্ ক্লাসে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলাম। ডাক্তার সাহেব স্কুল কমিটির মেম্বার। পুরস্কার বিতরণীর সময় তিনি প্রস্তাব করলেন, যে ছেলে সুন্দর গান গাইতে পারবে, তাকেও একটা দেওয়া পুরস্কার হবে, দশ টাকার বই। দশ টাকার বই মানে তখনকার দিনে এক গাদা বই। স্কুলে গানের একটা প্রতিযোগিতা হল, আমাকেই সবাই প্রথম স্থান দিলেন। পুরস্কার বিতরণী সভার উদ্বোধনী সংগীত গাইলাম, 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া' আর সমাপ্তি সংগীত গাইলাম, 'সভা যখন ভাঙবে তখন শেষের গানটি যাব গেয়ে'। সেবারের পুরস্কার বিতরণী সভাতে একটা নতুনত্বের সৃষ্টি করল এই গান। এরপর সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত সব পরীক্ষাতেই প্রথম হয়েছি। পড়াশুনার জন্যে প্রথম পুরস্কার, 'গুড কণ্ডাক্টের' পুরস্কার, 'বেষ্ট অ্যাটেনড্যান্সে'র পুরস্কার, 'নেটিভ' পুরস্কার মানে কুচবিহারী অধিবাসীদের মধ্যে প্রথম পুরস্কার এবং সংগীতে প্রথম পুরস্কার...বার বার প্রথম পুরস্কারের জন্য আমার নাম ধরে ডাকত প্রধান শিক্ষক আর সভাপতি মশায় অবাক হয়ে ভাবতেন, এই ছোট্ট ছেলেটি বেশ তো, সব বিষয়েই ভাল। সেধে আলাপ করতেন, উৎসাহ দিতেন।

ছোট্ট শহর, আবালবৃদ্ধবণিতার কাছে আমি পরিচিত। এমন কোন বাড়ী নেই যে বাড়ীর ভিতরে ছিল না আমার অবাধ গতিবিধি। তখনকার দিনে আমাদের ওদিকে অর্থাৎ কুচবিহারে একটা রেওয়াজ ছিল, স্কুলে মুসলমান ছেলেদের সেকেণ্ড ল্যাংগোয়েজ নিতে হত সংস্কৃত আর হিন্দু ছেলেদের নিতে হত ফারসী। তাই বি. এ. পর্যন্ত আমার সংস্কৃত ছিল এবং সংস্কৃতে আমি "কাব্যরত্নাকর" উপাধিও পেয়েছিলাম। হোস্টেলে প্রত্যেক ঘরে দুজন হিন্দু ছেলে, দুজন মুসলমান ছেলেকে থাকতে হত। শুধু রান্নাঘর আলাদা। এইভাবে ছেলেবেলা থেকে পরস্পর দু'টো জাতের মধ্যে গড়ে উঠেছিল নিবিড় আত্মীয়তা। কুচবিহারে তাই আমি প্রতি ঘরে ঘরে 'আব্বাসদা' বলে পরিচিত। ছাত্রদের মধ্যে আমরা সেবাসমিতি গড়ে তুলেছিলাম। কারো বাড়ীতে কোন ছেলের জ্বর, টাইফয়েড, নিমোনিয়া হলে আমরা সেই সেবাসমিতি থেকে পালা করে রাত্রে রোগীর শিয়রে বসে সেবা করতাম। অভিভাবকদের রাত জাগতে দিতাম না। সেই জন্য এই সেবাসমিতির মেম্বারদের শহরের সবাই ভালবাসতেন। আমার বিশেষ খাতির ছিল রোগীকে গান শোনাতাম, রোগীর মন ভাল থাকত, ভাল হয়ে উঠে সে রোগী আমাকে বিশেষ উপহার দিত হয়ত দু'চারটে বেদানা, এক থোকা আঙুর বা দশবিশটা কমলালেবু। তাকেও সামনে বসিয়ে আরো দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে তখুনি সেগুলো সাবাড় করে ফেলতাম।

তুফানগঞ্জে অতি ছোটবেলায় আমাদের স্কুলে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে গড়ে উঠবে এ নিয়ে সতর্ক প্রহরীর মত আমাদের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখতেন আমাদের স্কুলের হেডমাষ্টার গোপাল চক্রবর্তী। তাঁকে হেডমাষ্টার বলে সম্বোধন করার উপায় ছিল না। স্কুলের সমস্ত ছাত্রই তাঁকে ডাকতাম 'বড়দা' বলে। জীবনে তিনি কোন ছেলেকে বেত মারেন নি। পড়া না পারলে কোনদিনই বকতেন না। হেসে কথা বলতেন সব সময়। তাঁর রাগ বুঝতে পারতাম তখনই, যখন দেখতাম কথা বেশী বলেন না—বেশ গম্ভীর।

ম্যাট্রিক টেষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেলেই যারা এ্যালাউড হত তাদের তিনি নিয়ে আসতেন তাঁর বাসায়। সেখানে সন্ধ্যা থেকে রাত একটা দুটো পর্যন্ত রোজ নিতেন কোচিং ক্লাশ। প্রতি বছর তাই এ্যালাউড হওয়া ছাত্র একটিও ফেল করত না। আমরা ছিলাম সপ্তরথী, মানে সাতজন এ্যালাউড ছেলে। সন্ধ্যাবেলা হোস্টেল থেকে খেয়ে আসতাম তাঁর বাসায়। হোস্টেল থেকে বেশী দূরে ছিল না তাঁর বাসা। রাত দশটা এগারোটায় বেশ ক্ষিদে লাগত। মুখে বলতাম না কিন্তু দু'চারদিন যেতে না যেতে তিনি কি করে বুঝতে পারলেন। হঠাৎ একদিন বললেন, "হোস্টেলের খাওয়া বন্ধ করে দিও—সন্ধ্যার সময় ভাত খেলে তো ঘুম পায়। পড়াশুনা করে এখানেই খাবে। আর সত্যি, তিন তিনটা মাস রোজ রাতে ওর ওখানেই আমাকে খেতে হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী কি আদর করেই না আমাকে খাওয়াতেন। বড়দার এক ভাই তখন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক। তিনিও সে সময় বাড়ীতে এসেছেন। আমি অংকে একটু কাঁচা ছিলাম। অংকের ভার নিলেন তিনি। ছোড়দা বলে ডাকতাম। তিনি বলতেন 'অংকটা তো আর গানের মত মজার জিনিষ নয়। তবে শোন কি মজার জিনিষ—এই এখানে রইল একটা সেতার, এখানে একটা এস্রাজ আর এই একটা বেহালা, এমনি করে তিনটি সাজিয়ে রাখলাম। কি হল? ঠিক তোমার জ্যামিতির ত্রিভুজের মত হল না? এখন দেখ এর একটা কোণ...' ইত্যাদি। এমন মজার গল্পের ভিতর দিয়ে জ্যামিতি বুঝিয়ে দিলেন যে সত্যি কথা বলতে কি জ্যামিতির একটাও আমার ভুল হয়নি পরীক্ষায়। তুফানগঞ্জে প্রতি বৎসর দোলের সময় বসত একটা মেলা পনের দিন ধরে। ভাল ভাল যাত্রা আসত সে মেলায়। পনের দিন আর বইপুঁথির সাথে কোনো সম্বন্ধ থাকত না। যাত্রাগানের আসরে প্রথম স্থান দখল করবার জন্য সাজগোজ করে থাকাটা হত তখনকার দৈনন্দিন কর্মসূচীর প্রথম কাজ।

যাত্রার দলের মধ্যে সব চাইতে বেশী আকৃষ্ট করে আমাকে মুকুন্দ দাসের যাত্রা। যাত্রা তো নয়, মহা সমাজ-সংস্কারক অনুষ্ঠান। গানের ভিতর দিয়ে জমিদারের অত্যাচার, হিন্দুর বিয়ের পণপ্রথার ভয়াবহতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বক্তৃতা ও গান আমার ঐ ছোট্টবেলার ছোট্ট বুকে তুলেছিল এক বিরাট আলোড়ন। দলের লোকের নেই রাজার পোষাক, নেই ছেলেদের মনভুলানো পোষাকের চাকচিক্য। সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবী আর ধুতি পরে গান। এ যেন এক নবচেতনার উন্মেষ। তখন আরম্ভ হয়েছে স্বদেশী যুগের গোড়াপত্তন, খদ্দরের কথা শুনতাম, কিন্তু মুকুন্দ দাসের গান শুনতে গিয়ে জীবনে প্রথম দেখলাম খদ্দরের পোষাক। কুচবিহারে সে ঢেউ তো দোলা দিতে পারে না, কারণ করদ-মিত্র রাজ্যে রাজাই সর্বস্ব, সর্বপ্রধান। সেখানে বাংলা সরকারের মত আইন নয়। কাজেই খদ্দরের পোষাক সে রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। নানা দিকে তবু তখন আলোচনা চলছে যে বাংলা দেশে স্বদেশী যুগের নতুন সুর উঠেছে।

কুচবিহারে তার ঢেউ এল নীরব চরণ ফেলে। দু'একটি ছেলে কলকাতা ফেরৎ, তারা আমাকে বললে, "আরে শোন, কী মজার গান কলকাতায় শুনে এলাম, খুব গায় এ গান। কোথায় লাগে তোর রবি ঠাকুরের গান।" বললাম, "গা দেখি।" সে ছেলে হয়ত গাইল ঃ

'যায় যাবে জীবন চলে
শুধু দেশের কাজে মায়ের ডাকে
বন্দেমাতরম বলে।'

ভাল লাগল না। বললাম, 'আর একটা গা দেখি শুনি।' তখনই সে ক্ষুদিরামের ফাঁসির ইতিহাসটা আগে বলল। তারপর গাইল কেঁদে কেঁদে :

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'।

এ গানে সত্যি আমার কান্না এল। কিন্তু গানটা শোনা পর্যন্তই, শিখলাম না, কারণ এ সব গান গাওয়া শুনেছি অপরাধ। কী দরকার বাবা, গান গাইলে যদি দোষ হয়, অমন দোষের গান নাই বা গাইলাম।

কিন্তু একটা কথা মনে জাগল, এ গান দিয়ে দেশের জনসাধারণকে অপূর্ব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে পারা যায়। আরো মনে হত যদি গায়ক হতে পারি তা হলে আমার সেই গানের সুর মানুষের হৃদয় স্পর্শ করবে আর সেই সুরের রেশ যখন সারা জগতে ছড়িয়ে যাবে তখন আমার মনের প্রতিধ্বনি প্রতিস্তরের প্রতি মানুষের ভিতর খুঁজে পাব আমি এবং সেইই হবে আমার শিল্পী জীবনের সব চাইতে বড় সার্থকতা।

তুফানগঞ্জে ছেলেবেলায় পড়বার সময় একটি হিন্দু পরিবারের সাথে কতটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল, সেটা না বললে জীবনের একটা অধ্যায় অলিখিত থাকবে, তাই বলছি। আমি তখন ফোর্থ ক্লাশে। নতুন এক দারোগা এলেন থানায়, নাম রাধাশ্যাম চক্রবর্তী। গোলাপের মত দশ বছরের একটি, সাত বছরের একটি এই দুটি ছেলেকে নিয়ে তিনি স্কুলে গেলেন। অমন মনভোলানো দুটি শিশু দেখে সেধে গিয়ে আলাপ করলাম। কি মিষ্টি কলকাতার ভাষায় কথা বললে। একজনের নাম সুশীল আর একটির নাম অনিল। বিকালে ওদের বাসায় গেলাম। ওর বাবা বললেন, "কি চাই খোকা"? আমি বললাম, "আজ যে দুটি ছেলেকে স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন ওদের সাথে আলাপ করতে চাই"। তিনি বললেন, "তুমি কোন ক্লাশে পড়? ক্লাশে পরীক্ষায় ফার্স্ট হও?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, প্রত্যেক বছর আমি ফার্স্ট হই।" তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাবা মা আছেন? তোমার বাবা কি করেন?" আমি বললাম, "হ্যাঁ বাবা মা আছেন। বাবা ওকালতি করতেন, এখন একরকম ছেড়ে দিয়েছেন, বাড়ীতে জমিজমা দেখাশোনা করেন।" তিনি বললেন, "বেশ বেশ। ওরে সুশীল এদিকে আয়, দেখ তোদের এক দাদা এসেছে।" তারপর তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, "দেখ দেখ, কি সুন্দর ছেলে, ক্লাশে ফার্স্ট হয়, ওর বাবা উকিল, তা তোমার নামটি তো জানা হয়নি বাবা। কি নাম তোমার?" বললাম। তিনি বললেন, "তাতে কি হয়েছে? দেখ দেখ, কে বলবে এ মুসলমানের ছেলে? আমাদের বামুনের ছেলে মনে হয় নাকি?" (বলে রাখি তখনকার দিনে ভাল চেহারার মুসলমানকে দেখলে হিন্দুরা ঐভাবেই বলতেন।) দারোগাবাবুর স্ত্রী একদম আমার সামনে এসে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "তুমি আমাকে মা বলে ডাকবে, কেমন? আর আমার

খোকা খুকীরা তোমাকে দাদা বলে ডাকবে। তুমি যখন ভাল বংশের ছেলে, ক্লাশে পড়াশুনায় ভাল, তুমি বাবা আমার ছেলেপেলেদেরও ঠিক ছোট ভাইবোন মনে করে এদের খারাপ ছেলেপেলের সাথে মিশতে দিও না। আর তুমি রোজ কিন্তু স্কুল ছুটির পর এখানে এসে জলখাবার খেয়ে যাবে, কেমন?" আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, "আচ্ছা।" তিনি বললেন, "না শুধু আচ্ছা নয়, বল আচ্ছা মা।" বললাম, "আচ্ছা মা।" আমাকে একদম বুকে জড়িয়ে ধরে মায়ের মতই চুমু দিয়ে স্নেহাভিষিক্ত করলেন।

প্রায় রোজই তাদের বাসায় আসতে লাগলাম। দারোগাবাবুর বাড়ী রাজশাহী, কিন্তু ছেলেদের মামার বাড়ী কলকাতায় অর্থাৎ আমার এই নতুন মা কলকাতার। আমার কথায় কুচবিহারী ভাষাই মেশানো ছিল। এঁদের সাহচর্যে এসে আমার কথ্য ভাষায় এল পরিবর্তন। কলকাতা থেকে মা নিয়ে এসেছেন ছেলেদের উপযোগী খুব ভাল ভাল বই। আমাকে দু'তিন দিন পরে পরেই সেইসব বই পড়তে দিতেন। এরপর আমার বাবা একদিন তুফানগঞ্জে এলেন। বাবাকে দারোগাবাবু তাঁর বাসায় নিমন্ত্রণ করে খুব খাওয়ালেন। খাওয়ার শেষে তিনি বললেন, "আপনার খোকাকে কিন্তু আমার ছেলের সামিল করে নিয়েছি।" বাবাও বললেন, "বেশ তো আমার খোকার অভিভাবক হয়েছেন—নিশ্চিন্ত হলাম।" এরপর আর বাসায় গেলে শুধু জলযোগ নয়, কোনো কোনো দিন ভাত পর্যন্ত খেতে হত। আর এই ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্য রইল না আলাদা গ্লাশ, থালা-বাসন। আমিও এদের আপন ভাইবোন ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। এক বছর স্কুলে পড়ার পর সুশীলকে ওর মামা নিয়ে গেলেন কলকাতায়। সেখানকার স্কুলে পড়বে, হাজার হলেও এটা মফঃস্বল। সুশীল যেদিন চলে যায় এখনও পরিষ্কার মনে পড়ে ওর অদর্শনে পাঁচ ছ'দিন শুধু কেঁদেছিলাম। মা এত করে বুকের কাছে টেনে এনে এটা ওটা খাওয়ার জন্য সাধতেন আর আমি শুধু কেঁদে বুক ভাসাতাম। বলতাম, "ওযে আমার কতখানি বুক জুড়ে বসে আছে তোমরা কি বুঝবে বল?" মায়ের চোখেও আসত পানি। ওর বাবা শুধু হাসতেন আর হয়তো ভাবতেন আমার নতুন ছেলের ভায়ের প্রতি কী টান। দিন যায় কিন্তু রোজই বাসায় গিয়ে সুশীলের গল্পই করি। মা একদিন বললেন, "আচ্ছা বাবা এতগুলো ভাইবোনকে তুই ভালবাসিস না? সুশীল আছে ওখানে কলকাতায় বড় স্কুলে, কত পড়াশুনা শিখবে এ তো তোরি আনন্দের কথা! ছোট ভাই ওখানে ভাল করে লেখাপড়া করে খুব বিদ্বান হবে, বড়লোক হবে, এতো আনন্দ করবার কথা! তা নয় খালি ওর নাম করে কান্নাকাটি!" সেদিন থেকে সত্যি সত্যিই মন থেকে মুছে ফেললাম যত বাজে দুঃখ। ওদের শেখাতে লাগলাম আমার মত কবিতা লেখা। সুশীল, অনিল এদের দু'ভায়ের হাতের লেখা আজও আমার লেখার এত কাছাকাছি যে অমিল খুঁজে বার করা ভারী কঠিন।

আমি কুচবিহার কলেজে তখন আই. এ. পড়ি। এর মধ্যে দারোগাবাবু কুচবিহারের বহু সাব ডিভিশনে কাজ করে সদরে বদলী হয়ে এসেছেন। এর মধ্যে দু'টি বোনের বিয়ে হয়েছে। অনিল ম্যাট্রিক দেবে। কুচবিহারে দু'জন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। কি খেয়াল হল দরখাস্ত করলাম। তখন কুচবিহারের পুলিশ সুপার ছিলেন মিঃ লেস্‌লী। ইন্টারভিউয়ের আমন্ত্রণ পেলাম। লেস্‌লী সাহেব আমার ইন্টারভিউয়ে

খুশী হয়ে একেবারে সংগে সংগে নিয়োগপত্র দিয়ে দিলেন। মহানন্দে হোস্টেলে এসে বন্ধুবান্ধবদের কাছে সগৌরবে চাকুরীপ্রাপ্তির কথা ঘোষণা করলাম। তখনকার দিনে দারোগাগিরী মহা লোভনীয় পদ। কাজেই আনন্দটা রাজ্যজয়ের চাইতে নেহাৎ কম ছিল না। দিন পাঁচেকের মধ্যেই কাজে যোগদান করতে হবে।

সুশীলের বাবা বাইরে মফঃস্বলে গিয়েছিলেন। মফঃস্বল থেকে ফিরে এসে অফিসে গিয়ে শুনেছেন আমার চাকুরী হয়েছে। এখবর শুনেই তিনি খোদ পুলিশ সুপারের কাছে হাজির। সাহেবকে বললেন, "শুনলাম, আপনি নাকি আব্বাসকে সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ করেছেন?"

সাহেব হেসে বললেন, "হ্যাঁ এরকম চৌকস লোকই আমাদের দরকার।"

—"কিন্তু আপনাকে এই নিয়োগপত্র নাকচ করতে হবে।"

সাহেব অবাক হয়ে বললেন, "কেন?"

সুশীলের বাবা বললেন, "দেখুন, আমার ছেলেকে আমি পুলিশের চাকুরী করতে দিতে পারি না।"

সাহেব আরও অবাক হয়ে বললেন, "তার মানে?"

তিনি বললেন, "মানে আব্বাসউদ্দীন, আমার ছেলে, তার পুলিশের চাকুরী করা চলবে না।"

সাহেব চক্ষু চড়কগাছ করে বললেন, "কি বললে? তুমি হলে বামুন চক্রবর্তী আব সে হল মুসলমানের ছেলে আহম্মদ?"

তিনি বললেন, "দ্যাখো সাহেব, ছোটবেলা থেকে এ ছেলেকে আমরা নিজের ছেলের মতই জানি। কাজেই নিজের ছেলেকে আর দারোগাগিরীতে নয়।"

আমার চাকুরী করা ফুরিয়ে গেল, এ খবর যখন পেলাম ভয়ে ভয়ে বহুদিন আর বাসায় যাইনি। খবরটা যখন আমার বাড়ীতে বাবার কানে গিয়েছিল, বাবা ওঁকে চিঠি লিখেছিলেন, "আপনি সত্যিই মহানুভব। ছেলেকে যে এভাবে দারোগাগিরীর মোহ থেকে বাঁচিয়েছেন এজন্য ধন্যবাদ।"

।। আমার প্রথম প্রেম ।।

বয়স যখন সতের কি আঠার বছর, তখন প্রেম এসেছিল জীবনে, নীরব চরণ ফেলে। তুফানগঞ্জে নদীর পারে রোজই বিকালে বেড়াতে যেতাম, যখন নদীর পার জনশূন্য হত, গলা ছেড়ে গান গাইতাম। সন্ধ্যার ঠিক আগে হোস্টেলে ফিরছিলাম। বাগানে দাঁড়িয়ে একটি বারো বছরের অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরী। চোখ পড়ল তার চোখে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সেও তাকিয়ে আছে, আমিও তাকিয়ে আছি। মুখে কারুর ভাষা নেই। অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর অকস্মাৎ বলে উঠলাম, "একটা ফুল দেবে?" বালিকার মুখে হাসি ফুটে উঠল। তার মুখের হাসি ফুলের হাসির চেয়েও মনে হল সুন্দর, নিষ্পাপ। এক পা, দু'পা করে হাতে একটি গোলাপ নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। কাছে এসে হেসে হেসে বললে, "ফুল খুব ভালবাস?"

আমি বললাম, "যে ফুল দেয় তাকেও।"

ফুলটা আমার হাতে দিয়েই চঞ্চলা হরিণীর মত ছুটে পালিয়ে গেল বাগান থেকে বাড়ীর ভিতর। যাওয়ার পথে যেন ছড়িয়ে গেল হাজার ফুলের পাপড়ি।

সারাটা সন্ধ্যা বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারতে লাগল সেই চপল মেয়ের মিষ্টি হাসিটুকু। কেমন এক মধুর আবেশে সারাটা রাত কাটল। পরদিন স্কুল ছুটির পর চললাম আবার নদীতীরে। সেদিনও সেই আগের পুনরাভিনয়। আমি বললাম, "তুমি কী পড়?"

সে বললে "বাড়ীতেই পড়ি, তা' অনেক বই, এবার মাইনর পরীক্ষা দেব।"

বললাম, "এমনি সময় রোজ আসবে?"

সে বললে, "রোজ আসব, কিন্তু সাবধান, বেশীক্ষণ থেক না ওভাবে হাবার মত দাঁড়িয়ে, বাবার যে এ সময় অফিস থেকে ফেরার সময়। বাবা ভীষণ কড়া লোক, জান না?"

"কড়া লোক, কড়া লোক মানে?"

"কড়া লোক মানে তুমি যে ঐ নদীর পাড়ে গান গাও, বাবা যদি জানতে পারে তবে আর এ রাস্তা দিয়ে পথ-চলা তোমার বন্ধ হবে।"

"আমি যে গান গাই কী করে বুঝলে?"

"বারে তোমার গান শুনবার জন্যই তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকি।"

"ও দুষ্টু মেয়ে, চুরি করে তুমি আমার গান শোনো।"

সে হেসে বললে, "যা হবার হয়েছে, আর তোমার গান শুনবার জন্য দাঁড়াব না এসে" এই বলে সে নিমেষে ছুটে গেল চোখের আড়াল হয়ে।

পরদিন, তারপর দিন, আবার পরের দিন, এমনি করে বুঝতে পাচ্ছি, ওর অদর্শন আমাকে যেন অধীর করে তুলেছে। যেদিন ওর দেখা পাই না সে রাতটা যে কী বিশ্রীভাবে কাটে, কেন যেন বুক ছাপিয়ে আসে কান্না। মনে হত মেয়েটি আমার পাশে শুধু বসে থাক আর আমি সারাদিন শুধু পড়ব। ওর দিকে তাকাবও না।

ধীরে ধীরে ওর বাড়ীতে গিয়ে পরিচয়ের সূত্র মেলে দিলাম। ভালো ছাত্র বলে আমার খ্যাতি। কাজেই তার কঠিন কঠোর বাবা আমাকে ভালোভাবেই গ্রহণ করলেন। গান গাওয়াটা তিনি সত্যিই পছন্দ করতেন না, তবে প্রতি জুম্মাবার নামাজ পড়তে যেতাম বলে বোধহয় মনে মনে গান-গাওয়ার সামান্য অপরাধটা তিনি ক্ষমাই করেছিলেন, তাই বাড়ীতে তাঁর পাঠরত ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি, "হ্যাঁ তোমরা হবে এর মত, কী সুন্দর পড়াশুনায় ফার্স্ট হয়, আবার নামাজ-বন্দেগীতেও ঠিক হাজির।"

আসে সারা প্রকৃতিতে আগুন ছড়িয়ে ফাগুন মাস। শুরু হয় দোলের মেলা। সন্ধ্যা হয়েছে। সেই দোলের মেলায় সওদাগরের দোকানে দেখি সেই মেয়ে বসে আছে তার বাবার সাথে। এটা ওটা কী যেন কিনছে। আমি একটু দাঁড়িয়ে। অকস্মাৎ মেলার লোকজনের ছুটোছুটি—কী, কী, ব্যাপার কী? কার যেন বাড়ীতে আগুন লেগেছে, লোকজন সেইদিকে ছুটছে।

ওর বাবা আমাকে দেখতে পেয়ে ইশারায় তাঁর কাছে ডাকলেন। কাছে গেলাম।

ব্যস্তভাবে বললেন, "তুমি বাবা একে বাসায় নিয়ে যাও, আমি আগুন নেবাতে চললাম। কারো বাড়ীতে আগুন লাগলে যেতেই হয়"।

আমার কল্পলোকের ছোট্ট রাণীকে নিয়ে আগেই চললাম এক মিষ্টির দোকানে। বললাম "কী খাবে?" হেসে বললে, "দোকানে বসে কিছুতেই খেতে পারব না....তার চেয়ে চল নদীর পারে খানিকটা বেড়াই, তারপর আমাকে বাসায় দিয়ে আসবে"!

তাই চললাম। ফাগুন মাসের পূর্ণিমা। নদীর পানিতে পড়েছে চাঁদের হাসি, এক চাঁদ শত চাঁদ হয়ে হাসছে ছোট ছোট ঢেউয়ের বুকে। নদীর ওপারে কুল বন। নির্জন নদীতীরে আমরা দু'জন একা একা। মনে হতে লাগল আজ প্রাণ ভরে কত কথা বলব। ওর একখানা হাত ধরে বললাম, "দুষ্টু মেয়ে, বাড়ী এলে আমায় দেখে পালিয়ে যাও কেন? তোমাদের বাসায় এত আসি কেন, জান?"

তখন সে নিরুত্তর! দেখছি তার চোখ থেকে নিঃশব্দে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। একটু ভড়কে গেলাম। "কান্নার এতে কী আছে। কী এমন বললাম। ভয়ানক অভিমানী মেয়ে তো"।

শুধু বললে, "কই তুমি তো রোজ আস না, সেই কবে একদিন এসেছিলে, তারপর তো আর দেখা নেই।"

হেসে ফেললাম। "ও......তাহলে খুব ঘন ঘন আসতে বল তোমাদের বাসায়, কেমন? কিন্তু কি জান, আমার হয়েছে বিপদ.....তোমার যে সেই ভাই দু'টো কেমন যেন ভাব দেখায় আমার সাথে, তারা বোধহয় আমার আসাটা ঠিক পছন্দ করে না।"

সে বললে, "কেন তোমার তাতে কি? জান, তুমি যেদিন আস না সে রাতে আর ঘুমুতে পারি না। আচ্ছা বল তো এ আমার কী হল?"

আমিও ঠিক ওই কথাই বললাম, "তুমি বলতে পার আমারো এ হল কী? মন তো বলে রোজই আসি—।"

সে বললে, "দেখ, তুমি যাই বল না কেন রোজ ঠিক সন্ধ্যার আজানের সময় বাগানের ওই ধারটায় একবার এসে দাঁড়াবে, তোমাকে একটিবার শুধু দেখে যাব—কেমন?"

আমি বললাম, "ঠিক, ঠিক, ঠিক, এর আর নড়চড় হবে না। কিন্তু বলতে পার, এমনি করে তোমার সাথে প্রাণ খুলে কথা বলবার সুযোগ আর জীবনে ক'দিন আসবে?"

কী আশ্চর্য কি অদ্ভুত উত্তর-ই না দিলে এ কথার! বললে, "কথা বলার চাইতে তোমার ওই মুখের দিকে চেয়ে থাকতেই যে আমার ভালো লাগে।"

দুটি হৃদয় যখন পূর্ণ—কথা তখন নির্বাক।

অনেকক্ষণ পরে আমি বললাম, "আচ্ছা একটা কথা। নাঃ থাক।" সেই মিষ্টি হাসি হেসে সে বললে, "কী থেমে গেলে কেন বল? আচ্ছা, আমিই বলি। বলি যে তুমি পড়াশুনায় তো ভালো ছেলে, তা এমন দুষ্টু ছেলে হয়ে গেলে আর পড়বে কখন?"

এবার অকস্মাৎ আমার কান্না এল। কান্নার বেগ থেমে গেলে ধরা গলায় বললাম, "জানি না, তোমাকে ছাড়া আমি আর জীবনের কূলে পাড়ি জমাতে পারব কি না"।

এবার সে হেসে উঠল। এতটুকু একরত্তি বারো বছরের মেয়ে বলে উঠল কিনা, "বড়

জিনিষ লাভ করতে হলে বড় ত্যাগ আর সাধনা চাই।" কে জানে সে রাতের সেই কথা আমার জীবনে মহাসত্যাদর্শ হয়ে দেখা দেবে।

এরপর ওর কথা মত ঠিক সাঁঝের আঁধারে ওদের বাগান বাড়ীর উত্তর পাশে যেদিকে লোকচলাচল নেই সেখানে গিয়ে চুপটি করে দাঁড়াতাম আর সে চুপি চুপি পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমার একটা হাত ধরে আবেশে বিহ্বল হয়ে যেত, আর হাতে একটি ফুল দিয়ে বলত, "আচ্ছা যাও, অনেকরাত পর্যন্ত পড়, আমার গোলাপটা—।"

"তা আর বলতে হবে না"—প্রতি সন্ধ্যার গোলাপই হত আমার রাতজাগার সাথী! পড়াশুনা শেষ করে সেই গোলাপের সাথে শুরু করতাম কত না প্রলাপ।

এরপর শুরু হল পত্র-বিনিময়। বাড়ী ওদের ঠিকই যাই, কিন্তু কথা তো আর অত হয় না! দু'টো চারটে ছিন্ন কথার টুকরো এধারে ওধারে ফেলে দেওয়া। তাই কথার মালা গেঁথে চললাম, রাত জেগে চিঠির মাধ্যমে।

প্রাণে প্রেমের জোয়ার এলে বিশ্ব হয় মধুময়, আকাশের চাঁদ আসে মাটিতে নেমে, প্রিয়ার মুখ হয় তখন চাঁদের চেয়েও সুন্দর। নদীর কুলুকুলু তান তখন মিলনের উলুধ্বনি হয়ে ওঠে। কোকিলের গান মিলনের আগমনী শোনায়।

এমনি কোকিল-ডাকা এক রাতে কি যেন একটা কাজে ওদের বাড়ীতে গিয়েছি, তখন আমি ফার্স্ট ক্লাশে পড়ি, বাসায় গিয়ে এক চাকরের কাছে শুনলাম বাড়ীসুদ্ধ সবাই গেছে কার বাড়ীতে দাওয়াত খেতে। চাকরটা বললে বাসায় শুধু আছে 'সে' এবং এক বুড়ী দাদী।

তাকে বললাম, "চুপটি করে ওকে বল তো আমার কথা।"

বাইরে এলো। বললাম, "কি ব্যাপার? তুমি যাওনি যে বড়?" বললে, "তুমি একটুখানিক দাঁড়াও আমি আসছি।" মিনিট দু'য়েকের ভেতরই আবার এল, বললে, "চাকরটাকে দাদীর ঘরে দিয়ে এলাম। বলে এলাম আমি পাশের ঘরে বসে পড়ব, আমাকে ডেকো না।" তারপর এমন এক জায়গায় গিয়ে বসলাম যেখান থেকে বাড়ীর চাকরের আসা আর বাইরের দিকে লোক আসা-যাওয়া সবই লক্ষ্য করা চলে।

সে বললে, "আচ্ছা, এবার তোমার ম্যাট্রিক দেবার বছর। এরপর? অর্থাৎ ম্যাট্রিক পাশের পর?"

আমি বললাম, "ম্যাট্রিক পাশের পর বিয়ে দেব। তারপর আই. এ. তারপর ইংরাজী বি.এ. তারপর দেখা যাবে।"

"ও, তাহলে ম্যাট্রিক পাশ করেই বিয়ে দিচ্ছ? আর ওদিকে যে, মানে বুঝতেই পারছ!"

আমি বললাম, "কী ব্যাপার কি?"

সে বললে, "দেখ একতরফা কিছুই হয় না, আমি এমন কেঁদে কেঁদে—"।

বলেই সে কী কান্না! কান্নার বেগ প্রশমিত হলে বললে, "যাও তুমি আর এসো না, এ বাড়ী এলে অপমানিত হবে।"

"বল লক্ষ্মীটি, কি ব্যাপার বল!" চুপ করে রইল সে, কিছুই বলতে পারছে না, শুধু

থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস পড়ছে।

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, "তবে কি আমার চিঠিপত্র...কেউ...।"

বললে, "ঠিকই ধরেছ! জানই তো আমার ভাইদুটো কী হিংসুটে! তুমি বাসায় এলেই ওদের আরম্ভ হয় যেন সি আই ডি-র চোর ধরার মত এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি। সেই আমার এক ভাইয়ের চোখে আর ধুলো দিতে পারলাম না। তোমার চিঠিগুলো তো সাধারণত আমি অতি গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ি। তিনদিন আগে তোমার চিঠি পড়ছিলাম, আমার সেই ভাইটি একদম দরজা খুলে সামনে উপস্থিত। হাত থেকে চিঠি নিয়ে পড়ে ফেলে বললে, 'হ্যাঁ আমি বহুদিন থেকে টের পেয়েছি। আচ্ছা এবার যদি ও আসে তবে ওরই একদিন কি আমারই একদিন।' চিঠিখানা এখনো ওর কবলে। বহু সাধ্যসাধনা করেছি, দেয়নি...এখনো বাবাকে কিছুই বলে নি। কিন্তু আমার ভয় হয় তোমাকে কখন কি করে বসে, কাজেই কাজ নেই তোমার আর এখানে এসে নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করার। জানি আমি, আমাকে না দেখে তোমার—।"

আর বলতে পারল না সে। দু'জনের চোখের জলে বুঝি বিশ্ব ভেসে যায়। বুকে উঠেছে দু'জনারি সাত সাগরের ঝড়।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। তুফানগঞ্জ থেকে এসেছি গ্রামের বাড়ীতে। আমার এই ভালোবাসার কাহিনী বন্ধুবান্ধব মহলে এক আধটু যে ছড়িয়ে পড়েনি, তা নয়। অবস্থাটা তখন আমার দিক থেকে যেমন উগ্র, অপর দিক থেকেও ঠিক ততখানি। আমি খাওয়াদাওয়া একরকম ছেড়েছি। বাড়ীতে মা বললে, "কি বাবা, কি হল তোর, শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, খাস না কেন?" মাকে একদিন সব বললাম। বলতে বলতে কেঁদেই ফেললাম। মা বললেন, "বেশ তো বাবা, তোর বাবাকে বলব তোর বিয়ের কথা।"

বাবা শুনে রাগ করেননি, তবে খুব মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি আমার ভগ্নীপতিকে ডেকে বলে দিলেন, "দেখ বাবা, ছেলে আমার যেখানে বিয়ে করলে সুখী হয়, নিশ্চয়ই সেখানে বিয়ে দেব; কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই বড় আশা ছিল ওর উপর। সে বি.এ. পাশ করবে, ব্যারিষ্টার হবে। এই অল্প বয়সে বিয়ে করলে সে সব আশা আমার চূর্ণ হয়ে যাবে। যাক, যখন গোঁ ধরেছে তুমি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাও।"

ওদিকে মেয়ের বাপকে ওর ভাই আমার সেই চিঠি দেখিয়েছে এর ভিতরই। চিঠিতে অবশ্য চিরশাশ্বত প্রেমের কথাই। তার বাপ পড়েছেন জানতে পারলাম, মনে মনে খুশীই হয়েছেন, কারণ মনে মনে নাকি তিনি এমনিই একটা সেতু রচনা করেছিলেন। এটা জানতে পারলাম আমার ভগ্নীপতি যখন খবর নিয়ে এসে আমার বাবাকে বললেন, "হ্যাঁ, এ প্রস্তাব তাঁরা সানন্দে গ্রহণ করেছেন। এখন দিনক্ষণ ঠিক করে দেওয়া, দেনা-পাওনা ইত্যাদি।"

আমার মা ভাই-বোনেরা সবাই আনন্দে মাতোয়ারা। আমি খবরটা শুনে কেমন যেন ঝিম ধরে রইলাম।

মনে পড়ে বৈশাখ মাস। রাতে এসেছিল সারা দুনিয়া কাঁপিয়ে কালবোশেখীর ঝড়। ঘন্টাখানেক ছিল সে ঝড়ের বেগ। ঝড় থেমে গেছে। প্রকৃতি শান্ত। গ্রাম ঘুমে অচেতন।

আমি আমার ঘর ছেড়ে বাইরে এলাম। পুবের দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠে আকাশের চাঁদ ফেলেছে তার মায়াময় স্নিগ্ধ কিরণ! তাকিয়ে রইলাম পূর্ব দিকে। পূর্ব দিকেই আমার প্রিয়ার দেশ। কত কথা, কত কান্না, কত হাসি—তিন বছরের হাজরো দিনের লাখো স্মৃতি বায়োস্কোপের ছবির মত ভেসে উঠতে লাগল মনের পরদায়। শত সুরে গেয়ে উঠল অন্তর-বীণা। সে আসবে, সে আসবে, আমার কিশোর জীবনের কিশোরী প্রিয়া আসবে রাণীর বেশে, বধূর বেশে। আসবে ঘোমটা দিয়ে লাজনত আঁখি তুলে তাকাবে আমার মুখের পানে, বাহুবন্ধনে তাকে আনব আমার কাছে, মধুযামিনী হবে শেষ!

কিন্তু তারপর, তারপর এ কি? ভাবতেও যে শরীর শিউরে উঠে! আমার মনমোহিনী রাণী নেমে আসবে ধরার ধূলায়, আটপৌরে শাড়ী পরে কোমর বেঁধে ঢুকবে রান্নাঘরে— আমার ভাবী, বোন এদের মত সংসারের কাজে দেবে নিজেকে বিলিয়ে। রাণীর আসন থেকে নেমে এসে সম্মার্জনী হাতে আমার ঘরের স্তূপীকৃত জঞ্জাল আসবে সরিয়ে দিতে।

না না এ হতেই পারে না। আমার মানস-প্রতিমা, আমার জীবনের প্রথম প্রেমের কল্পতরুকে কিছুতেই পারব না স্বর্গ হতে ধরার ধূলায় নামিয়ে আনতে।

নেমে আসুক আমার কণ্ঠে বিরহের সুর, ফুটে উঠুক আমার কল্পনার তুলিতে বিরহী যক্ষের মেঘদূত, চাই না আমি আমার ধ্যানের ছবিকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করতে।

সারারাত ঘুমুতে পারলাম না। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্ন দেখছিলাম। স্পষ্ট মনে আছে, সে আমার শিয়রে এসে হেসে হেসে বলছে, "বড় জিনিষ লাভ করতে হলে বড় ত্যাগ আর সাধনা চাই।" ঘুম ভেঙে গেছে, কিন্তু বিড় বিড় করে বলছি, "বড় জিনিষ লাভ করতে হলে বড় ত্যাগ আর সাধনা চাই।" আমার ভগ্নীপতিকে গিয়ে বললাম, "হল না মিঞাভাই, হবে না, বাবাকে বলে দেবেন, তাঁর মনের গোপন বাসনাই আমি পূর্ণ করব। বড় জিনিষ লাভ করতে হলে বড় ত্যাগ আর সাধনা চাই।"

ত্যাগ আমি করলাম কিনা জানি না, তবে সাধনার পথে পা বাড়ালাম তার স্মৃতিকে আমার ধ্রুবতারা করে।

কলেজ জীবন

।। বি.এ'র দরজা থেকে ।।

আগেই বলেছি ছাত্র হিসাবে আমি নাম করা ছাত্রই ছিলাম। আই.এ. পাশ করে বাবাকে বললাম লক্ষ্ণৌ মরিস মিউজিক কলেজে পড়তে যেতে চাই, সেখানে গানও শিখব, কলেজে বি. এ'ও পড়ব। কিন্তু আমার এ আবেদন তিনি মন্‌যুর করেন নি। তখন কুচবিহার ছেড়ে নতুন এক পরিবেশে লেখাপড়া করার জন্য মনে জেগেছে আকুল স্পৃহা। রংপুর কলেজে ভর্তি হব বলে রংপুর গেলাম। দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মাঝখানে কলেজের সুদৃশ্য ইমারত, দূরে দূরে বাংলো প্যাটার্নের প্রফেসরদের কোয়ার্টার্স, সুন্দর সুন্দর ছাত্রাবাস। বড় ভালো লাগল। রাতে মুসলমান-ছাত্রাবাসে এক বন্ধুর কামরায় ঘুমাব বলে একখানা খাটে শয্যাগ্রহণ করলাম। বন্ধুবর মশারী খাটিয়ে দিব্যি নাক ডাকতে শুরু করলেন। আমি আর ঘুমুতে পারলাম না। মনে হল সারা বাংলার মশককুল রংপুর হোস্টেলে সেদিন এক ঐকতান বাদনের জন্য আহুত হয়েছে। তাদের পুন্ পুন্ গুণ্ গুণানি এবং আমার সশব্দ আক্রমণ দুয়েই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম রাত পোহালে কলেজের গণ্ডী ছেড়ে যেদিকে দুচোখ যায় বেরিয়ে পড়ব। এলাম রাজশাহী। বেশ লাগল বাড়ী ফিরে এসে। রাজশাহী কলেজে বি.এ. পড়ব এ বাসনাটা বাবাকে জানাতে তিনি মন্‌যুর করলেন।

রাজশাহী কলেজে চার মাস বি.এ. থার্ড ইয়ারে পড়েছিলাম। ফুটবল খেলা, গান-বাজনা, লেখাপড়া তিনটাই সমানভাবে চালিয়েছিলাম। জনবরেণ্য প্রফুল্ল রায় রাজশাহীতে এলেন। ছাত্রদের সভায় তিনি বক্তৃতা দিলেন। আমি গেয়েছিলাম সে সভায়, "ঘোর ঘোর রে আমার সাধের চরকা ঘোর।" আজো যেন আমার পিঠে তাঁর সাবাস্ সাবাস্ বলে ধপাস্ ধপাস্ করে কিলের ব্যথাটা ব্যথা-মধুর হয়ে জেগে আছে।

রাজশাহীর জলবায়ু সইল না। গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ী এসে দীর্ঘ একমাস রেমিটেন্ট ফিবারে ভুগলাম। আর বাবা আমাকে রাজশাহী যেতে দিলেন না, ভর্তি হলাম আবার কুচবিহারে।

বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে বড়খাতায় (রংপুর) গিয়েছি আমার এক বন্ধু আবুল হোসেনের বাড়ীতে। গান, পাখীশিকার, ফুটবল খেলে দিন পনের কেটে গেছে, অকস্মাৎ আমার বড় ভাইয়ের পেলাম টেলিগ্রাম—"বাবা মৃত্যুশয্যায় শীঘ্র এসো," সেই দিনই ছুটলাম বাড়ী।

তিন চারদিন পরে এক রাত্রে বাবার অবস্থা সত্যিই সংগীণ হয়ে উঠল। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল, শুধু নিঃশ্বাসটুকু বইছে। ঘরশুদ্ধ সবারই কান্নাকাটি উঠল। তখন রাত চারটা। আমি অকস্মাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ীর সামনের পুকুরে ওজু করে বাহির বাড়ীর দলিজে জায়নামাজে সেজদায় গিয়ে খোদার কাছে আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বললাম,

"অন্তর্যামী, জীবনে জ্ঞানোন্মেষের সাথে সাথেই এ জ্ঞান দিয়েছ যে বি.এ. পাশ করে মানুষ হতে হবে। এই বি.এ. পাশের জন্য তুমি জান মালিক ছুটে চলেছি। এই দুটি অক্ষর জীবনের ন্য তুমি ছিনিয়ে নাও। বিনিময়ে তুমি বাঁচাও আমার জন্মদাতাকে।"

কতক্ষণ জায়নামাজে পড়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ মনে হল বাড়ীতে কান্নাকাটি থেমে গছে, সূর্য উঠছে লাল হয়ে। ভাবলাম সব শেষ হয়ে গেছে, তাই সবাই চুপ হয়ে গেছে। য়ে ভয়ে বাবার ঘরে গেলাম। ঘর থেকে রোরুদ্যমান সবাইকে বের করে দেয়া হয়েছে। বার সমস্ত শরীরে স্বাভাবিক উত্তাপ ফিরে এসেছে। এদিকে-ওদিক চাইছেন, আমাকে খে বললেন, "বাবা ফজরের নামাজ পড়লে? ওঃ কী যেন একটা দুঃসহ পাথর এতক্ষণ মার বুকে চেপে ধরেছিল। এখন ভাল মনে হচ্ছে।"

খোদা আমার প্রার্থনা মন্‌যুর করেছেন। কোটী শুকুর তাঁর দরগায়, বাবা আমার নবজীবন লাভ করলেন। এরপর শারীরিক নানা অসুখ থাকা সত্ত্বেও তিনি দীর্ঘ ১১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাঁচেন। ১৯৪৫ সালে বলরামপুরে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নলিল্লাহে...রাজেউন)। কিন্তু সেবারে বাবার নবজীবন লাভের সাথে সাথে কলেজের নামকরা ছেলের নামটা আর গেজেটে ছাপার অক্ষরে বের হল না।

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাই অবাক। আমি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হই নি। খোদার উপর আমার বিশ্বাস আরও প্রগাঢ় হয়ে উঠল।

অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে বাবা আমাকে পাঠালেন আবার বি.এ'র দরজায়। আবার ভর্তি হলাম।

বি.এ. ফেল করে মাস তিনেক বাড়ীতে বসেছিলাম। সেই তিনমাস অমানুষিক পরিশ্রম করেছি। বাড়ী থেকে পাঁচ মাইল দূরে কৃষ্ণপুর নামে এক জায়গায় আমাদের এক হাটের ইজারা ছিল। সপ্তাহে দু'দিন প্রতি শনি ও মংগলবারে এই পাঁচ মাইল পথ হেঁটে যেতাম দুপুরের কাঠফাটা রোদ্দুরে সেই হাটে পয়সা তহ্‌শীল করতে। বাড়ীতে ফিরতে ফিরতে কোন কোন দিন রাত দশটা এগারোটা বেজে যেত। দুপুরে অসম্ভব গরম, রাতে ফিরবার সময় হয়ত আসত ভীষণ জোরে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি মাথায় করে পথ হাঁটতাম। কাল্‌জানি নদী একুল ওকুল দেখা যায় না। খেয়াপারে পাটনীর জন্য অপর পারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এক বৃদ্ধ মাড়োয়ারী রামরতন ঠাকুর তার নাম। সহানুভূতির সুরে আমাকে বলতেন, "তোমার এমন মিষ্টি গলা—তোমার কি আর এই সব কাজ পোষায়? কলকাতা যাও না—সেখানে কলের গানে গান দাও, কত টাকা পয়সা হবে।" আমি বলতাম, "আমি ত যেতে চাই ঠাকুর—বাবা যে যেতে দেন না।" বর্ষার মেঘের পরদা ফাঁক করে আকাশে চাঁদ উকি মারত। ঠাকুর মশায়ের কথার ইংগিতে যেন আকাশের মায়াময় চাঁদের হাসি দেখতে পেতাম। ঠাকুর মশায় বলতেন, আরে ভাই, গান গাও একখানা—বেটা নৌকা নিয়ে আসবে তাহলে তাড়াতাড়ি। গান ধরতাম—নদীর ঢেউয়ের উপর দিয়ে সে সুরের কাঁদন হয়ত কাঁপতে কাঁপতে দূরে মিলিয়ে যেত। বাড়ী থেকে কলকাতা দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণের আকাশে উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকতাম—ভাবতাম, কলকাতায় কত লোক কুলিমজুরী করেও দিন কাটায়—আমি কি কোন কাজ করে জীবন যাপন করতে পারব না সেখানে গেলে?

।। সি সংস্‌ আই হার্ড নো মোর ।।

পূজার ছুটিতে একবার বাড়ীতে এসেছি। ঝাঁকি-জাল দিয়ে মাছ ধরার সখ আমার। বাড়ী থেকে দু'মাইল দূরে ঝাপই নদীতে জাল দিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছি। মাছ ধরার নেশায় জাল বাইতে বাইতে নদীর ধারে ধারে বহুদূর চলে গিয়েছি। অকস্মাৎ বাঁশীর মত মিষ্টি কণ্ঠ কানে এল। অমন অপূর্ব মধুময় কণ্ঠ আমার জীবনে আর শুনি নি। কোথা থেকে গান ভেসে আসছে ঠিক করতে পারছিলাম না। স্বর ক্রমশঃ নিকটবর্তী। তারপর দেখি মহিষের পিঠে মহিষের মত বা তার চাইতেও কালো একটি ছেলে গাইতে গাইতে মহিষটাকে পানি খাওয়াবার জন্য নদীতে নামিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে গান তার বন্ধ হয়ে গেল। কাছে গিয়ে কত অনুনয় করলাম—সিগারেট দিতে চাইলাম—আর কিছুতেই তাকে রাজী করতে পারলাম না। জীবনে অমন কণ্ঠ আর শুনি নি।

কুচবিহারে মাঝে মাঝে জলপাইগুড়ি থেকে কুমার সরোজ রায় কত সব রকম গান কি মিষ্টি কণ্ঠেই না গাইতেন। আমরা তখন কলেজে পড়ি। তিনি কুচবিহার এলে তাঁর গানের আসর বসত সরকারী উকিল রাজেন রায়ের বাসায়। রাজেনবাবু তখনকার দিনে সারা উত্তর বংগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খেয়াল গাইয়ে ছিলেন। অমন দরাজ কণ্ঠ আর দ্বিতীয়টি শুনিনি আজ পর্যন্ত। সেতারেও তাঁর মিষ্টি হাত ছিল। সরোজ বাবুকে শেষে "সরোজদা" বলে ডাকতাম। তাঁর কাছে শোনা গান—"ওরে মাঝি তরী হেথা বাঁধব নাকো" আমি প্রায় শততম রজনী কলকাতা রেডিওতে গেয়েছি। তাঁর গলার অভিনবত্ব ছিল—যত উপরের পর্দায় গাইতেন ততই পাপিয়ার মত মিষ্টি লাগত। তাঁর গলায় বেস পার্ট বা খাদ বেশী ছিল না বলে রেকর্ড জগতে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন নি।

এই সরোজদার গান শোনার জন্য রাজেনবাবুর বৈঠকখানাও নিমন্ত্রিত শ্রোতাদের দ্বারা ভরে উঠত। আমরা রবাহুতের দল বাইরে বসে চুপ করে শুনতাম আর আমি মনে মনে খোদার কাছে বলতাম—"খোদা এমন গায়ক কবে হতে পারব, যেদিন আসরের সবার উৎসুক দৃষ্টি শুধু আমার উপর নিবদ্ধ থাকবে।"

আমিও তখন রাজেনবাবুর কাছে পরিচিত ছিলাম। তাঁর ছেলে সুনীল রায় আমার বাল্যবন্ধু। সুনীলকে তিনি খেয়াল শেখাতেন মাঝে মাঝে। আমার কণ্ঠেরও তারিফ করতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি মুখ ফুটে কোনদিনও আমাকে শেখাতে চান নি আমিও তাই শিখবার মহা আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁকে কিছু বলি নি। সরোজদার আসর বসলে তিনি আমাদের মত চুনোপুঁটিকে পাত্তা দিতেন না কিন্তু মনে মনে প্রশ্ন জাগত এমন আসরে গাইবার সুযোগ কি জীবনে আসবে না?

আমার আর একজন বাল্যবন্ধু এবং বি.এ. পর্যন্ত সহাধ্যায়ী সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনিয়ার দরাজ কণ্ঠ কুচবিহারবাসীর কাছে পরিচিত। সেই দরাজকণ্ঠের সাথে একটি জিনিষের একটু অভাব ছিল, সেটা হচ্ছে কণ্ঠে সুরের মাধুর্য। সেই মাধুর্য একটু বেশী পরিমাণে তাঁর কণ্ঠে বিরাজ করলে আজ সে বন্ধুটিও সারা বাংলায় সুপরিচিত হতে পারত। আমার জীবনে সে জড়িয়ে আছে এবং থাকবে—কারণ ছেলেবেলায় তুফানগঞ্জ হোস্টেলে থাকতে ওরই

হারমোনিয়াম এনে নিজে নিজেই হারমোনিয়াম বাজাতে শিখেছি। বন্ধুর সেই উপকারের কিছুটা শোধ দেবার জন্য তাঁকে দিয়ে কয়েকখানা ভাওয়াইয়া গান রেকর্ড করিয়েছি—কিন্তু রেকর্ড-জগতে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন নি।

কুচবিহারে আমাদের গানের আসর বসত আমার আর এক অকৃত্রিম বন্ধু এবং সহাধ্যায়ী সত্যনারায়ণ শুকুলের বাসায়। সে বন্ধু একাধারে অভিনেতা, কবি, সাহিত্যিক এবং ভাল তবলা বাজিয়ে। কলেজ ছুটির পর রোজ বিকালে তার বাসায় প্রায় সাত-আট জন গাইয়ে জুটতাম গিয়ে। তাল-সহযোগে গান গাওয়ার অভ্যাস ঐখান থেকেই শুরু হয়। আমি আজীবন এজন্য সত্যশুকুলের কাছে ঋণী। শুধু কি তাই? আমার প্রথম রেকর্ড যখন বাজারে বের হল সত্যশুকুলই তখন কলেজের প্রফেসর, ছাত্র সবাইকে একদিন ওর বাসায় নিমন্ত্রণ করে তখনকার প্রিন্সিপ্যাল যতীন সেনগুপ্ত মহাশয়কে সভাপতি করে আমাকে এক মানপত্র প্রদান করে। জীবনে প্রথম স্বীকৃতি রেকর্ড-গায়ক হিসাবে ওরই কল্যাণে এবং প্রচেষ্টায়। আমার এই অকৃত্রিম সুহৃদটি আজ প্রায় ষোল বছর থেকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে কাশীধামে দিন কাটাচ্ছে।

কুচবিহারে আমার একজন প্রফেসর আমাকে বি.এ. পড়বার সময়ই বারবার উৎসাহ দিয়ে বলতেন, "কলকাতা যাও আব্বাস, কেন এখানে পড়ে আছ? রেকর্ডে গান দাও। অদ্ভুত সুন্দর তোমার গলা।" তিনি অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীচুণীলাল মুখার্জি। পরবর্তীকালে চুণীবাবু অধ্যাপকের পদে ইস্তফা দিয়ে কুচবিহারে বিরাট ব্যবসা করে বেশ সংগতিপন্ন অবস্থা করেছেন। আজও দেখা হলে তিনি বলে ওঠেন, "কেমন আব্বাস, তোমাকে বলিনি কলকাতায় যাও?"

।। দেশভ্রমণে ।।

দেশ বিদেশ দেখবার দারুণ ইচ্ছা অতি ছোটবেলা থেকেই। বাবা'ত কিছুতেই আমাকে চোখের আড়াল করতে চাইতেন না। তা না হলে কি বাড়ীর কাছে বারো মাইল দূরে হাইস্কুল থাকতে তিনি বাড়ীর স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পড়িয়ে জীবনের কতগুলো বছর মাটি করতেন? নেহাৎ যখন আর গ্রামে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় নেই তখন বাধ্য হয়ে কুচবিহারে পাঠাতে হয়েছিল। তাঁর হুকুম ছাড়া কুচবিহার রাজ্যের বাইরে বড় জোর রংপুর পর্যন্ত গিয়েছি। আই.এ. পরীক্ষা দিয়ে এক সুযোগ এল। আমার গ্রামের এক মাড়োয়ারী বন্ধুর বিয়েতে বিকানীর নিয়ে যাবার জন্য আমার বাবার কাছে বন্ধু প্রস্তাব দিল। "না যাওয়া হবে না" এই রায় তিনি দিলেন। আমি বাবাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, দেশ বিদেশ দেখবার এমন সুযোগ কি ছাড়তে আছে? কিন্তু কিছুতেই মত দেন না। শেষে যখন দেখলেন নেহাৎই নাছোড়বান্দা তখন নিমরাজী হয়ে মত দিলেন আর কি। চললাম মাড়োয়ারের পথে কুচবিহার থেকে কাটিহার লাইনে। যেতে প্রায় চারদিন লাগল। আজকালকার মত তখন এক্সপ্রেস, মেইল এসব ট্রেন খুব কম চলত। যাক, চারদিন ধরে পথে ভাতের মুখ দেখিনি। ওখানে পৌঁছেই বন্ধুকে বললাম, "বন্ধু ভাতের জোগাড় কর।"

চমৎকার দেশ—লাড্‌নু গ্রাম। কিন্তু গ্রাম ঠিক নয়, বিরাট ইমারত। বাংলা দেশ থেকে নিয়ে ঘর দুয়ার সোনা মাণিক্যে ভরিয়ে ফেলেছে। এক একটা ঘর শুধু রুপোর গ্লাশ দিয়ে সাজিয়েছে—কোনটা বা শুধু সোনার গ্লাশ দিয়ে সাজিয়েছে। ঝাড়-লণ্ঠন, গালিচা। ত্রিশ বছর আগের কথা, তখুনি যা দেখেছি, এতদিনে হয়ত বা সে দেশ আগাগোড়া সোনা দিয়ে মুড়ে ফেলেছে।

ওদের গুরুদেবের আখড়ায় একদিন গিয়েছিলাম। মুসলমান বলে সেই সৌম্যশান্ত পুরুষটি আমাকে হতাদর করলেন না, বরং তাঁর শুভ্র আসনের পাশে আমাকে বসিয়ে বললেন, "শুনা হ্যায় গানা ভি আতা হ্যায় বাবা, কুচ্‌তো শুনাও।" আমি গেয়েছিলাম—

হবিনাম শিমরে সুখধাম জগতমে
জিউ না দুদিন কা
পাপ কপট ক্যর মায়া ছোড় ক্যর
বাস হুয়া বন কা মেরে রামা

এরপর আবার তাঁর অনুরোধে গেয়েছিলাম "মুখরা ক্যা দেখো দরপণমে।" আজও মনে পড়ে সেই ধূ ধূ বিস্তৃত মরুভূমিতে বিকালে সবাই মিলে বেড়াতে যেতাম দল বেঁধে। হরিণ আর ময়ূর কাছে এসে তাকিয়ে থাকত সুন্দরভাবে, অতি অপূর্ব সে দৃশ্য।

মাড়োয়ারে দু'মাস ছিলাম। দেশে ফিরবার পথে জয়পুর, যোধপুর, আজমীর, মথুরা, বৃন্দাবন, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, আগ্রা প্রভৃতি জায়গা দেখে আসি।

জয়পুর শহরটি অতি চমৎকার। বিরাট প্রশস্ত রাস্তা। এক রাস্তার দু'ধারে একই রঙের দালানের সারি—আবার অন্য রাস্তায় অন্য রঙের একই ডিজাইনের বাড়ী। যাকে বলে সুপরিকল্পিত নগরী। ওখান থেকে টাঙায় চড়ে পুরান জয়পুর শহর 'অম্বর' দেখতে গিয়েছিলাম। পাহাড়ের উপর রাজা মানসিংহের রাজপ্রাসাদ দেখে কত ইতিহাসের পাতাই যে ভেসে উঠল মনের পাতায়। যশোরের এক বিরাট কালীমূর্তি সেই প্রাসাদের একটি কক্ষে রক্ষিত আছে। সেই কালী মূর্তির চোখদুটো সোনার। চোখের দিকে তাকালে ত্রাসের সঞ্চার হয়। সমস্ত শহরটা জনশূন্য হয়ে পড়ে আছে। সেখানে এখন শুধু বাস করছে কিস্কিন্ধার প্রাণীরা। জয়পুর থেকে আজমীর শরীফে গিয়ে খাজা বাবার মাজার জিয়ারত করি। সেখানে দুটো ডেক্‌চিতে যা শিরনী রান্না হয় তাতে হাজার হাজার লোকের কেউই সে তবার্‌রুক্ থেকে বঞ্চিত হয় না। দেখলাম আনা সাগর। সেখান থেকে গেলাম পুষ্কর তীর্থ। মরুভূমির মাঝখানে হ্রদের মত পুষ্করিণী দেখে প্রাণটা সজীব হয়ে উঠল। সেই হ্রদের চারধারে বিরাট বিরাট বাড়ী। বড় সাধ হল ডুবে স্নান করি কিন্তু দেখলাম হাঙর কুমীরে ভর্তি সেই পুকুর, কাজেই যাকে বলে ঘাট-গঙ্গায় অবগাহন তাই সেরে নিয়ে পাহাড়ের ধাপ বেয়ে বেগে উঠলাম সতীতীর্থে।

শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছিল—হিন্দু-মুসলমানের তীর্থক্ষেত্রগুলিও যেন হাত ধরাধরি

করে গড়ে উঠেছে। আজমীরে লক্ষ লক্ষ যাত্রী যায় খাজাবাবার মাজারে, আবার হিন্দুরাও তেমনি যায় পুষ্করতীর্থে, সতীতীর্থে, ওদিকে জৈনরাও যায় তাদের শিল্পখচিত জৈন-মন্দিরে।

আজমীর থেকে এলাম আগ্রায়। তাজমহল দেখে মহাবিস্ময়ে শুধু স্তব্ধ হয়ে ভাবছিলাম—কে বলে এই সৌধ কত কালের! মনে হয় এই সেদিন এর কাজ শেষ হয়েছে—যমুনাকে বেঁধে যেন যমুনার তীরতটে শ্বেত-শুভ্রা-মর্মর—দেহা কোন অনিন্দ্যসুন্দরী নারী স্নিগ্ধ ধারায় অবগাহন করছেন। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। মেঘ-শুভ্র সুনীল আকাশ থেকে পৌর্ণমাসীর চাঁদ তার ষোলকণা যৌবনের উজ্জ্বল জ্যোতি বিকীরণ করছিল ধরণীর বুকে। রূপগরবিনী তাজও সেই হাসির স্নিগ্ধধারা গায়ে মেখে ছোট ছোট ঢেউ-জাগানো যমুনার জলে অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই তাজকে যেদিন বিদায় দিয়ে লক্ষ্ণৌর পথে রওয়ানা হই, জানি না কেন যেন অলক্ষ্যে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল ট্রেনের জানালা-পথে, মনে পড়েছিল আমার কিশোর কালের সেই প্রথম প্রিয়ার কথা।

কানপুরে এসে আমার এক সহপাঠীর বাসায় আশ্রয় নিলাম। কামাখ্যা মজুমদার। বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে সে এখানে অল্প বয়সে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। খুব ভালো গল্প লিখতে পারত, গল্প বলতে পারত আর সুন্দর বাঁশী বাজাতে পারত। ওর কাছে দিন দশ বারো থেকে বাড়ী ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়লাম। এরপর একটু জ্বরও হল। আমাকে বিদায় দিল সে। কুচবিহার এসে যখন হোস্টেলে উঠলাম আমাকে দেখে সবাই বলছে, "তোমার গায়ে মুখে এ সব কি?" আমি বললাম "কানপুরে ভয়ানক মশা।" অথচ অসম্ভব মাথা ব্যথা। ডাক্তার এসে বললে, "এ ত স্মল পক্স"।...আধঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত হোস্টেল ফাঁকা হয়ে গেল। ঘরে আমি একা। সেই বিপদে আমার পাশে এসে যে দাঁড়াল সে রেয়াজ মিঞা—তখন তিনি বি.এ. পড়েন। সেবা শুশ্রূষা তিনিই আরম্ভ করলেন। বাড়ীতে খবর গেল। পুষ্প রোজাকে সাথে নিয়ে বাবা এলেন—দু'চার দিনেই সব শুকিয়ে গেল। তারপর বলরামপুরের বাড়ীতে আসি। আমি গরুর গাড়ীতে আর বাবা সমস্তটা পথ হেঁটে এসেছিলেন, আজও মনে পড়ে। ভাল হয়ে যখন উঠলাম বাবা তখন আদর করে বলেছিলেন, "বাবারে, এইজন্যই তোমাদের চোখের আড়াল করতে চাই না।"

।। কলেজ জীবনের টুকিটাকি ।।

কুচবিহারে বি.এ. পড়ি। আমার এক হিন্দু বন্ধু, নাম বললাম না, আমাদের নিমন্ত্রণ করল, "চল যাই মাথাভাঙা (কুচবিহারের একটা সাবডিভিসন) আমার বড় ভাইয়ের জন্য মেয়ে দেখতে!" আমি বললাম, "আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভবপর হবে না।" মেয়ে দেখে এসে মাসখানেক পরে আবার এসেছে আমার হোস্টেলে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে। বিয়ের চিঠিতে দেখি এই বন্ধুরই বিয়ে। বললাম, "ব্যাপার কি রে, তোর বড় ভাইয়ের জন্য পাত্রী দেখতে গেলি, এ যে তোর-ই বিয়ে"। বললে, "ভাই এক মজার ব্যাপার হয়েছে। মেয়ে ত' দেখতে গেলাম—অর্থাৎ বৌদি নির্বাচনে। বললাম, গান জানেন? মেয়ে সলাজ হেসে বললে, "জানি সামান্য।" বললাম "গান শোনান একখানা।" গান ধরলেন তিনি—

এতদিন যে বসেছিলাম পথ চেয়ে আর কালগুণে
দেখা পেলেম ফাল্গুনে
বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়
এ কি গো বিস্ময়

... ...

মন্ত্র তোমার গোপন রাখ কোন তূণে!

গান শুনে মনে হল, এ গান আমাকেই লক্ষ্য করে গাওয়া হল। বাড়ী এসে মার কাছে বায়না ধরলাম, "ও মা, দাদার জন্য অন্য বৌদি ঠিক করে এনে দেব—ও মেয়েকে আমিই.....।" দিন দশেক হল বড় ভাইয়ের বিয়েও হয়ে গেছে। এখন আমার এ বিয়েতে তোকে যেতেই হবে ভাই। আমি বললাম, "ওরে, এতে তোর ক্ষতি হবে না ত'? যে গান দিয়ে তোকে জয় করেছে তার জবাব ত' দিতে পারিস নি। গান জানিস না। আমি যদি গান দিয়ে তার জবাব দিই তুই তাহলে কোথায় থাকবি বল?"

বি. এ. পড়বার সময়ই আমাদের হোস্টেলের এক ভদ্রলোক বিয়ে করে ফেললেন। আমি বাংলা ভাষায় একটু সাহিত্যচর্চা করি। ভদ্রলোক জানতেন। একদিন আমার ঘরে এসে বললেন, "আপনার সাথে আমার একটু গোপন কথা আছে। দরজাটা বন্ধ করে দিই।" আমি বললাম, "কী এমন কথা বলুন।" ভদ্রলোক বলি বলি করেও দুচার মিনিট ধরে নানা ভূমিকা করতে লাগলেন। তারপর সলজ্জভাবে বললেন, "দেখুন, আমি বিয়ে করে এসেছি, সে কথা ত' শুনেছেন। তা আমার বাংলা ভাষায়ও জোর নেই আর হাতের লেখাও যাচ্ছে তাই। কাজেই আপনি যদি দয়া করে আমার হয়ে আমার স্ত্রীর কাছে একখানা মানে যে এই প্রথম চিঠি লিখে দেন।" আমি হাসব কি কাঁদব ঠিক করতে পারছি না। বললাম, "দেখুন, আবার বলুন। আমার শুনতে ভুল হল কি? চিঠি লিখব আমি আপনার স্ত্রীকে? কি বলে সম্বোধন করব?" তিনি এবার বললেন, "আহা, আপনি ত' কবি মানুষ ; স্ত্রীকে এই ধরুন প্রথম প্রেমপত্র।" বুঝলাম ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। বললাম, "আপনি ঘরে যান, কাল সকালেই পাবেন।".....ওঃ কী বিষম পরীক্ষা ! রাতে বসে লিখলাম দীর্ঘ প্রেমপত্র! সে চিঠির কপি ত' আর নেই। তবে ব্যাপার কি দাঁড়িয়েছে অতঃপর তাই বলছি।

ভদ্রলোক পরদিন সকালে আমার ঘরে এলেন। আমি বললাম, "চিঠিখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে পড়ুন এবং দয়া করে ভুল করে আবার এইখানাই পাঠাবেন না। এই চিঠি আপনার হাতে নকল করে দেবেন। তিনি বললেন, "একশো বার।"

তিনি আবার একদিন এসে আমাকে বললেন, "দেখুন, আপনার কাছ থেকে চিঠি লিখে নিয়েছি বলে ইজ্জত রক্ষা হয়েছে। এবার আর একখানা লিখে দিন"। আমি বললাম, "আগের খানার উত্তর পেয়েছেন?" তিনি আমতা আমতা করে বললেন, "হ্যাঁ, না—তা, হ্যাঁ পেয়েছি।" আমি বললাম, "সেখানা না পড়লে উত্তর দেব কি করে?" বাধ্য হয়ে ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর চিঠিখানা আমার টেবিলে রেখেই লজ্জাবতী লতার মতই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

চিঠি পড়ে শিরে করাঘাত করে উঠলাম। এ যে দস্তুরমত সাহিত্যিকার চিঠি। উচ্ছ্বাস, আবেগ, মান, অভিমান, বিরহ, দীর্ঘশ্বাস, চোখের জল এ ত' আছেই, সব চেয়ে মারাত্মক কথা "তোমার মুক্তার মত হাতের লেখা, আর আমার এই কাকের ঠ্যাং—" বলে কি, এ হাবাচন্দ্র দেখি আমার আস্ত চিঠিখানাই পাঠিয়েছে। তার ঘরে গিয়ে বললাম, "উত্তর ত' দেব কিন্তু মহা বিভ্রাট করে বসেছেন যে। আমার চিঠিখানাই যে পাঠিয়েছেন। এরপর ত' আপনি স্ত্রীর কাছে হবেন ইম্‌পস্টার।" ভদ্রলোক বললেন, "না না, এবার আর তা হবে না।" মনে মনে বললাম, "তবেই হয়েছে।"

যাক্, এবার আরও ভাবোচ্ছ্বাস তরংগায়িত করে রূপালী স্বপ্নের রঙীন কল্পনাকে যতখানি রূপায়িত করা সম্ভব পত্রের প্রতি ছত্রে ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস করলাম। বললাম, "দোহাই, এবার কিন্তু চিঠিখানা কপি করে দেবেন।" কিন্তু ভদ্রলোকের মনে ধরেছে রঙীন ফানুস। এ ফানুস যে একদিন ফেটে তার মুখের উপর শব্দ করে উঠবে—একি তখন ভাবতে পেরেছেন তিনি?

যথাসময় গ্রীষ্মের বন্ধের ছুটিতে দেশে গেছেন তিনি। বন্ধ শেষ হয়ে গেছে। হোস্টেল আবার সরগরম। তিনিও এসেছেন, কিন্তু ভদ্রলোকের আর পাত্তা নেই, অর্থাৎ আমার রুমের সামনে দিয়ে ত' যানই না, এমনি খাওয়ার ঘরেও লক্ষ্য করেছি, আমি খেতে এলে তিনি দরজা থেকে আমাকে দেখেই আবার স্বঘরে ফিরে যান। কৌতূহল হল। যার নাড়ীর খবর, নারীর খবর পর্যন্ত আমাকে জানবার সুযোগ দিলেন তিনি কিনা আর দেখাটি পর্যন্ত করেন না।

হঠাৎ একদিন গিয়ে তাঁর রুমে হাজির হলাম। "এই যে আদাব, কেমন আছেন?" "বসুন, ভাল আছি।" "কী ব্যাপার আর আপনার দেখা নেই, বাড়ীতে, মানে যে সব ভাল? ভাল কথা—চিঠিগুলো পড়ে তিনি খুব খুশী হয়েছেন?"

এবার তিনি কথা বললেন, "আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। আমার জীবনে বড় ট্র্যাজেডি নেমে এল দেখছি।" আমি সহানুভূতি দেখিয়ে বললাম, "আহা কী হয়েছে বলতে যদি দোষ না থাকে তা হলে—।"

তিনি বললেন, "দেখুন আপনার লেখা চিঠির উত্তর যা পেয়েছি (আপনিও দেখেছেন) তাতে মনে মনে আমি এই ছবিই এঁকেছি যে আমাদের বিবাহিত জীবন হবে বেশ মধুময়, কাব্যিক! প্রথম রাতেই তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আমার চিঠিগুলো তোমার কেমন লাগত?" সে উত্তর দিল, "আমি অত কী বুঝি?" ভাবলাম, লজ্জায় বলতে পারছে না। আবার বললাম, "আমার চিঠির উত্তরে তুমি যা উত্তর দিতে, তা আরও চমৎকার।" গ্রামের সরলা বালা। ফিক করে হেসে বললে, 'আমি কি অত বড় বড় বাংলা বুঝি? ওসব চিঠির উত্তর লিখিয়ে নিয়েছি শরিফা বুবুর কাছ থেকে।"

।। আমার প্রথম রেকর্ড ।।

নজরুলকে নিয়ে এলাম কলকাতা থেকে, ছাত্রদের মিলাদ উপলক্ষ্যে। দু'দিন রইলেন কুচবিহারে, কিন্তু গানে গানে কী যে উন্মাদনা সৃষ্টি করে গেলেন। আর ত' মনকে কিছুতেই

বইয়ের আখরে ধরে রাখতে পারি না। আমার মনের গহন বনে সুরের পাখী সর্বদাই বিচিত্র সুরকাকলিতে আমায় করে তোলে উন্মনা।

এরপর কাজিদার সাথে দ্বিতীয় দেখা দার্জিলিংয়ে। শৈলনিবাস দার্জিলিং। জীবনে দার্জিলিং গিয়েছি বহুবার। দার্জিলিংয়ের আবালবৃদ্ধবণিতার কাছে পরিচিত হবার সুযোগ এসেছিল একবার একদিনের একটি ঘটনায়। কাজিদা গেছেন দার্জিলিংয়ে। তখন রেকর্ডে গান দিই নি। নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হলে কাজিদার গান ও আবৃত্তির আয়োজন। তিল ধারণের স্থান নেই হলের ভিতর। বহু কষ্টে ঢুকলাম। কাজিদা তখন আবৃত্তি করছেন তাঁর বিপ্লবী কবিতা "বিদ্রোহী"। পূর্ণ নিস্তব্ধতা কক্ষে বিরাজমান। জলদগম্ভীর সুরে আবৃত্তি করে চলেছেন। প্রতিটি শ্রোতা পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর মুখের পানে। শেষ হওয়ার সাথে সাথে কি বিপুল করতালি। লুই জুবিলী স্যানিটোরিয়ামের এক পরিচিত ভদ্রলোক ষ্টেজের উপর বসে আছেন। আমার দিকে চোখ পড়তেই তিনি আমাকে ইশারায় ডাকলেন। বহু কষ্টে গেলাম। এরপর তিনি ধরলেন গান—গানের পর গান, তারপর গান। একটু বিরতির জন্য তিনি চায়ের পেয়ালায় মনঃসংযোগ করলেন। সেই ভদ্রলোক কাজিদার কানে কানে বললেন আমার উপস্থিতির কথা। তাঁর সাথে এই দ্বিতীয়বার দেখা। প্রথম দেখা ও জানাশোনা এর আগের বছর কুচবিহারে যখন মিলাদের সভায় নিয়ে আসি। কাজিদা বলে উঠলেন, "কই, কোথায়"? আমি সামনে এগিয়ে এসে আদাব করলাম। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ঘোষণা করলেন, "এক নতুন শিল্পীর সাথে আপানাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—শ্রীমান আব্বাসউদ্দীন।" নাম ত' বলে দিলেন কিন্তু কী গান গাই? বললাম, "আপনার গানই গাই কেমন?" সানন্দে অনুমতি দিলেন। ধরলাম—"ঘোর ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর।" এক গানেই আসর মাৎ। এরপর আবার চীৎকার। দার্জিলিংয়ে নেপালী ভাষায় একখানা গান শিখেছিলাম এর আগে। ধরলাম সেই গানখান,—

আজুরে ঘাঁউ ঘাঁউ
ভলিরে ঘাঁউ ঘাঁউ
পরশি তো ঘাঁউ যায়লা
লাইবরিয়া ঘাঁউ ঘাঁউ।।

ঘরে বহু নেপালী জনসাধারণ এ গান শুনে মহা খুশী। তার পরদিন নেপালীরা যেখানে যখন আমাকে দেখেছে নমস্কার করে বলে উঠেছে, "বাংগালিবাবু রামরছ—আজোরে যাউ যাউ ভলিরে রামরছ।" অর্থাৎ "বাংগালিবাবু বড় ভাল—আজোরে গান বহুৎ আচ্ছা গেয়েছো।" এরপর যতবার দার্জিলিং গিয়েছি—নেপালীদের কাছ থেকে পেয়েছি যথেষ্ট আন্তরিকতা, বন্ধুত্ব এবং প্রাণখোলা আনন্দ।

সুযোগ এল কলকাতা যাবার—আমার এক বন্ধু জীতেন মৈত্রের বিয়ের বরযাত্রী হয়ে। গ্রামোফোন কোম্পানীতে গেলাম। প্রফেসর বিমল দাসগুপ্ত তখন গ্রামোফোনে কাজ করেন। কুচবিহারে এঁর বাবা আমাদের স্কুলমাস্টার ছিলেন। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে তাঁকে গিয়ে বললাম, "বিমলদা, রেকর্ডে আমার গান দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন?" বললেন, "গাও

দেখি একখানা গান।" আমি গাইলাম কাজিদার 'কারার ঐ লৌহকপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট।' গলা শুনে তিনি খুবই খুশী হয়ে বললেন, "আচ্ছা, তোমার ঠিকানা রেখে যাও, চিঠি দেওয়া হবে"।

আমার তখন কার্সিয়াং যাবার কথা হচ্ছিল। বললাম, "আমি কুচবিহারে গিয়েই কার্সিয়াং যাব, সেখান থেকে আপনাকে চিঠি দেব"। বন্ধুর বিয়ে চুকে গেল।...কুচবিহার গিয়েই মাসখানেক পরে কার্সিয়াং গেলাম আমার দোস্ত মশারফ হোসেন ও তাঁর স্ত্রীসহ। সেখানে গিয়ে বিমলদাকে চিঠি লিখলাম। দিন সাতেক পরে জবাব এল, "রেকর্ড করবার জন্য চলে এস কলকাতায়"।

কী আনন্দই যে হল! জীবনে নতুন ঊষার সূর্যোদয় দেখতে পেলাম যেমন দেখেছি চিঠিখানা পাবার দুদিন আগে দার্জিলিংয়ের টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়। অপূর্ব বিস্ময়, অভাবিত পুলক, অব্যক্ত এক অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল চোখের সামনে ধীরে ধীরে আঁধারের কুহেলী সরিয়ে দিয়ে স্বপ্নোত্থিতের মত প্রথম সূর্যের স্বপ্রকাশ, আকাশের কোলে।

রবীন্দ্রনাথের গানের কলি মনে পড়ছিল,

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমন পশিল প্রাণের পর

না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

তেমনি মনে হল, রেকর্ডে গান দেবে, আমার আশৈশবের স্বপ্ন সফল হবে।

এলাম কলকাতায়। আমার দোস্ত মশারফ হোসেন আমার হাতে দিল একশটি মুদ্রা, বললে, "আরও দরকার হলে লিখো।" প্রথম গান শৈলেন রায়ের রচনা—"স্মরণ পারের ওগো প্রিয়" আর "কোন বিরহীর নয়নজলে বাদল ঝরে গো।" প্রথমখানার সুর সংযোগ একরকম শৈলেন রায় ও আমারই, দ্বিতীয়খানা ধীরেন দাসের।

তখনকার দিনে রেকর্ড হত বেলেঘাটায়। আমার সেদিন রেকর্ড হবে। আলাপ হল কে, মল্লিকের সাথে। আমি মুসলমান, একথা জানতে পেরে তিনি প্রথম আত্মীয়তার সুরেই আমাকে বললেন, "কী গান রেকর্ড করবে, গাও দেখি একবার"। আমার গান শুনে তিনি বললেন, "চমৎকার গলা। কিন্তু....ও বিমলবাবু, আজ ত' এর রেকর্ড হতে পারে না।" আমি ভড়কে গেলাম। এ কিরে বাবা—ভাল ত' বিপদ দেখছি। "কী ব্যাপার" বলে বিমলদা এগিয়ে এলেন।

কে, মল্লিক মশায় বললেন, "একে নতুন আর্টিষ্ট মশাই, তাতে আবার মুসলমান। দেখুন না গানের উচ্চারণ ; আজ থাক। সারাদিনে আমি ওর উচচারণগুলো ঠিক করে দিই—কাল রেকর্ড করবেন।" প্রাণে এতক্ষণে জোর এল। বিমলদা বলে উঠলেন, "হবে না—জাতের টান ত'।"

এ কথার অর্থ আমি বুঝলাম না। জিজ্ঞাসু নয়নে কে, মল্লিক মশায়ের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি হেসে বললেন, "উনি ঠিকই বলেছেন, আমিও ত' মুসলমান"। আকাশ থেকে ফেরেশ্‌তা নেমে এসে হলফ করে বললেও বিশ্বাস করতাম না। কেমন করে করি? বললাম, "কিন্তু ছেলেবেলা থেকে ত' শুনে আসছি আপনার গান, ঐ শুধু "আর কবে দেখা দিবি মা" "ওমা অন্তে যেন ও চরণ পাই—" এই সব গান।" তিনি হেসে বললেন, "তাতে কি হয়েছে? গান গান, তাতে হরিই বা কী শ্যামাই বা কী"। মনের সন্দেহ তবু যায় না, যাক্‌গে তাঁর অতি যত্নের রেকর্ডের উচ্চারণভংগীগুলি দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই আয়ত্ত করে ফেললাম। তাঁর এই অযাচিত উপদেশ ও শিক্ষার জন্য আমি এখনও তাঁকে পরম শ্রদ্ধার সাথে নিত্য স্মরণ করি। আমার রেকর্ডের গান উচ্চারণদোষে দুষ্ট নয়—একথা বোধহয় আমার রেকর্ড-শ্রোতারা স্বীকার করবেন।

রেকর্ডে গান দিলাম। গ্রামোফোন কোম্পানীর ম্যানেজার ভগবতীবাবু ষাট বছরের ঝাণু বৃদ্ধ। আমার ডিস্‌ক কপিটা বোধ হয় শুনেছেন, তাই তাঁর কাছে বিদায় নেবার দিন বললেন, "দেখুন, আমার ইচ্ছা যে আপনি কলকাতায় থেকে আরও অন্ততঃ আটখানা গান রেকর্ড করে যান"। সামনেই বিমলদা বসেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, "না না তা হয় না। ছেলেমানুষ, কার্সিয়াং থেকে এসেছে ঐখানেই থাক, বায়ু পরিবর্তন করবার সুযোগ পেয়েছে, যাক ঐখানে।" এরপরও ভগবতীবাবু প্রশ্ন করলেন, "কি তা হলে থাকবেন ক'দিন এখানে নতুন রেকর্ড করবার জন্য?" আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললাম, "না, কার্সিয়াংয়েই যাব আজ রাতে!"

আমার আসা-যাওয়া থাকা-খাওয়া ইত্যাদি সব মিলে আমাকে তিনশ' টাকা দিলেন। বাইরে এসে বিমলদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "বেশ ত' আরও আটখানা গান দিতাম ক্ষতি কি ছিল?" তিনি বললেন, "বোকা ছেলে, আরও আটখানা গান দিলে টাকা তোমাকে এই তিনশ'ই দিত। মাঝখান থেকে দু'বছর আর রেকর্ড কোম্পানী তোমাকে ডাকত না, কারণ ঐ রেকর্ড দু'বছর ধরে বের করত; ফলে গ্রামোফোন কোম্পানী উঠত ফেঁপে, তোমার পকেটে জ্বলত লালবাতি।"

রেকর্ড ত' করে এলাম। বন্ধু-বান্ধব সবাইকে বলেছি, দেখিস আমার গান রেকর্ডে বেরোবে। সবাই খুব খুশী। কিন্তু দু'মাস, চার মাস এমন কি ছ'মাস হয়ে গেল, রেকর্ড আর বেরোয় না বাজারে। এবার রেকর্ড করার ব্যাপার নিয়ে বন্ধুরা বেশ টিটকারি দেওয়াই শুরু করলে। আমাকে দেখলেই বলে ওঠে, "ঐ দেখ রেকর্ড গাইয়ে।" কেউবা বেশ টেনে টেনে বলে "হি-জ-মা-স্টা-র্-স্ ভ-য়ে-স্।"

গ্রামের বাড়ীতে এসেছি। আমার এক বন্ধু শশধরবাবুর চিঠি পেলাম, "তোর রেকর্ড বেরিয়েছে চলে আয়"। শহরে এসে সেই বন্ধুর বাড়ীতে গেলাম। সে বাড়ীতে মাঝে মাঝে গানের আসর বসত। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন বন্ধুবান্ধব বসে আছে দেখলাম। সবাই বেশ গম্ভীর। ব্যাপারটা যেন কেমন মনে হল। যে বন্ধুটি চিঠি লিখে আমায় আনিয়েছে, সে রেকর্ড বাজাতে শুরু করলে। এ রেকর্ড, সে রেকর্ড, প্রায় পাঁচ-ছ'খানা। একজন হো হো

করে হেসে উঠে বললে, "আরে আব্বাসের রেকর্ডখানা জুড়ে দে"। কিন্তু এত ঘটা করে আমায় ডেকে আমার রেকর্ড না বাজিয়ে যখন অন্য রেকর্ডই চালিয়ে যাচ্ছে তখন বুঝলাম নিশ্চয় এরা আমাকে সভা করে অপদস্থ করার মতলব এঁটেছে। আমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, "চলি ভাই, কাজ আছে।" সমস্বরে সবাই বলে উঠল, "আরে তোমার গানটা শুনে যাও"। আমার চোখ তখন ছলছল, বাইরে ছুটে গিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। জোড়হাত করে বললাম "তোমরা মাফ কর ভাই, রেকর্ডে আমি গান দিই নি, এতদিন মিছেই ধাপ্পা দিয়েছি"। এই কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছি এমন সময় আমার কণ্ঠের গান বেজে উঠল গ্রামোফোনের যন্ত্রের ভিতর দিয়ে—

'কোন বিরহীর নয়ন জলে বাদল ঝরে গো।'

তিন চারজন বন্ধু তখন আনন্দে, উচ্ছ্বাসে আমাকে একরকম শূন্যে করে কাঁধে তুলে নিয়ে এল। ওঃ বাবা, এত কষ্ট নিজের গান শুনবার জন্য!

শিল্পীর আসনে

।। কলকাতায় প্রতিষ্ঠা ।।

বৃহত্তর জীবনের অনাগত দিনগুলি হাতছানি দিয়ে ডাক দিচ্ছিল। যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম, বি. এ. পাশই জীবনের লক্ষ্য নয়। ওরে নীড়হারা, পথহারা গানের পাখী, ফিরে আয়। কলকাতার জনসমুদ্রে ডুবিয়ে দে তোর বি. এ. পাশের মোহ-তরী। এই সমুদ্রে ভেসে ওঠ, উঠে দাঁড়া। মনুমেন্টের সু-উচ্চ চূড়ায় গানের সুরে স্তব্ধ করে দে জনতার কলরব।

কলকাতায় চলে এলাম; অভিভাবকের বিনানুমতিতে, সোজা কথায় পালিয়ে এলাম। আমার বন্ধু জীতেন মৈত্র কলকাতায় আইন পড়ছে তখন। তার চেষ্টায় প্রখ্যাত আইনজীবী (কিছুকাল পূর্বে ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটর) তসকিন আহমদ সাহেবের বাড়ীতে আমার থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত হল। বিনিময়ে আমাকে সে বাড়ীর দু'তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে পড়াতে হবে। কিন্তু আমার হাত খরচের পয়সা চাই ত'। জলপাইগুড়ির শফিকুল ইসলামের (তখনকার ডি.পি. আই'র পি.এ.) সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাকে ডি.পি. আই অফিসে মাসিক ৪৫ টাকা বেতনে এক চাকুরী দিলেন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চাকুরী করি আর দু'বেলা ছাত্র পড়াই। তসকিন সাহেবের বড় ভাই তকরীম আহ্‌মেদ, ভারী সুন্দর বাঁশী বাজান। একদিন তাঁর বাঁশী শুনলাম, শুধু তাই নয়, ঠুংরীও গাইতেন চমৎকার—তারপর আরও অবাক হলাম, যখন দেখলাম তাঁর সেতার, তবলা ও পিয়ানোতেও চমৎকার হাত।

গ্রামোফোন কোম্পানীতে গেলাম। ভগবতীবাবু আমার গান নিতে চাইলেন। এবার গাইলাম শৈলেন রায়ের লেখা, "আজি শরতের রূপ দীপালি" আর জীতেন মৈত্রের লেখা, "ওলো প্রিয়া নিতি আসি তব দ্বারে মন-ফুল-মালা নিয়া"। গান দু'খানা অভিনবত্বে বাজারে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করল।

জীতেনের ভগ্নীপতির বাসায় গিয়ে মাঝে মাঝে গানের আসরে যোগ দিতাম। সেখানে নাকু ঠাকুরকে দেখতাম। তাদের বাসার বাজার সরকার। বাড়ীর বাজার করে দিয়ে ভদ্রলোক সারারাত উধাও হয়ে থাকতেন। ঠিক সকালে আবার বাজার করবার জন্য আসতেন। আমার গান শুনতেন, শুধু মুচকি মুচকি হাসতেন কিছুই বলতেন না। কে জানত যে এই নাকু ঠাকুরই ওদের বাসায় বাজার সরকারের কাজ করে সারারাত গোপনে গুরুগৃহে গিয়ে সাধনা করতেন উচ্চাংগ সংগীতে। এই নাকু ঠাকুরই হচ্ছেন ভারতের বিখ্যাত ওস্তাদ শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী।

কলকাতার পথে পথে ঘুরি, বিরাট কলকাতা। এই বিরাট, বিশাল শহরে কি কোনদিন প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারব না?—মনের এই সূক্ষ্ম অভিলাষ খোদা হয়ত মন্‌যুর করেছেন, তাই কি করে এর সূত্রপাত হল তাই বলছি।

একদিন জীতেন এসে বললে, "দেখ্‌, আজ কিন্তু পাঁচটার আগেই অফিস থেকে বাসায় ফিরবি। আমাদের আইনের ছাত্রদের রি-ইউনিয়ন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে সন্ধ্যা সাতটায় বিরাট এক গানের জলসা হবে। এই দেখ্‌, "হ্যাণ্ডবিলে তোর নাম ছাপা হয়েছে। না গেলে আমি বড় লজ্জা পাব"। হ্যাণ্ডবিলে আমার ছাপা অক্ষরে নাম দেখে খুশী হলাম বটে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক এই সব মহারথীদের নাম দেখে দস্তুরমত ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, "ওদের মাঝে আমি গাই কি করে? অত বড় বড় জাঁদরেল গাইয়ে।

"না ভাই, মাফ করিস, পারব না।" ও বললে, "আচ্ছা গাইতে হবে না। এদের গান ত' শুনতে পাবি, এইটাই ত লাভ"। আমি খুশী হয়ে বললাম, "হ্যাঁ, ঠিক নিশ্চয়ই আসব"। সাড়ে ছ'টার সময় ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে গেলাম। লোকে লোকারণ্য। ... ড্রপ উঠল সাতটায়। প্রথমেই কৃষ্ণচন্দ্র দে গান শুরু করলেন। কি মধুময় দরাজ কণ্ঠ। মুগ্ধ হয়ে গেলাম।.....গানের পর গান, তিনখানা গান গেয়ে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন। তারপর কে, মল্লিকের গানের সময় হলে বেশ কথাবার্তা ও গুঞ্জন উঠল। তারপর আরও দু'একজনকে আসরে নাবতে হল, কারও গানই জুৎসই হল না......। এবার আমার কাছে ক'টি ছেলে এসে মহাবিনয়ে বলে উঠল, "স্যার এবার ত' আপনাকে যেতে হয়"। আমি খোদাকে ডাকছিলাম, কিছুতেই আমি পারব না, পা ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে। এর মধ্যেই ড্রপ উঠল। এক ভদ্রলোক ঘোষণা করে দিলেন : এবার নবাগত শিল্পী মিঃ আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মদ আপনাদের গান শোনাবেন।

বলির পাঠার মত কাঁপতে কাঁপতে ষ্টেজে প্রবেশ করে হারমোনিয়ামটা কোলে টেনে নিলাম। জানি না খোদার কী মেহেরবানী, মুসলমান নাম শুনেই হোক বা আমার তখনকার পহিলে দর্শনধারী চেহারার গুণেই হোক জনতা খুব শান্তভাব ধারণ করল। প্রথমেই গাইলাম, "আমি শরতের রূপ দীপালি"। গান শেষে কী করতালি। ভাবলাম গান বুঝি খারাপ হয়েছে, শত চীৎকার উঠল, "আর একখানা"। গাইলাম, "কোন বিরহীর নয়নজলে বাদল ঝরে গো"। এ গান শুনেও মহা উল্লাস। "আবার, আবার! আর একখানা"! আমি চোখে ইশারা করলাম ড্রপ ফেলে দিতে। জীতেন এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। ... সেদিন অন্তত পঞ্চাশ ষাট জন ছেলে আমার ঠিকানা লিখে নিল। বুঝলাম, আল্লাহ আমার অন্তরের কামনা মন্‌যুর করেছেন।

এরপর থেকে আসতে লাগল প্রত্যহ কত নিমন্ত্রণ। স্কটিশচার্চ কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, "ওন" হোস্টেলে, বেকার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, হাওড়া, হুগলী, রাণীগঞ্জ, শ্যামবাজার, টালীগঞ্জ, ডায়মণ্ডহারবার থেকে আসতে লাগল আমন্ত্রণ! সরস্বতী পূজার রাতে হোস্টেল, স্কুল, কলেজ থেকে এত নিমন্ত্রণ আসতে লাগল যে বাধ্য হয়ে তখন আমার গানের জন্য কিছু পারিশ্রমিক বরাদ্দ করতে হল।

১২১ নং বি, বউবাজার ষ্ট্রীটের চারতলায় মেস। সেই মেসে প্রায় দু'বছর থাকি। পনের ষোলজন মেম্বার। অধিকাংশই চাকুরে। একজন ল' ক্লাশের ছাত্র—সিলেট বানিয়াচঙের আবদুল মজিদ। অমন পরোপকারী লোক খুব কম দেখেছি। মেসে কারো অসুখবিসুখ হলে

ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, পথ্য তৈরী করে খাওয়ানো, রোগীর শুশ্রূষা করা থেকে কারো দেশ থেকে কোন বিয়েশাদির ব্যাপারে কারুর খরচপত্র করবার জন্য সাহায্য করা, নতুন কেউ এলে তাকে নিয়ে শহরেব এটা ওটা দেখানো—মোটকথা সব কাজেই সবার প্রয়োজনে এগিয়ে আসতেন এই মজিদ সাহেব। এই মেসেই থাকতেন ডাঃ এনামুল হক। মাঝে মাঝে আসতেন ডাঃ শহীদুল্লা। ডাঃ শহীদুল্লার এক শ্যালক তাঁকে আমরা সবাই ডাকতাম জুমু ভাই বলে, ভাল নাম মিঃ মোতাদাইয়েন বি. এল। ওকালতি না করে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে চাকুরী করতেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারেব জন্য নববর্ষে আমরা মেসের সবাইকে যে উপাধি দিতাম, তাতে তাঁকে উপাধি দেওয়া হত—মোতাদাইয়েন দি জেন্ট্‌ল্‌ম্যান। পরবর্তীকালে পার্ক সার্কাসে আমরা একই বাসায় পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করি।

এই বৌবাজার মেসে থাকতে একদিনের একটা ঘটনা আজো ভুলিনি। সন্ধ্যার পর মেসে একদিন গানের জলসা বসেছে। আসর জমজমাট। আসরে চা চলছে, পানদোক্তার সদ্ব্যবহার করছেন অনেকেই। হঠাৎ এক পথচারী আমাদের ঘরে এসে হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত। ভদ্রলোকের ধুতি পাঞ্জাবী রক্তরাগ-রঞ্জিত। ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "উপর থেকে কে এ কাজ করেছেন? সাহস থাকে বলুন"! গান তখন থেমে গেছে। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে মনে হল চেনা চেনা। কাছে গিয়ে দেখি এ ভদ্রলোকের সাথে তো রোজই আমার দেখা হয় রাইটার্স বিল্ডিং পোষ্ট অফিসে। সেভিংস সেকশনে কাজ করেন। আর ভদ্রলোকের এ অবস্থাও যে আমিই করেছি। বলে উঠলাম, "আরে আপনি"? তিনিও বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, "আপনি এইখানেই থাকেন"। বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন গান বাজনা চলছে, পান খেয়ে উপর থেকে ও-কীর্তি আমিই করেছি, মাফ করবেন"। ভদ্রলোক গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলে ফরাসে বসে পড়লেন। বলে উঠলেন, "মাফ করব যদি গানের আসর আবার চলে"। আবার চা এল, পান এল, ভদ্রলোক চায়ে, পানে, গানে রঙীন হয়ে উঠলেন। তারপর তাঁর রঙীন পাঞ্জাবীটা আবার গায়ে দিয়ে রাঙা ঠোঁটে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

এই মেসের আর দু'জনের কথা ভুলিনি। বারাসাত-বসিরহাটে বাড়ী একজন তওক্কাল সাহেব, তাঁকে সবাই ডাকতাম, বড় ভাই বলে। তিনি মেসের মধ্যে সবারি বয়সে বড়। তিনি প্রত্যেক কথার মধ্যেই বলতেন 'মানে যে'। আমি মানে যে তাঁকে মানে যে ভীষণ মানে যে মানে যে করে খ্যাপাতাম। প্রথম প্রথম মানে যে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন নি, কিন্তু ক্রমশঃ মানে যে এত ঘন ঘন ঐ লফ্‌জ্‌টা বলতাম তাতে মানে যে একদিন তিনি দস্তুরমত রেগে গিয়ে আমাকে বকুনি দিতে গিয়ে শুধু মানে যে মানে যে ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলেন না।

আর একজন ছিলেন আমাদের সার্বজনীন নানা। তিনি বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্যা নিয়ে খুব রসাপ্লুত ছিলেন। আমরা সেই নানাকে নিয়ে যে কী রসালাপই করতাম!!

কলকাতায় তখন এই মেসজীবনে এক এক মাস এক একজন ম্যানেজার হতাম বাজার খরচ ও হিসাবপত্তর রাখার। মাসে দশটাকার বেশী খরচ উঠলে কী আলোড়ন উঠতো! আর সেই দশটাকাতে সারা মাসে মোটামুটি ভালো খেয়েও মাসের শেষে একটা গ্র্যাণ্ড ফিষ্ট হত।

।। ইসলামী গান, আমি ও কাজিদা ।।

কাজিদার লেখা গান ইতিমধ্যে অনেকগুলো রেকর্ড করে ফেললাম। তাঁর লেখা 'বেণুকার বনে কাঁদে বাতাস বিধুর', 'অনেক ছিল বলার যদি দু'দিন আগে আসতে', 'গাঙে জোয়ার এলো ফিরে তুমি এলে কৈ', 'বন্ধু আজো মনে রে পড়ে আম কুড়ানো খেলা' ইত্যাদি রেকর্ড করলাম।

একদিন কাজিদাকে বললাম, "কাজিদা, একটা কথা মনে হয়। এই যে পিয়ারু কাওয়াল, কাল্লু কাওয়াল এরা উর্দু কাওয়ালী গায়, এদের গানও শুনি অসম্ভব বিক্রী হয় এই ধরণেব বাংলায় ইসলামী গান দিলে হয় না? তারপর আপনি তো জানেন কিভাবে কাফের কুফর ইত্যাদি বলে বাংলার মুসলমান সমাজের কাছে আপনাকে অপাংক্তেয় করে রাখবার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে একদল ধর্মান্ধ! আপনি যদি ইসলামী গান লেখেন তাহলে মুসলমানের ঘরে ঘরে আবার উঠবে আপনার জয়গান।"

কথাটা তাঁর মনে লাগল। তিনি বললেন, "আব্বাস, তুমি ভগবতী বাবুকে বলে তাঁর মত নাও, আমি ঠিক বলতে পারব না।" আমি ভগবতী ভট্টাচার্য অর্থাৎ গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সেল-ইন-চার্জকে বললাম। তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, "না না না ওসব গান চলবে না। ও হতে পারে না।"

মনের দুঃখ মনেই চেপে গেলাম। এর প্রায় ছ'মাস পরে। একদিন দুপুরে বৃষ্টি হচ্ছিল, আমি অফিস থেকে গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সেল ঘরে গিয়েছি। দেখি একটা ঘরে বৃদ্ধা আশ্চর্যময়ী আর বৃদ্ধ ভগবতীবাবু বেশ রসাল গল্প করছেন। আমি নমস্কার দিতেই বৃদ্ধ বললেন, "বসুন বসুন।" আমি বৃদ্ধের রসাপ্লুত মুখের দিকে চেয়ে ভাবলাম, এই-ই উত্তম সুযোগ। বললাম, "যদি কিছু মনে না করেন তা হলে বলি। সেই যে বলেছিলাম ইসলামী গান দেবার কথা, আচ্ছা, একটা এক্সপেরিমেন্টই করুন না, যদি বিক্রী না হয় আর নেবেন না, ক্ষতি কি?" তিনি হেসে বললেন, "নেহাতই নাছোড়বান্দা আপনি, আচ্ছা আচ্ছা করা যাবে।"

শুনলাম পাশের ঘরে কাজিদা আছেন। আমি কাজিদাকে বললাম যে ভগবতীবাবু রাজী হয়েছেন। তখন সেখানে ইন্দুবালা কাজিদার কাছে গান শিখছিলেন। কাজিদা বলে উঠলেন, "ইন্দু তুমি বাড়ী যাও, আব্বাসের সাথে কাজ আছে।" ইন্দুবালা চলে গেলেন। এক ঠোংগা পান আর চা আনতে বললাম দশরথকে। তারপর দরজা বন্ধ করে আধঘণ্টার ভিতরই লিখে ফেললেন, "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।" তখুনি সুরসংযোগ করে শিখিয়ে দিলেন। পরের দিন ঠিক এই সময় আসতে বললেন। পরের দিন লিখলেন, "ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর।"

গান দু'খানা লেখার ঠিক চারদিন পরেই রেকর্ড করা হল। কাজিদার আর ধৈর্য মানছিল না। তাঁর চোখেমুখে কী আনন্দই যে খেলে যাচ্ছিল। তখনকার দিনে যন্ত্র ব্যবহার হত শুধু হারমোনিয়াম আর তবলা। গান দু'খানা আমার তখন মুখস্থও হয়নি। তিনি নিজে যা লিখে দিয়েছিলেন, মাইকের পাশ দিয়ে হারমোনিয়ামের উপর ঠিক আমার চোখ বরাবর হাত

দিয়ে কাজিদা নিজেই সেই কাগজখানা ধরলেন, আমি গেয়ে চললাম। এই হল আমার প্রথম ইসলামী রেকর্ড। দু'মাস পরে ঈদুল ফেতর। শুনলাম গান দু'খানা তখন বাজারে বের হবে।

ঈদের বাজার করতে একদিন ধর্মতলার দিকে গিয়েছি। বি. এন. সেন অর্থাৎ সেনোলা রেকর্ড কোম্পানীর বিভূতিদার সাথে দেখা। তিনি বললেন, "আব্বাস আমার দোকানে এসো"। তিনি এক ফটোগ্রাফার ডেকে নিয়ে এসে বসলেন "এর ফটোটা নিন তো।" আমি তো অবাক। বললাম, "ব্যাপার কি?" তিনি বললেন, "তোমার একটা ফটো নিচ্ছি, ব্যস আবার কি?"

ঈদের বন্ধে বাড়ী গেলাম। বন্ধের সাথে আরো কুড়ি-পঁচিশ দিন ছুটি নিয়েছিলাম। কলকাতা ফিরে এসে ট্রামে চড়ে অফিস যাচ্ছি। ট্রামে একটি যুবক আমার পাশে গুন গুন করে গাইছে, "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে।" আমি একটু অবাক হলাম। এ গান কি করে শুনল? অফিস ছুটির পর গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়েছি, মাঠে বসে একদল ছেলের মাঝে একটি ছেলে গেয়ে উঠল....ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে। তখন মনে হল এ গান তো ঈদের সময় বাজারে বের হবার কথা। বিভূতিদার দোকানে গেলাম। আমাকে দেখে তিনি একদম জড়িয়ে ধরলেন। সন্দেশ, রসগোল্লা, চা এনে বললেন, "খাও।" আমার গান দুটো এবং আর্ট পেপারে ছাপানো আমার বিরাট ছবির একটা বাণ্ডিল সামনে রেখে বললেন, "বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিলি করে দিও। আমি প্রায় সত্তর আশী হাজার ছাপিয়েছি, ঈদের দিন এসব বিতরণ করেছি। আর এই দেখ দু'হাজার রেকর্ড এনেছি তোমার।"

আনন্দে খুশীতে মন ভরে উঠল। ছুটলাম কাজিদার বাড়ী। শুনলাম তিনি রিহার্সেল রুমে গেছেন। গেলাম সেখানে। দেখি দাবা খেলায় তিনি মত্ত। দাবা খেলতে বসলে দুনিয়া ভুলে যান তিনি। আমার গলার স্বর শুনে একদম লাফিয়ে উঠে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, "আব্বাস তোমার গান কী যে—" আর বলতে দিলাম না, পা ছুঁয়ে তাঁর কদমবুসি করলাম। ভগবতী বাবুকে বললাম, "তা হলে এক্সপেরিমেন্টের ধোপে টিকে গেছি, কেমন?" তিনি বললেন, "এবার তাহলে আরো ক'খানা এই ধরণের গান..." খোদাকে দিলাম কোটি ধন্যবাদ।

এরপর কাজিদা লিখে চললেন ইসলামী গান। আল্লা-রসুলের গান পেয়ে বাংলার মুসলমানের ঘরে ঘরে জাগল এক নব উন্মাদনা। যারা গান শুনলে কানে আংগুল দিত তাদের কানে গেল, "আল্লা নামের বীজ বুনেছি" "নাম মোহাম্মদ বোল রে মন নাম আহ্‌মদ বোল।" কান থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনল এ গান, আরো শুনল "আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়।" মোহর্‌রমে শুনল মর্সিয়া, শুনল "ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়"। ঈদে নতুন করে শুনল "এল আবার ঈদ ফিরে এল আবার ঈদ, চল ঈদগাহে"। ঘরে ঘরে এল গ্রামোফোন রেকর্ড, গ্রামে গ্রামে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আল্লা রসুলের নাম।

কাজিদাকে বললাম, "কাজিদা, মুসলমান তো একটু মিউজিক-মাইণ্ডেড হয়েছে। এবার তরুণ ছাত্রদের জাগাবার জন্য লিখুন"। তিনি লিখে চললেন, "দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে" "শহীদী ঈদগাহে দেখ আজ জমায়েত ভারী" "আজি কোথায় তখ্‌তে তাউস, কোথায় সে বাদশাহী"।

ইসলামী গান পাঁচ ছ'খানা বাজারে বের হওয়ার সাথে সাথে বাংলা দেশ থেকে বহু চিঠি আসতে আরম্ভ করল গ্রামোফোন কোম্পানীর ঠিকানায় আমার নামে। কেউ লিখল, হজুর, কুকুর মার্কা হলুদ রেকর্ড অর্থাৎ 'টুইনে' গান দিলে বারো আনা এক টাকায় আমরা অনায়াসে কিনতে পারি।

কাজিদাকে বললাম। তিনি তো খুব আপত্তি তুললেন। বললেন, "পাগল, এই কিছুদিনের মধ্যেই রেকর্ডে রয়ালটি প্রথা চালু হবে। আর্থিক দিক দিয়ে তুমি ভয়ংকর ক্ষতিগ্রস্ত হবে"। আমার শুধু মনে ভাবনা : গরীব মুসলমান, যদি বাবো আনা এক টাকায় রেকর্ড পায়, হোক গে আমার আর্থিক ক্ষতি, গানগুলো তো ঘরে ঘরে প্রচার হবে। জাগবে ইসলামী ভাব, জাতীয় ভাব। নাঃ, কাজিদা, হোক গে আমার আর্থিক ক্ষতি। তখন কোম্পানীর সাথে বন্দোবস্ত হল আমি টুইনেই গান দেব। তার দরুন রেকর্ড প্রতি কোম্পানী আমাকে মাত্র একশত টাকা করে দিতে রাজী হল। বাংলার গরীব মুসলমানের মুখ চেয়ে আমি আমার প্রায় প্রতিটি নামকরা ইসলামী গান টুইনে রেকর্ড করেছি। এইসব রেকর্ড থেকে তাই ঐ এককালীন একশত টাকা ছাড়া অর্থের দিক থেকে আমার কিছু জোটে নি।

কিন্তু প্রতিমাসে একখানার বেশী তো আর গান বের করতে পারে না কোম্পানী। অথচ ইসলামী গানের কী চাহিদা!! মাসে দু'তিনখানা বের হলেও বোধহয় সবি সমান বিক্রী হয়। তকরীম আহমদকে নিয়ে এসে তাঁকে দিয়ে চারখানা গান রেকর্ড করিয়ে নিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে আবদুল লতিফ নামে একটি ছেলেকে আবিষ্কার করলাম। ভারী মিষ্টি কণ্ঠ, সেও ক'খানা গান রেকর্ড করল। তিলজালার শাপগাছি গ্রামে তার বাড়ী। দুঃখের বিষয় ছেলেটি দু'তিন বছর রেকর্ড করেই মারা যায়।

আগেই বলেছি প্রায় প্রতিমাসেই আমার রেকর্ড বাজারে বের করা আরম্ভ হল। কিন্তু প্রতিমাসে গান বের হলে একজন আর্টিষ্টের গান একঘেঁয়ে হয়ে যায়। অথচ ইসলামী গান গ্রামোফোন কোম্পানীর ঘরে এনেছে অর্থের প্লাবন। তাই মুসলমান গায়কের অভাব বলে ধীরেন দাস সাজলেন গণি মিঞা, চিত্ত রায় সাজলেন দেলোয়ার হোসেন, আশ্চর্যময়ী, হরিমতী এঁরা কেউ সাজলেন সকিনা বেগম, আমিনা বেগম, গিরীণ চক্রবর্তী সাজলেন সোনা মিঞা।

যাই হোক আমার মনে কিন্তু দিনরাত খেলে যাচ্ছে এক অপূর্ব আনন্দোন্মাদনা। এই তো চাই। মুসলমানের ঘুম ভেঙেছে। তারা জেগে উঠে গাইছে "বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান"। এই তো আমার সারা জীবনের ছিল কামনা।

সব চাইতে ফ্যাসাদে পড়লাম কে. মল্লিককে নিয়ে। আমার জীবনে প্রথম রেকর্ড করার সময় মল্লিক সাহেবই আমাকে উচ্চারণভংগী শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একদিন আমায় ধরলেন। বললেন, "আব্বাস, আমার একটা উপকার করতে হবে ভাই"। আমি বললাম,

"একশোবার, কী করতে হবে বলুন"। তিনি বললেন, "দেখ, জীবন ভরে শ্যামাবিষয়ে গান গাইলাম, বাংলার মুসলমানদের ধারণা আমি মল্লিক মশায়, আমি হিন্দু, অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধররাও জানবে আমি মল্লিক মশায়। তা ভাই আমি যে মুসলমান এটা বলতে আর তো সংকোচের নেই। এই তো তুমি দিব্যি আব্বাস 'আব্বাস' হয়েই ঘরে ঘরে পরিচিত হলে। তা আমার দুঃখটা তুমিই পার ঘুচিয়ে দিতে। এই কাজি সাহেবকে বলে আমার জন্য মাত্র দু'খানা ইসলামী গান গাইবার বন্দোবস্ত করে দাও, আর সংগে সংগে ভগবতীবাবুকে বলেও—দেখ ও আমি নিজে বলতে পারব না, তুমি যদি ভাইটি"— আমি বাধা দিয়ে বললাম "আর বেশী বলতে হবে না, আমি আমার প্রাণপণ শক্তি দিয়ে এটা করিয়ে নেবই"।

বললাম কাজিদাকে। কিন্তু কোনও ফল হল না। তিনি বললেন, "আমি পারবো না, তুমি যদি ভগবতীবাবুকে রাজী করাতে পার। কারণ জান আব্বাস, এই মল্লিক মশায় যদি একবার ইসলামী গান দেন, তাহলে তাঁর শ্যামাবিষয়ক গানে বিক্রীর ভাটা পড়ে যাবে। হিন্দুরা যখন জানতে পারবে কে. মল্লিক মুসলমান তখন তার শ্যামাবিষয়ক গান আর কেউই কিনবে না। জানই তো, মল্লিক মশায়ের গলার সেই পেটেন্ট টান কিছুতেই যাবে না। ওর রেকর্ড বাজালেই ধরা পড়ে যাবে। তবে দেখ যদি ভগবতীবাবুকে রাজী করাতে পার।

ভগবতীবাবুকে বললাম। তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, "মশাই এ কি কথা। মল্লিক মশায়কেও শেষ পর্যন্ত আপনি!" আমি বললাম, "আজ্ঞে আমি নই, তিনিই"!

এরপর অবশ্যি ভগবতীবাবুর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। বৃদ্ধ বেচারী আমাদের এসব আবদার অভিযোগের দিকে কান না দিয়ে অকস্মাৎ একদিন পরপারে চলে গেলেন।

সে জায়গায় এলেন শ্রীহেমচন্দ্র সোম। এমন উদার মতাবলম্বী বন্ধুবৎসল মানুষ খুব কম দেখেছি। তাঁকে একদিন বলামাত্রই তিনি বললেন, "বেশ তো, মল্লিক মশায় বুড়ো হয়েছেন, গ্রামোফোন কোম্পানী লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁকে দিয়ে কামিয়েছে। তিনি যদি ইসলামী গান গেয়ে আনন্দ পান আলবৎ তাঁকে গাইতে দেওয়া হবে"।

কাজিদা ও মল্লিক সাহেব আমার উপর সেদিন কী খুশী!!

।। চাকুরী ও বিয়ে ।।

দু' বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলাম। বাংলা সরকারের কৃষি দফতরে একটা পাকা চাকুরী খালি হল, দরখাস্ত করলাম। চাকুরীটা হয়ে গেল। ডি. পি. আই অফিসের অস্থায়ী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে পাকা চাকুরীতে ঢুকলাম। আমার উর্ধ্বতন, কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ওয়েষ্টার্ন সার্কল, তিনি একদিন বললেন, "আচ্ছা, আপনার নাম কি সেই আজকাল যার রেকর্ডে খুব নাম শুনি....সেইই"? আমি অতি বিনয়ে বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ"। তাঁর নাম যদুনাথ সরকার। তিনি হেড এ্যাসিষ্টান্টকে ডেকে বললেন, "দেখুন, এঁকে কোনও জটিল কাজ দেবেন না। অফিসে এসে নাম দস্তখত করে যেখানে খুশী সেখানে যাবেন, বিশেষ করে দুপুরে যদি রেকর্ড করবার জন্যে রিহার্সেলে যেতে চান কক্ষণো বাধা দেবেন না।

আমার বিভাগে এমন লোক পেয়েছি এতো আমাদের সৌভাগ্য। বলাবাহুল্য বৃদ্ধ হেড এ্যাসিষ্টান্ট ধর্মদাসবাবু এনিয়মের কোন ব্যতিক্রম করেন নি। আমি তাই এই দুজনের কাছেই কৃতজ্ঞ। এঁদের কাছে বাঁধাধবা নিয়মে চাকুরী করতে গেলে সত্যিই আমি আমার সংগীতসাধনার পথে নির্বিবাদে এগুতে পারতাম না।

গ্রামোফোন কোম্পানীতে একদিন কাজিদার ঘরে হরিদাস, মৃণাল আর কে কে বসে বেশ গল্প হচ্ছিল। এমন সময় আমি গেলাম। জানি না কি ব্যাপার, হঠাৎ কাজিদা বলে উঠলেন তাদের উদ্দেশ্য করে, "দেখ তোমাদের কাছে একটা কথা বলি। আব্বাস আমার ছোট ভাই। দিন দিন গানে চমৎকার নাম করছে। যদি তোমরা কেউ একে কোনদিন খারাপ পথে নিয়ে যাও তাহলে তোমাদের জ্যান্ত রাখব না"। বলাইবাহুল্য কাজিদার একথা সবাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

একদিনকার একটা ঘটনা বলি। কবি শৈলেন রায় আমার বাল্যবন্ধু। অভিনেতা দুর্গাদাসবাবু ভারী রসিক লোক, শৈলেন ও আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। প্রায়ই আমাদের দুজনকে বলতেন, "একদিন হোক না একপাত্র। দোষ কি"? আমি একদিন বললাম, "আপনার হাতে হাতখড়ি হওয়া মানে তো অল ইন্ডিয়া রেডিওতে খবর বলা"। তিনি হেসে বলতেন, "আরে না না, কাকপক্ষীও জানতে পারবে না"। শৈলেন বলত, "তা দুর্গাদা আমাদের সজীব লিভারের ওপর আপনার এত হিংসা কেন"? নাঃ ডাল আর গলে না। দুর্গাদাসবাবুকে অনেকের কাছে বলতে শুনেছি, "বাবা এরা কাদায় বাস করে কিন্তু কাদা গায়ে মাখে না"।

গ্রামাফোন কোম্পানীর রিহার্সেল রুমটা ছিল তখন অতি জঘন্য জায়গায়। ১০৬ নং আপার চীৎপুর রোড, বিষ্ণুভবন। তার আশেপাশের বহুদূরে ভদ্রলোকের বাস ছিল না। ঐ দূষিত আবহাওয়ায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা কতদিন সম্ভবপব হবে এই নিয়ে দস্তুরমত চিন্তিত হয়ে পড়লাম। অকস্মাৎ একদিন মনস্থির করে ফেললাম। বাবাকে জানিয়ে দিলাম, আমি বিয়ে করতে রাজী।

হল্‌দিবাড়ীতে আমার দোস্ত মশারফ হোসেনের কাছে বাবা চিঠি দিলেন। আমার জীবনের অন্তরংগতম বাল্যবন্ধু আমার দোস্ত মশারফ হোসেন। কুচবিহার জেন্‌কিন্স স্কুলে যখন সিক্সথ্ ক্লাশে ভর্তি হই, তখনই তার সাথে আমার প্রথম বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। একই হোস্টেলে থাকি। তারা তিনভাই—বিরাট সম্পত্তির মালিক—আশৈশব পিতৃহীন। সম্পত্তি তাদের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে। এর বড় ভাইয়ের সাথে ছিল আমার বড় ভাইয়ের বন্ধুত্ব—তাই আমাদের দুজনের মাঝেও গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। হোস্টেলের সবাই বললে, বাঃ এরা দুটিতে বেশ মিল। দোস্তালি পাতাও। তাই দুজন দুজনকে দোস্ত বলে ডাকতাম। আমার দোস্ত এখন রংপুর ধাপে বাস করছেন।

দোস্ত আমাকে চিঠি দিল, তার ওখানে গেলাম, রংপুর জেলার ডোমার গিয়ে মেয়ে দেখলাম। দশ বার দিনের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল।

তখন সমাজের অবস্থা কি ছিল বলতে গিয়ে বিয়ের দিনের একটা ঘটনা বলতেই হচ্ছে। যেদিন মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম সেদিন হবু শ্বশুরবাড়ীতে কী গানের ঘটা। হারমোনিয়াম বাজিয়ে কত গানই গেয়েছিলাম। পাড়ার লোক সেদিন আসর জমিয়েছিল।

বিয়ের দিন কলকাতা থেকে বন্ধুবান্ধব এসেছে। বিয়ের পর রাতে তকরীম আহ্‌মেদ যেই সেতারে একটু টুং টাং শব্দ তুলেছে অমনি উঠেছে প্রতিবাদ। না, একি.....মুসলমানের বিয়েবাড়ী...গান-বাজনা সামাজিক প্রচলন নেই ইত্যাদি। বন্ধুদের এই অবমাননায় আমি গণ্ডগোলের ফাঁকে আঁধার রাতে শ্বশুরবাড়ী থেকে চলে গিয়ে রাত কাটিয়েছি দূরে এক হাই স্কুলের টেবিলে। রাতে ভীষণ ঝড় উঠেছিল। সমাজের এই রূঢ় আচরণে আমার বুকেও উঠেছিল সেদিন সাত-সাগরের ঢেউ।

সারারাত বর কোথায়, বর কোথায় করে খুঁজেছিল সবাই। আমাকে পায়নি। বিয়ে-বাড়ীতে এ নিয়ে উঠেছিল মহা আলোড়ন। ভাগ্যিস বিয়ে পড়ানো আগেই হয়ে গিয়েছিল —কাজেই সবাই মনে করেছিল, পাখীকে শিকল পরানো হয়েছে, আরতো উড়তে পারবে না, খাঁচায় আসতেই হবে ফিরে।

সারারাত বাইরের ঝড় আর মনের ঝড়ের সাথে যুদ্ধ করে ভোরের দিকে টেবিলের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছি। প্রাতঃভ্রমণরত দুএকজন শ্বশুরবাড়ীর লোক আমাকে ঐ অবস্থায় আবিষ্কার করে শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসেন মানভঞ্জনের পালার দৃশ্যে অবতীর্ণ হবার জন্য।

পরবর্তীকালে অবশ্যি শ্বশুরবাড়ীতে যতবারই গিয়েছি গানের জন্য বাধা তো দূরের কথা যে ক'দিন থাকতাম গলার অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে ঠেকত যে দস্তুরমত পনের-বিশ দিন গলাকে বিশ্রাম দিতে হত।

আমার প্রথম পুত্রের জন্মগ্রহণের সংবাদ পাই কলকাতায়। কাজিদাকে বললাম, "কাজিদা আল্লার অসীম অনুকম্পায় আমার এক খোকা এসেছে ঘরে, আপনি যদি খোকার একটা নামকরণ করেন"। মহাউল্লসিত হয়ে দুদণ্ড চোখ বুঁজে বলে উঠলেন, "খোকার নাম রইল মোস্তাফা কামাল। কামালের মতোই যেন একদিন দেশ স্বাধীন করতে পারে—দেশের অনাচার অবিচারকে দলিত মথিত করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে পারে—আর ডাক নাম রইল দোদুল"। এই দোদুলকে আমি একটু পালটে রাখলাম।

ওর বয়স যখন তিন বছর তখন কলকাতায় কড়েয়া রোডের এক বাসায় নিয়ে এলাম ওর মাকে সাথে করে। তিন বছরের শিশু কী সুন্দর সুর করে গাইত,—

ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়
আয়রে ছাগল আকাশ বাতাশ দ্দেগবি যদি আয়।

আমরা হেসে লুটোপুটি!

তিন বছরের শিশু আমার একগাদা রেকর্ড সবগুলো ওলট পালট করে রাখলেও বলে দিতে পারত কোনটা কি গান এবং কার গান। আরো অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, মুখে মুখে এ বয়সে প্রথম ভাগ যেমন অরুণ রবি উঠল, আমার ঘুম ছুটল ইত্যাদি সবকিছু মুখস্থ বলতে পারত সে।

।। পল্লী-সংগীত ।।

কাজিদা তখন গ্রামোফোন কোম্পানীর জন্য গান লিখে চলেছেন। আঙুরবালা, ইন্দুবালা, হরিমতি, কানন দেবী, কমলা ঝরিয়া, ধীরেন দাস, কমল দাশগুপ্ত, মৃণালকান্তি ঘোষ সবাই তাঁর গানের জন্য 'কিউ' লাগিয়ে বসে থাকে। ওদিকে ইসলামী গান আর একা কত লিখবেন। আমিও দুদিন চারদিন দশদিন তাঁর কাছে গিয়েও গান পাই না।

ইত্যবসরে কবি গোলাম মোস্তফার সংগেও আমার পরিচয় হয়েছে। কারমাইকেল হোস্টেলে তিনি থাকতেন। দেখলাম তিনিও সংগীতজ্ঞ। গান জানেন। গান লেখেনও। আমার সংগে তিনি মাঝে মাঝে গ্রামোফোন ষ্টুডিওতে যেতেন। তাঁর গানও আট দশখানা রেকর্ড করলাম। তাঁকে দিয়েও কয়েকখানা গান রেকর্ড করালাম। তিনিও উৎসাহিত হলেন।

এর মধ্যে গ্রামোফোন রেকর্ডের পাইকারী পরিবেশক মিঃ জে এন দাস নিজস্ব একটা কোম্পানী খুললেন। নাম দিলেন তার মের্গাফোন কোম্পানী। হ্যারিসন রোডের উপর দোকান ও রিহার্সেল রুম করলেন। হিজ মাষ্টার্স ভয়েসের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমার ছয়খানা গান তিনি রেকর্ড করলেন। কাজিদার প্রসিদ্ধ গান "তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে"—মেগাফোনে রেকর্ড করি। আমার ভাওয়াইয়া গান কাজিদা খুবই পছন্দ করতেন। 'তাই নদীর নাম সই কচুয়া, মাছ মারে মাছুয়া' আর 'তোরষা নদীর পারে পারে লো দিদিলো মানসাই নদীর পারে' এই দু'খানা গানের সুরে তিনি মেগাফোনের জন্য লিখলেন, "নদীর নাম সই অঞ্জনা নাচে তীরে খঞ্জনা", আর "পদ্মদীঘির ধারে ধারে" এই দু'খানা গান।"

ইতিমধ্যে ভাটিয়ালী সুরে "ঐ যে ভরা নদীর বাঁকে কাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে" গানখানিতে বাজার ছেয়ে গেছে।

ভাটিয়ালীর ক্ষেত্রে কাজিদার রচনা ও গ্রাম্য সুরের সংযোগে আমি প্রথম নাম করি। পল্লীগীতির গায়ক হিসেবে আমার নাম যখন বেশ কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছে তখন পল্লীকবি জসিমউদ্দিন নিজে থেকেই একদিন আমার সাথে দেখা করতে এলেন। আমার "নদীর নাম সই অঞ্জনা নাচে তীরে খঞ্জনা" শুনে তিনি আমার উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করেছিলেন "কোন অঞ্জনা তীরে খঞ্জনা পাখী"। জসিম তার স্বভাবসিদ্ধ গেঁয়ো কথার জালে আমাকে বেঁধে ফেলল। এরপর তার প্রথম গান গাইলাম, "আমার গহীন গাঙের নাইয়া"। তারপর গাইলাম, "ও আমার দরদী আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না"। সারা বাংলায় আবার নতুন করে সাড়া পড়ে গেল।

আমি আর জসিম দুইজনে তখন এক অভিযান শুরু করলাম। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে, স্কটিশচার্চ কলেজে সভা ডেকে ভাটিয়ালী গান শোনাতাম। প্রথম প্রথম খুব সাড়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু আমাদের দলে যোগ দিলেন রায় বাহাদুর খগেন মিত্তির, রায় বাহাদুর দীনেশ সেন, গুরুসদয় দত্ত, কাজেই দিন দিন পল্লীগীতির উপর একটা শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল।

কলকাতায়ই এর প্রতিক্রিয়া হল সবচাইতে বেশী। কলকাতার শতকরা আশী ভাগ লোকেরই বাড়ী পল্লী অঞ্চলে। তারা রুজি-রোজগারের জন্যে আছে কলকাতায়। মন পড়ে থাকে দেশের গ্রামটিতে। রেকর্ড, রেডিওর মাধ্যমে যখন আমার কণ্ঠে ধ্বনিত হল পল্লীর

সেই মেঠো সুর পথচারী দাঁড়াল থমকে। একি.. এ সুরের সাথে যে আমার নাড়ীর যোগাযোগ...একি বাণী, এ যে দেখি আমাদের প্রাণেরই প্রতিধ্বনি। পল্লী সংগীতের সুরে বাংলার আকাশ বাতাস নতুন করে হল সুরশ্রীসমৃদ্ধ।

পল্লীগীতির রেকর্ডও বাজারে এক নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি করল। কলকাতায় অভিজাত সমাজেও এ গান বিশেষ আদৃত হতে লাগল। ছাত্রদের যে কোন অনুষ্ঠান হলেই আমার ডাক পড়ত। আসতে আরম্ভ করল গানের টিউশনি। মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা। গানের টিউশনি মাসে বা সপ্তাহে দুদিন এক ঘন্টা কবে। দুটো তিনটে টিউশনি নিলাম। অফিস থেকে ফিরে এসে যেই মনে হত আজ ঐ টিউশনিতে যেতে হবে মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ত। মনে আছে, ঠিক এক মাস টিউশনি করে ছাত্রীর অভিভাবকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বলেছি, "মাফ করবেন, টিউশনি করতে পারি, তবে টাকা নিয়ে নয়, কাবণ টাকা নিলেই আমাকে ঠিক দিন ও সময়মত আসতে হবে। এই বাধ্যবাধকতার বেল-লাইনের ভেতর দিয়ে আমার জীবনেব এই মূল্যবান দিনগুলিকে চালিয়ে যেতে পারব না। তবে আমি আসব, গান শিখিয়ে যাব যেদিন যখন মন চায়, টাকা আমি নিতে পারব না"।

ভাটিয়ালী গান তখন বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। আমার মনে এল এক নতুন কল্পনা। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই আমার কানে যে সুর প্রথম ঝংকার তুলেছিল সে হল ভাওয়াইয়া। এই সুরে গান রেকর্ড করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলাম। গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তা বললেন, কুচবিহারের ভাষায় গান? ওসব আঞ্চলিক ভাষা চলবে না। কিন্তু আমার রেকর্ড তখন বাজারে এনেছে নববিস্ময়, কোম্পানী লুটছে মোটা টাকা, কাজেই আমার আবদারটা একদম উড়িয়েও দিতে পারল না। আমাকেও এক ডিগ্রী নীচে নেমে আসতে হল। যে গানের বাণী ছিল ;

তোরষা নদীর ধারে ধারেও
দিদিলো মানসাই নদীর পারে
ওকি সোনার বঁধূ গান করি যায় ও
দিদি তোরে কি মোরে
কি শোনেক দিদি ও ।।

সে গান দাঁড়াল এই রকম :

তোরষা নদীর পারে পারে ও
দিদিলো মানসাই নদীর পারে
আজি সোনার বঁধূ গান গেয়ে যায় ও
দিদি তোর তরে কি মোর তরে
কি শোনেক দিদি ও।।

তোরষা নদী—খরস্রোতা ছোট্ট পাহাড়ী তোরষা—কুচবিহারের পাদমূল ধৌত করে তরতর বেগে চলেছে। তারি তীরে তীরে গান গেয়ে চলেছে মোষের পিঠে করে দোতারা বাজিয়ে মেষ-চালক মৈশালের দল। তাদের কণ্ঠের সুর ছেলেবেলায় আমার কণ্ঠে বেঁধেছিল বাসা। তাদের মুখের ভাষাই আমার মাতৃভাষা। মাতৃভাষাকে অবিকৃত রেখে গান দিতে পারলাম না। মনে জেগে আছে ক্ষোভ। এই গান বাজারে বের হবার তিন চার মাস পরে ম্যানেজারবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা এবার ঐ ধরণের ভাওয়াইয়া গানই দিন'। আমি বললাম, 'দেখুন, আমার দেশের ভাষাও বাংলা ভাষা এবং সে ভাষায় কথা বলে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি এবং আসামের বহু জায়গার জনসাধারণ। তা ছাড়া সে ভাষায় আছে কাব্য, আছে সাহিত্য, সার্বজনীন আবেদন, আচ্ছা একখানা দিয়েই দেখি না'! তারপর গাইলাম 'ওকি গাড়ীয়াল ভাই কত রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে'। গাইলাম, 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে'। এসব গানে শুধু উত্তরবংগে নয়, সারা বাংলায় জাগিয়েছিল বিপুল আলোড়ন। একমাত্র উত্তরবংগের ভাষায় ভাওয়াইয়া গানই নয় ও ভাষায় পাঁচখানা নাটকও রেকর্ড করি—মধুবালা, মরুচমতি কন্যা, রূপধন কন্যা, হলদী-শানাই ও মহুয়া সুন্দরী। এর সব কয়টিই আমার ছোট ভাই আবদুল করিমের লেখা। তার লেখা বহু ভাওয়াইয়া গানও আমি রেকর্ড করেছি।

এ গান প্রতি মাসে বার হতে আরম্ভ করল। তখন কুচবিহার থেকে আমার বন্ধুবান্ধব এবং গায়কদের এনে তাদেব দিয়ে ভাওয়াইয়া গান রেকর্ড করাতে আরম্ভ করলাম। কমল দাশগুপ্ত একদিন আমায় বললে, 'আব্বাস তুমি এত বোকা কেন? তুমি তো ভাওয়াইয়া গানে সম্রাট, তোমার কি উচিত হচ্ছে দেশ থেকে অন্য লোককে নিয়ে এসে তোমার পথে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করানো?' আমি তার উত্তরে বলেছি, 'বিশাল এই বাংলা দেশে গায়ক-গায়িকা কত ছড়িয়ে আছে। অনাঘ্রাত পুষ্পের মত গাঁয়ে গাঁয়ে নামহারা হয়ে তারা গেয়ে চলেছে। আদর তো তাদের আমরাই করব ভাই। নাম, যশ, স্বীকৃতির পথে তো আমরাই তাদের নিয়ে আসব। তাছাড়া, ভীমনাগের সন্দেশের দোকানের পাশে দু-চারটে দোকান না হলে মানুষ বুঝবে কি করে যে ভীমনাগের সন্দেশই সবচাইতে ভালো'?

কুচবিহারের এইসব গায়কদের ভেতর নাসের আলী (টেপু), কেশব বর্মণ, ধীরেন চন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনিয়ার গান আজও বাজারে বেশ কাটতি।

এই ভাওয়াইয়া গান গাইতে গিয়ে একটা দিনের ঘটনা মনে পড়ে গেল। শ্যামবাজার এলাকায় কোন স্কুলের এক সভায় একদা তদনীন্তন মন্ত্রী শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার উপস্থিত ছিলেন। আমারো গাইবার জন্য নিমন্ত্রণ ছিল। সভাপতি অমৃতবাজারের সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। আমার উপস্থিতিটা বিশেষ কাম্য বলে মনে হচ্ছিল না। আমি বলে উঠলাম, 'দেখুন যদি আপনারা কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা বলি। সভার কার্যসূচীতে আমার উদ্বোধনী-সংগীত এবং বিদায়-সংগীত গাইবাব কথা লেখা আছে। আমার অন্যত্র কাজ আছে, তবে দয়া করে যদি অনুমতি করেন উদ্বোধনী সংগীতের পরেই আর একখানা গান গেয়ে আমি চলে যাব'। একথায় সবাই সায় দিল। আমি প্রথমে গাইলাম একখানা ভাটিয়ালী। তারপর 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে'। এই গানখানার একটু ভূমিকা দিয়ে গানটা গাইলাম।

সভাপতি তুষারকান্তি ঘোষ মশায় গানের সময় লক্ষ্য করছিলাম ঘন ঘন রুমালে চোখ মুছছিলেন। গান শেষ হলে তিনি উঠে রোরুদ্দ্যমান কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আজ এ সভার কাজ চালাতে পারব না। এ গান আমাকে আজ সম্পূর্ণ উন্মনা করে তুলেছে, আমি আব্বাস ভাইকে নিয়ে চললাম'। এই কথা বলে সত্যিই তিনি আসন থেকে উঠে আমার হাত ধরে আমাকে বাইরে নিয়ে এসে বললেন, 'চলুন আমার অমৃতবাজার অফিসে'। সেখানে নিয়ে এই ধরনের ভাওয়াইয়া গানের রেকর্ড তালিকা যা তখন পর্যন্ত বেরিয়েছে সব লিখে নিলেন। তাঁর কাগজের কলকারখানা সব দেখালেন এবং আমার ঠিকানা লিখে রেখে গাড়ীতে করে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

আমার এই 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে' যখন রেকর্ড আকারে বের হয়, তখন সে সময়কার হিজ মাষ্টার্স ভয়েস প্রচার-পুস্তিকায় বের হয় ঃ

"উত্তরবংগ অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই শ্রেণীর গানের বিশিষ্ট সুর ছাড়াও রচনাও অন্যতম আকর্ষণ। শিক্ষিত কবির কাব্যে যখন পড়ি, এ-পারে চক্রবাক ওপারে চক্রবাকী, 'মাঝেতে বহে বিরহবাহিনী'! তখন মনের আগে বুদ্ধি দিয়ে আমরা রস উপলব্ধি করি। কিন্তু অশিক্ষিত কবির গানে যখন দেখি—'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে', আর বিরহিনী বগীর মর্মব্যথায় সারা আকাশ ছলছল। তখন আর বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। বিরহের এই অতি সহজ প্রকাশভংগী তীরের মত সোজা এসে মানুষের মর্মে বেঁধে। আমাদের মনে হয়, নিরলংকার এই বস্তুতান্ত্রিক প্রকাশভংগীই গ্রাম্য গানের বিশেষতঃ ভাওয়াইয়া গানের চাহিদার প্রথম কারণ।

"পল্লী-গীতি রাজ্যের দুয়োরাণী এই ভাওয়াইয়া গানকে সর্বপ্রথম আব্বাস সাহেবই আদর করে রাজ-অন্তঃপুরে ডেকে আনলেন। তখন আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখলাম উপেক্ষিত দুয়োরাণীর রূপ-শ্রী সুয়োরাণীর চেয়ে ত' কম নয়! এবং তার চেয়ে মুগ্ধ হলাম তার নিতান্ত সরল হৃদয়ের মাধুরীতে! এর জন্য সমগ্র রসিকজনের অভিনন্দনের মালা পাওয়া উচিত পল্লী দুলাল আব্বাস সাহেবের। বহু দুর্লভ ভাওয়াইয়া গান তিনি সংগ্রহ করে আপনাদের উপহার দিয়েছেন"।

বাংলার মুসলমান সমাজে কাজিদার ইসলামী গান গেয়ে পরিচিত হলাম আর বাংলার আপামর জনসাধারণের কাছে পরিচিত হলাম পল্লীবাংলার ভাটিয়ালী, জারি, সারি, মুর্শিদা, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদী, ভাওয়াইয়া, চটকা, ক্ষীরোল গান গেয়ে। পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী, বিচ্ছেদী, মুর্শিদা ইত্যাদি গানের সংগ্রাহক আমার অনুজপ্রতিম শ্রীকানাইলাল শীলের কাছে আমি চির ঋণী। পূর্ব বাংলার মাঠে-ঘাটে এই পল্লীগীতি ছড়িয়ে ছিল, লুকিয়ে ছিল, অনাদৃত হয়ে পড়েছিল। কানাইর সহায়তায় সেই হারানো মাণিক উদ্ধারের কাজে এগিয়ে এলাম। কানাইর মত দোতারা-বাদক পাক-ভারত উপমহাদেশে বিরল। তার সাহায্য না পেলে সত্যিকারের লোকগীতি লোকসমাজে পরিবেশন করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। আদি ও অকৃত্রিম পল্লীগীতির ওপর রংচং লাগিয়ে কয়েকজন আধুনিক পল্লীকবির গানও অবশ্য রেকর্ড করেছি, কিন্তু যখন সত্যিকারের ট্রাডিশনাল গানের সন্ধান পেয়েছি তখন থেকে এদের গান রেকর্ডে দেওয়া বন্ধ করেছি।

।। সিনেমার চৌকাঠ থেকে ।।

যৌবনে সবাই আমাকে সুদর্শন বলতেন। তাই বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে হাওড়ায় জয়নারায়ণ বাবুকে সাথে করে একদিন জ্যোতিষ বাঁড়ুয্যের সাথে দেখা করলাম। তিনি আমার গান শুনে এবং চেহারা দেখে খুবই খুশী হয়ে বললেন, "বিষ্ণুমায়া নামে একখানা সবাক ছবি শীগ্‌গীরই ধরব। আপনাকে সেই বইতে গানের পার্ট দেব, ঠিক সময়ে জানাব"। সত্যি সত্যি মাসখানেক পরে আমার নামে এক চিঠি এল টালিগঞ্জে তাঁর সাথে দেখা করবার জন্য। সেখানে গিয়ে একঘর লোকের ভিতর তিনি আমাকে গাইতে বললেন। গানে পাশ করলাম ;তখন বললেন, জীবনে থিয়েটার করেছেন কখনো? আমি বললাম, "তা যথেষ্ট করেছি - দেবলা দেবী, শাজাহান, মিশর কুমারী, রিজিয়া, আরো অনেক বইতে"! 'মেবার পতন', বইখানা এগিয়ে দিয়ে দু একটা জায়গা পড়তে বললেন।.....পাশ করলাম বোঝা গেল, কারণ আমাকে দু'খানা গান আর কিছু সামান্য পার্ট লেখা একখানা কাগজ দিয়ে বললেন, এক সপ্তাহের মধ্যে সুর-টুর করে আসবেন।

পার্ট আমার অংকুরের। কাননবালা কৃষ্ণের ভূমিকায়। বিদূরের ঘরে কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে হবে। তারপর গান।

যাই হোক প্রথম ছবিতে অবতীর্ণ হলাম! মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনছি। জ্যোতিষ বাবুকে বললাম— "ছবিতে নামলাম, কিছু পারিশ্রামিক"? তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বলে উঠলেন, "বল কি হে, ছবিতে নামতে পারলে, এই তো যথেষ্ট। যাক এর পরের ছবিতে দেখা যাবে"। কিন্তু পরের ছবির জন্য হাঁটাহাঁটি করে আমার দু'জোড়া জুতা ক্ষয়ে গেছে—চান্স আর পাই নি।

একদিন নাট্যনিকেতনে শিশির ভাদুড়ীর সাথে পরিচয় হল। শিশির ভাদুড়ী তখন একটা দৃশ্য করে গ্রীনরুমে ঢুকেছেন। শিশিরবাবু বলে উঠলেন, "হুঁ, ভাল গাইতে পার? আচ্ছা এই ড্রপ সিনটা পড়লে তারপরেই ষ্টেজে ঢুকে একটা গান গাইতে পারবে"? মহা ফ্যাসাদে পড়লাম। আমার মাথায় একটা গেরুয়া পাগড়ী বেঁধে দেওয়া হল। 'আমার গহীন গাঙের নাইয়া' গানটা অর্গান বাজিয়ের সাথে ঠিক করে নিলাম একটু গুণ গুণ করে....তারপর ড্রপ তুলতেই আমাকে ঢুকতে হল। গাইলাম। এন্‌কোর এন্‌কোর, আবার গাও....দু'বার গাইলাম। হাততালি আর থামে না। শিশিরবাবু বললেন, 'যেয়ো না, প্লে শেষ হলে দেখা কোরো'।

প্লে'র শেষে গ্রীনরুমে সবাই রং ওঠাচ্ছে মুখ থেকে—একটা বড় ঘরে হারমোনিয়াম, তবলা রেখে দেওয়া হল—বুঝলাম গান হবে। শিশিরবাবু এসে বসলেন। সবাইকে ডাকলেন। বললেন, "গাও দেখি"। দু'তিন খানা গাইলাম। কে একজন বলে উঠল, এর একখানা গান শুনুন, 'ওরে মাঝি তরী হেথা বাঁধবো নাকো আজকের সাঁঝে'। সবাই বলে উঠল— বেশ বেশ। আমি বললাম, "গাইতে পারি। তিনটা শর্ত আছে। প্রথম, এই গানের সাথে তবলা বাজবে না: দ্বিতীয়, গানের সময় একটা কথাও কেউ বলতে পারবেন না; তৃতীয়, ঘরের আলো নিবিয়ে দিতে হবে"। তথাস্তু। গান আরম্ভ হল। গানের দুটা কলি গেয়েছি, এমন সময় তবলচি তবলায় চাঁটি মারল। গান থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আলো জ্বালুন"। শিশিরবাবু

বললেন, "কী, ব্যাপার কি? গান থামালে কেন"? বললাম, "শর্ত ভংগের অপরাধে"। "ও তবলা বেজেছে এই জন্য"? "ঠিক তাই"। বললেন, "আচ্ছা আর বাজাবে না, গাও"। আমি বললাম, "আজ আব এ গান হবে না"। তিনি বললেন, "তাতে কি হয়েছে, গাও"! আমি বললাম, "হাজার টাকা দিলেও না"। তিনি বললেন, যদি দশ হাজার টাকা দিই"? আমি বললাম, "লাখ টাকা দিলেও আজ আর এ গান গাইতে পারব না"।

শিশিরবাবু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বলে উঠলেন, "Here is a true artist। শুনলে, শুনলে, লাখ টাকা দিলেও গান গাইবে না"। শিশিরবাবু তাঁর ছোট ভাইকে বললেন, "দেখ আমার সীতা বইতে একে আমি বৈতালিকের পার্ট দেব! আচ্ছা কাল তুমি আমার বাসায় যাবে, কেমন"?

পরদিন বিডন স্ট্রীটে তাঁর বাসায় গেলাম। কঙ্কাবতীকে ডেকে বললেন, "আচ্ছা ছেলেটির গান শোনোতো"। আরো বললেন, "সীতা বই দেখেছ"? বললাম, "দেখেছি"। আচ্ছা, বৈতালিকের গানের সুরগুলো জানা আছে? আমি একে একে জয়সীতাপতি সুন্দর তবু থেকে আরম্ভ করে অবিকল কেষ্টবাবুর গলার স্বর নকল করে গাইলাম। অবাক হয়ে তিনি বললেন, "কি করে কেষ্টবাবুর গলার মত স্বর বের করছ"?

যাক, প্রতিদিন তাঁর বাসায় একবার করে যাওয়া আরম্ভ করলাম। কঙ্কাবতীকে প্রায় পাঁচ ছ'খানা গানও শিখিয়ে দিলাম। আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, "স্যার আমার গানের টেকিং কোন্‌দিন হবে"? তিনি বললেন, "চিন্তা কোরো না, তোমাকে ঠিক সময় বলব। পার্টটার ভেতর কথা তো নেই, শুধু গান ক'খানা, আর সুর তো তোমার হয়েই আছে"। মাসখানেক পরে একদিন সন্ধ্যার সময় কঙ্কাকে গান শেখাচ্ছি। শিশিরবাবু ঘরে ঢুকলেন। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। আমার দিকে তাকিয়ে আছেন...কতক্ষণ পরে আমার কাছে এসে আমার হাতদুটো চেপে ধরে ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলেন। বললেন, "ভাই আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে বোধহয় পার্টটা দিতে পারলাম না। ফিনান্‌সিয়ার বলছে, রামায়ণের যুগে কোন্ আব্বাসউদ্দীন ছিল। এ বইতে কিছুতেই মুসলমানকে নাবতে দেব না। তা ভাই, তোমার নামটা যদি পালটে দেয়া যায়..."। আমি তাঁর কথা শেষ করতে দিলাম না। বললাম, "বাংলার নটসূর্য আপনি! যে স্নেহ আমায় দেখিয়েছেন জীবন ভরে মনে থাকবে, কিন্তু ও অনুরোধ আমাকে করবেন না। রামায়ণের যুগে মুসলমান ছিল না ঠিকই, কিন্তু আপনার প্রযোজককে বলবেন অভিনয় অভিনয় মাত্র। সেখানে মুসলমান বা হিন্দু যে নামেই অভিনয় করুক না কেন ভাল অভিনয় করলেই বই উৎরে যাবে, নামে কিছু যাবে আসবে না। তবে আমি সিনেমায় আমার নাম পালটে আর এক অভিনয় করতে পারব না।"

এই ঘটনার পর আর চিত্রজগতে আত্মপ্রকাশ করবার বাসনা বহুদিনের জন্য মৃত হয়ে রইল।

বহুদিন পর সুযোগ এল একবার। তুলসী লাহিড়ীর 'ঠিকাদার' বই হবে ছবিতে। চা-বাগানে ছবি নেওয়া হবে। কুচবিহার থেকে উত্তরে ডুয়ার্স চা বাগানে সেখানকার সুরের

সাথে সংগতি রেখে গাইতে হবে। আমার কাছে প্রস্তাব করলে শৈলেন রায়, "তোমাকে এবার ছবিতে নামতে হবে"। সংগীত রচয়িতা শৈলেন রায় নিজে, কাজেই তার কথা সিনেমাওয়ালাদের কেউ উপেক্ষা করতে পারল না। চুক্তিতে সই করলাম। সদলবলে কুচবিহার গেলাম। প্রায় পনের কুড়ি দিন ধরে আলিপুরদুয়ার থেকে কাছেই দমপুর ষ্টেশনের এক চা-বাগানে ছবি নেওয়া হতে লাগল। সেখানে গাইতে হল—

> 'পৌষের পাহাড়ী বায়
> কাঁটা যে বিঁধিল গায়
> নকরী আর করব কি মরব কি মরব না'।

—সিনেমায় চারটা মাত্র ছবিতে আমার আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ হয়েছে 'বিষ্ণুমায়া' 'মহানিশা' 'একটি কথা' আর 'ঠিকাদার'।

।। গানের আলো ছড়িয়ে দিলাম সবখানে ।।

পিয়ারু কাওয়ালের উর্দু গান বাজার ছেয়ে গেছে। বড় শখ হল, উর্দুওয়ালা না হতে পারি, মুসলমানের ছেলে তো! গাই না ক'খানা কাওয়ালী গান! সোমবাবু রাজী হলেন। পিয়ারু কাওয়ালের ট্রেনিংয়ে আটখানা উর্দু গান দিলাম। উচ্চারণ এমনি ভালো হল যে, উর্দুওয়ালারা আমাকেও এক নতুন কাওয়াল বলে বরণ করে নিল। পিয়ারু সাহেবের সাথে আমারো একদিন এক মুজ্‌রোতে দাওয়াত এসেছিল। কিন্তু সারারাত জেগে পান চিবিয়ে চিবিয়ে গানের মজলিশ করা আমার ধাতে সইবে না বলে জীবনে আর কোন দিনও তাঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করি নি।

পঁচিশ বছর আগে রেডিওতে গান গাইবার জন্য কি আকুল আগ্রহই না জেগেছিল! তখন গান শুনতে হত হেডফোনে। প্রথম দিন রেডিও শুনি কলকাতায় নাটোর রাজবাড়ীতে জীতেন মৈত্রের সাথে। কানে দিলাম রেডিও, ঠিক ফোনের মত। কানের ভিতরে বেজে উঠল কৃষ্ণচন্দ্র দে'র গান! কি স্বপ্নই যে সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময়টিতে! নিজে চেষ্টা করে (তখনকার দিনে অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলকাতার ষ্টেশন ডিরেক্টর ছিলেন নৃপেন মজুমদার) প্রথম যেদিন রেডিওতে গান গাই—সেদিন আমার শিল্পী-জীবনে এক নতুন অনুভূতির স্বাদ পেলাম। আমি শুনেছি রেডিওতে গান গাইলে টাকা পাওয়া যায়! কিন্তু গানের প্রথমেই একটা কন্ট্রাক্ট সই করতে গিয়ে একটু হোঁচট খেলাম—কারণ পারিশ্রমিকের কলামে লেখা আছে 'এ্যামেচার'। যাক, রেডিওতে গাইতে পারলাম, এই তো ভাগ্যি! কতজনে হয়ত আমার গলার সুর কানের ভিতর ধরেছে। এই তো চরম পুরস্কার!

কাজিদা একদিন বললেন, "আব্বাস, ঘোড়াকে দানা না খাওয়ালে ঘোড়া চলবে কি করে? তুমি ক্লাসিকাল গান শেখো"। ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁ যাঁকে কাজিদা বলতেন "ঠুংরীর বাদশাহ্" তাঁর কাছে গিয়ে হাতে ন্যাড়া বাঁধলাম। আমি আর কবি গোলাম মোস্তফা। এই

ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁ সাহেবকে প্রথম যেদিন গ্রামোফোন কোম্পানীতে দেখি মুগ্ধ হয়ে যাই এঁর চেহারা দেখে। রাজপুত্রের মত চেহারা, পায়ে লপেটা, কোঁচানো ধুতি, সুন্দর এক জোড়া গোঁফ। কথাও বলতেন ভারী মিষ্টি করে। আঙ্গুর, ইন্দু, ঝরিয়া এঁরা তো ওঁরই সুরের দৌলতে এত বড় নাম-করা গাইয়ে বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। একখানা গান দেওয়া হল, গানখানা তিনি একবার পড়লেন, ব্যস হারমোনিয়াম নিয়ে তক্ষুণি সুর হয়ে গেল। এতবড় ত্বড়িৎ সুরস্রষ্টা দেখিনি জীবনে, দেখব কিনা আর জানি না। সে সুরে কী যাদু মেশান থাকত জানি না, বাজারে রেকর্ড বেরোবার সাথে সাথেই বিক্রী হত গরম জিলিপীর মত। একবার দুখানা বাংলা গান নিয়ে যাই তাঁর কাছে। বললাম, "ওস্তাদজী, আমার বড় ইচ্ছা আপনার দেওয়া সুরে দু'খানা বাংলা গান গাই"। গান দু'খানা তিনি উর্দুতে লিখে নিলেন। সেই মুহূর্তেই কী অপরূপ সুর করলেন! কবি গোলাম মোস্তফার গানের বাণী সুরের স্পর্শে হল মূর্তিমতী। একখানা হচ্ছে, 'ফিরে চাও বারে ফিরে চাও, হে চির নিঠুর প্রিয়া'। আর একখানা 'সেতো মোর পানে কভু ফিরে চাহে না হায়'।

ওস্তাদজীর বাসায় বহুবার ঘরোয়ানা মজলিশে বড় বড় ওস্তাদের গান বাজনা সোনার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। ওস্তাদ এনায়েত খাঁর সেতার। প্রফেসর আজিম খাঁর তবলা, প্রফেসর ছোটে খাঁর সারেংগী, এমনি কত কি!

দুর্ভাগ্য আমার বেশীদিন তাঁর কাছে শেখা সম্ভবপর হয়নি, কারণ—চাকুরী, রেডিও, রেকর্ডের জন্য গানের প্রস্তুতি, আর নিত্যনৈমিত্তিক এখানে-ওখানে গান গাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে যাওয়া-আসা।

গ্রামোফোন কোম্পানী আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিচ্ছে, আর্টিষ্টদের মধ্যে উঠল গুঞ্জন। বিলাতে সব আর্টিষ্টদের দেয় রয়ালটি, ভারতীয় শিল্পীরা কেন পাবে না? সব শিল্পীরা মিলে আর্টিষ্টস্ এসোসিয়েশন করলাম। আমাকে করা হল এ্যাসিষ্টান্ট সেক্রেটারী। গ্রামোফোন কোম্পানীর কাছে প্রতিনিধিদল পাঠানো হল। তারা মেনে নিল শিল্পী পাবে শতকরা ৫ হারে রয়ালটি, কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা সাড়ে বার পর্যন্ত। গানের রচয়িতা পাবে শতকরা আড়াই আর যন্ত্রশিল্পীদের দেয়া হবে নগদ পারিশ্রমিক।

রবিবাসরের বহু সভায় আমি যোগদান করেছি। সুসাহিত্যক এস. ওয়াজেদ আলী নিজে শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না সাহিত্যামোদীও ছিলেন। তাঁর বাসায় সবগুলি রবিবাসরীয় সাহিত্যসভায় গান গেয়েছি। এছাড়া সাহিত্যিকদের বড় বড় সভায়ও আমার ডাক পড়ত। একটি বিশেষ কারণে সাহিত্যিক বা কবিরা আমার সাথে পরিচিত হতে চাইতেন। তাঁদের রচিত গান সভায় গাইলে তাঁরা একটু আনন্দিত হতেন, বলাই বাহুল্য। তখনকার দিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকদের সাথে পরিচিত হয়ে আমিও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম।

নব জাগরণে বাংলার মুসলমান

।। সভা-গায়কের ভূমিকায় ।।

সিরাজগঞ্জ যুব কনফারেন্স ১৯৩২ সালে। কাজিদা আর আমাকে সেই সভায় নিয়ে আসবার জন্য সৈয়দ আসাদ-উদ্-দৌলা শিরাজী এল কলকাতায়। কাজিদা বললেন, "তোমার এ আহ্বান কি উপেক্ষা করতে পারি? জান আব্বাস, শিরাজী হবে বাংলার তরুণদের নকীব। তুমি, আমি, শিরাজী এই তিনজনে বাংলাদেশ জয় করতে পারি"।

যথাসময়ে সিরাজগঞ্জ এলাম। খুব ভোরে শীতের দিন সিরাজগঞ্জ এসে পৌঁছলাম। কাজিদা ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমের বাথরুমে ঢুকলেন। একঘণ্টা গেল আর বের হন না। ওদিকে প্রায় চার-পাঁচ হাজার ছাত্র ও জনতা বিরাট শোভাযাত্রা করে দাঁড়িয়ে আছে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য। একঘণ্টা পরে যখন তিনি বের হলেন তখন আমি কাজিদার অপূর্ব বেশ দেখে হাসি চেপে রাখতে গিয়ে দাঁতে দাঁতে ঠোঁট চেপে ঠোঁট কেটে ফেললাম। খদ্দরের পায়জামা....কবে তৈরী করেছিলেন জানি না, ছোট হয়ে গেছে। খদ্দরের শেরোয়ানী.....এতক্ষণ ধরে বাথরুমে বসে বোধ হয় কসরত করছিলেন বৃথাই বোতাম লাগাবার জন্য। শরীর হয়েছে বেশ বপুসদৃশ.... ও মান্ধাতার আমলের শেরোয়ানী গায়ে লাগবে কেন? বহু বোতাম বিদ্রোহ করে প্রায় ছিঁড়ি ছিঁড়ি অবস্থা—যে ধারের বোতাম সেই ধারেই দাঁড়িয়ে আছে, ও ধারের ছিদ্রে তারা আত্মসমর্পণ করে নি। যাক্ সেগুলো তিনি অতি কষ্টে খদ্দরের উত্তরীয় দিয়ে আবৃত করবার জন্য বার বার উত্তরীয়ের গায়েই হাত বুলাচ্ছেন। মুখে বিরক্তির চিহ্ন নেই। মাথায় খদ্দরের টুপি। এই বেশে তাঁকে মোটরে তোলা হল। ততক্ষণ পূর্বদিগন্তে সূর্য উঠে সিরাজগঞ্জের আকাশ কাজিদাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছে। সিরাজগঞ্জের প্রভাত-পাখীরা বিচিত্র কলরবে কোকিল কবিকে স্বাগত জানাচ্ছে! এদের কলকাকলি ছাপিয়ে বেজে উঠল ব্যাণ্ডের সুর....শোভাযাত্রা সেই সুরে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলল শহরের দিকে ; কিন্তু চলল আর কোথায়? দু'মিনিট চলে আর থামে! পাঁচ মিনিট বেশ চলে আবার থামে। থামে মানে থামিয়ে দেয়। পুরুষ ও নারীরা এসে কাজিদার মাথায় এঁকে দেয় তিলক-চন্দন। কাজিদা বলে ওঠেন, "এই যে এই যে এ হল আব্বাস, আমার ভাই, গান, হ্যাঁ গান শোনাবে।" আমারও মাথায়, কপালে সবাই ছোঁয়াতে লাগল পুষ্পচন্দন। এমনি করে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে প্রায় চার ঘণ্টা পর মোক্তার আফজাল আলি খাঁ সাহেবের বাসায় নিয়ে আসা হল আমাদের। সেখানে চা-পর্ব শেষ হল। দুপুর একটার সময় হলে সভা বসবে। গিয়ে দেখি বিরাট জনসমুদ্রের মাঝখানে একটা ইমারত দাঁড়িয়ে আছে। সেই জনতা ভেদ করে হলের ভিতর প্রবেশ করলাম। কাজিদার সেদিনের

অভিভাষণ বাংলার তরুণদের প্রাণে কী উন্মাদনাই না জাগিয়েছিল! তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত জলদগম্ভীর স্বরে সিরাজগঞ্জের তরুণদের ডাক দেওয়াটা মনে হচ্ছিল যেন সারা বাংলার তরুণদেরই ডাক দেওয়া—চল চল চল ওরে চল।

প্রতিটি কথার পর অজস্র করতালি, সভা যেন সজীব। আমি গানের পর গান গেয়ে চললাম। তখনকার দিনে মাইকের প্রচলন ছিল না, ঘরে বাইরে লোক ভর্তি। বাংলাদেশের প্রথম স্বীকৃতি সেদিন লাভ করলাম সভা-গায়ক হিসাবে। খোদার উদ্দেশ্যে জানালাম কোটী শুকুর। সিরাজগঞ্জের জনসাধারণ সেদিন কাজিদা ও আমার গলায় সিরাজগঞ্জের সব বাগান উজাড় করে ফুল দিয়ে সাজিয়েছিল।

কলকাতায় এসেছেন তুর্কী নারী-জাগরণের অগ্রদতিকা খালিদা এদিব হানুম। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য কারমাইকেল হোস্টেলের ছেলেরা মেতে উঠেছে। কাজিদাকে গিয়ে ধরল ছেলেরা গান লিখে দিতে হবে। তিনি একখানা গান লিখে দিলেন। আমাকে বললেন সুর দিতে। তাঁর সে গানখানা সেদিন খালিদা হানুমের সভায় গেয়ে রেকর্ড করেছি—

'গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়
রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রী-তে হুর পরী লাজ পায়।।

লক্ষ খালেদা আসিবে যদি এ নারীরা মুক্তি পায়।।"

নাটোর, শান্তাহার তথা উত্তরবংগে নেমেছে প্লাবন। কলকাতার পথে পথে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে ভিক্ষা করতে বেরুলাম একদল গায়ক। মনে পড়ে একদিনে প্রায় তিন হাজার টাকা আর রাশীকৃত কাপড়-চোপড় আদায় করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বন্যা রিলিফি ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়েছিলাম। "ভিক্ষা দাও গো পুরবাসী"—বন্যার জন্য অসহায় নরনারীর কল্পিত ছবি চোখের সামনে যেন ভেসে উঠত, তাই গাইবার সময় রোরুদ্যমান কণ্ঠের আবেদনে পেয়েছিলাম অভূতপূর্ব সাড়া।

বড় বড় সভায় গান গাইবার জন্য আসতে লাগল আমন্ত্রণ। ফরিদপুরের লাল মিঞার সাথে পরিচয় হয়েছিল কার্সিয়াংয়ে। সে ছাত্রদের নিয়ে ফরিদপুরে এক সভা করবে। পাকড়াও করল কাজিদা, কবি গোলাম মোস্তফা ও আমাকে। ফরিদপুরে এই ত্রয়ীর আগমন বার্তা ফরিদপুর জেলা ছড়িয়ে গিয়েছিল, ফলে সে সভাস্থল বিরাট এক মেলা-বাড়ীতে পরিণত হয়েছিল। মাইকের প্রচলন হয়নি, কাজেই লোকে না পারল কাজিদার বক্তৃতা শুনতে, না পারল গোলাম মোস্তফার কবিতা শুনতে, না পারল আমার গান শুনতে। বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, সবাই বলছে 'চুপ করুন চুপ করুন' চুপ আর কে করবে?

আমাদের তিনজনকে দাওয়াত করেছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের বাবা। বাড়ীর গেটেই বড় বড় করে লেখা "বল বীর চির উন্নত মম শির।" কাজিদা'র সম্মানের জন্য বাড়ীতে ঢুকবার আগেই তাঁর বাণীটা বড় আনন্দ জোগাল প্রাণে। কবীর সাহেবের বাবা

অবসর গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য দেখে মনে হল না তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। আমাদের তিনজনের দু'তিনখানা ছবি তুললেন। আস্ত এক রোহিত মৎস্য ফ্রাই করে টেবিলের উপব সাজিয়ে রেখেছেন, কাঁটা-চামচ রাখা আছে, মাছটা যেন সত্যিই জ্যান্ত, জ্বলজ্বল করে চেয়ে আছে। কাজিদা বললেন, "না বাবা, আমি প্রাণী-হত্যা করতে পারব না।'—খুব হাসির হিল্লোড় বয়ে গেল।

কবীর সাহেবের বাড়ীটা বহু দেশের সংস্কৃতিতে ভরা। ঘরের ভিতরে কোথাও রেখেছেন লাউগাছ পুঁতে, লতিয়ে লতিযে সেটা উঠেছে জানালা বেয়ে। কোন ঘরের কোণে জাল দিয়ে রেখেছেন কতকগুলো ছোট ছোট পাখী। আর সারাটা বাড়ীতে খুব কম হলেও দু'শ হাসনুহেনার গাছ। এঘর সেঘর দেখিয়ে কবীর সাহেব আমাকে চুপটি করে বললেন, "আপনি আমার সাথে আসুন, একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এটা আমার নিজস্ব, কাউকে দেখাই না, আপনাকেই শুধু দেখাতে চাই।" অবাক হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম। তালাচাবি দেওয়া একটা প্রকোষ্ঠ। দরজা খুলতেই ভেসে এল লোবান ধূপ ধুনা আতরের গন্ধ। স্বর্গীয় একটা সুবাসে অন্তর হল ভবপুব। জানালা খুলে দিলেন। দেখলাম তাজমহলের অনুকরণে ঘরের ভেতরেই আর এক তাজমহল—পাশে জায়নামাজ তসবিহ। বললেন, "এই-ই আমার এবাদতখানা।" বললাম "কিন্তু এই সুন্দর তাজমহলের মানে?" সেকথার কোন জবাব দিলেন না তিনি, চোখ দুটো' শুধু অশ্রুভাবাক্রান্ত হয়ে উঠল। আর বললেন, "দোওয়া করবেন"।

হিলি ষ্টেশনের কাছে জয়পুরহাটের স্কুলের ছেলেরা একবার আমাকে দাওয়াত করে নিয়ে গেল। সন্ধ্যার পর বসল তাদের গানের আসর; কিন্তু একটি ছেলে বললে, "দেখুন, এখানে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইলে একটা মস্ত বড় গণ্ডগোল হবে কারণ এখানে লা-মজহাবীর সংখ্যাই বেশী। এরা গান-বাজনা খুবই আপত্তিকর মনে করে।" প্রথমটায় সত্যিই বড় দমে গেলাম। তা ছাড়া শিল্পীরা কোনদিনও হুড়হাংগামা সইতে পারে না। শান্ত পরিবেশ না হলে চারধারে স্তব্ধতা বিরাজ না করলে অসুরের শব্দে সুর পালিয়ে যায়। আমি ষ্টেজে ঢুকলাম। সভার সবারি উদ্দেশ্যে সালাম জানিয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম। এক ভদ্রলোক আমাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি নাকি যন্ত্রসহকারে এখানে গান গাইবেন, কিছুতেই তা হবে না"। আমি বললাম, "কে বলেছে গান গাইব? আমি গান গাইব না, কয়েকটা কথা বলব মাত্র। আচ্ছা, তেরশ' বছর আগে আরব দেশে যেদিন আমাদের প্রিয় নবী এই দুনিয়ায় নাজেল হলেন তখন সারা প্রকৃতির অবস্থা কি হয়েছিল, তিনি এসে আমাদের জন্য কি বাণী প্রচার করলেন, শুনুন", এই বলে সুরে সুরে গাইলাম—

'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে'।

"শুনতে চান এই জিনিষ"? সব্বাই একসাথে চেঁচিয়ে উঠল, "জি জি বলুন"। আমি ইশারা করলাম—সবাই বসুন। মন্ত্রমুগ্ধের মত সভায় সবাই বসল এবং চারদিকে স্তব্ধতা

বিরাজ করতে লাগল। এরপর গাইলাম, "সৈয়দে মক্কী মদনী"। তারপরই বিদায় নিয়ে বললাম, "আচ্ছা, তাহলে আজ আসি"। সভায় উঠল হট্টগোল, "না না আমরা শুনতে চাই, আরো বলুন, আরো গান!!" আমি বললাম, "যদি শুনতেই চান"—পাশে ইশারা করে বললাম, "এই হারমোনিয়ামটা দাও।" হারমোনিয়াম বাজিয়েই ধরলাম, "বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা"। এরপর আরম্ভ করলাম বক্তৃতা। আচ্ছা, "মাংস রান্না করতে গিয়ে কি কি মশলা লাগে? কেউ বলবেন পেঁয়াজ, কেউ বলবেন রসুন আমি বলি কি—আসল জিনিষই তো বাদ দিচ্ছেন। সব মশলাই দিলেন, কিন্তু লবণ তো দিলেন না?" ইশারা করলাম, "ষ্টেজের ভিতরে নিয়ে এসো"। এল তবলা নিয়ে তবলচি। গান ধরলাম, "আমার মোহাম্মদের নামের ধেয়ান হৃদয়ে যার রয়"।

এরপর গাইলাম,

'জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান।'

এরপর গান থামিয়ে বললাম মুসলমান সমাজের গলদ কোথায় ; অশিক্ষা কুশিক্ষায় এমনিতেই সবাই ক্লীব হয়ে গেছে—তার উপর জগদ্দল পাথরের মত এই সমাজের বুকে বসে আছে কাঠমোল্লার দল। এই পাথর সরিয়ে বেরিয়ে এস তরুণ পথিক, হাঁক দাও নতুন সুরে নয়া জামানার নব-নকীব, ঘুচিয়ে দাও সরিয়ে দাও এই জঞ্জাল, জ্বালো জ্ঞানের মশাল!!

জীবনে সেদিন পেলাম এক নতুন আস্বাদ। কারণ গানের শেষে সভার প্রত্যেকটি লোক আমার সাথে হাত মেলাল। কণ্ঠে তাদের আশার বাণী, চোখে তাদের ভবিষ্যতের আলো! সমাজে এ-ধরণের কাজ গান দিয়েই কার্যকরী হবে বেশী, বুঝলাম—তাই বাংলার মুসলিম সমাজে যেখান থেকে আসত আহ্বান, উপেক্ষা না করে শারীরিক শত কষ্টকে উপেক্ষা করেও ছুটতাম, সাড়া দিতাম তাদের আহ্বানে।

বোধ হয় এই জন্যেই কবি গোলাম মোস্তফা কোন এক সভায় আমার সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, আব্বাস এ যুগের মডার্ন মৌলবী।

মোহামেডান স্পোর্টিং উপরি 'উপরি' পাঁচ ছ'বছর লীগ-বিজয়ী, শীল্ড বিজয়ী। সারা বাংলার আকাশ-বাতাস তখন 'মোহামেডান স্পোর্টিং জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখরিত। এঁদের খেলায় জয়লাভের জন্য গ্রামে মুসলমানদের রোজা রাখতে দেখেছি। খেলা দেখবার জন্য দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া থেকে দলে দলে মুসলমানরা আসত। বাংলার মুসলিমদের জাগরণের মূলে মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলার অবদান যে কত বিরাট, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকেরা নিশ্চয়ই সে কথা ভুলে যাবেন না। কবি গোলাম মোস্তফা এই ইতিহাসকে রূপ দিলেন গানের ভাষায়—"লীগ বিজয় না দিগ্‌বিজয়"। সে গান আমি রেকর্ড করলাম। বাংলার ঘরে ঘরে দিলাম রেকর্ডের মাধ্যমে মুসলিমের বিজয়-বারতা পৌঁছে।

রাজা-মহারাজা, আমীর-ওমরাহ, নবাব-বাদশাহ এদেব দরবারে সভা-গায়ক ছিল, এখনো কিছু কিছু আছে। সম্রাট আকবরের দরবারে তানসেন সভা-গায়ক ছিলেন, এ তো সবারি

জানা কথা। কিন্তু কিছুদিন আগেও জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুরের রাজা-মহারাজা সাইগলকে সভা-গায়ক রেখেছিলেন। একই গায়ক এতগুলো রাজরাজড়ার দরবারের গায়ক কি করে হয়, এ প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক। জয়পুর হয়ত গায়ককে সভা-গায়ক করে নিলেন বছরে দু'হাজার টাকা পারিশ্রমিক হিসেবে, বছরে এক আধবার আসতে হয়। বরোদার গাইকোয়াড় শুনলেন সাইগল জয়পুরের সভাগায়ক, তিনি তাঁকে তলব করে বললেন—বছরে চার হাজার টাকা একবার মাত্র দরবারে হাজির হতে হবে। এমনি করে শুনেছি সাইগলের ভাগ্যে বহু করদ-মিত্র-রাজার দরবারে সভা-গায়কের সম্মান জুটেছিল।

আমি ভাবছি রাজরাজড়ার সভা-গায়ক হবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয়নি বটে, কিন্তু বাংলাদেশে এ-জীবনে অন্ততঃ পাঁচ হাজার সভায় যোগদান করার মহাসৌভাগ্য তো হয়েছিল। আর সে সব সভায় শ্রোতা ছিল দেশের আপামর জনসাধারণ। তাদের মাঝে গানে গানে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি দেশাত্মবোধ, আত্মসচেতনতা, বাঁচার অধিকার, জাগিয়ে দিয়েছি হারিয়ে যাওয়া পল্লীর কথা, পল্লীর গাঁথা, পল্লীর সুর, তাদের অবচেতন মনে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে দিয়েছি, বলেছি, উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত।

রাজ-সভায় থাকে বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত, অভিজাত অতিথি আর আমার শ্রোতা গ্রামের করিমুদ্দি, ধলাই মিঞা, সর্বেশ্বর দাস, পেনকেটু বর্মণ। এরা যখন আমার গানে শুনেছে—

ওঠরে চাষী জগৎবাসী ধর কষে লাঙল
ও ভাই) আমরা ছিলাম পরম সুখী ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন) গলায় গলায় গান ছিল ভাই গোলায় গোলায় ধান
আজ) কোথায় বা সে গান গেল ভাই কোথায় সে কৃষাণ
ও ভাই) মোদের রক্ত জল হয়ে আজ ভরতেছে বোতল।

—তখন তাদের চোখ হয়েছে অশ্রুসজল। কিন্তু হুঙ্কার দিয়ে আবার যখন গান ধরেছি—

আজ) জাগরে কৃষাণ সব তো গেছে কিসের বা তোর ভয়
এই) ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়,
ঐ) দিগ্বীজয়ী দস্যুরাজার হয়কে করব নয়
ওরে) দেখবে এবার সভ্যজগৎ চাষার কত বল।

তখন এ গান শুনে পেনকেটু আর করিমুদ্দির হাতের মুঠোর তলে লাঠির বাঁট আবার মোচড় দিয়ে উঠেছে।

ছাত্রদের মিলাদের সভা, সরস্বতী পূজাব জলসা, স্কুল কলেজের চ্যারিটি শো, দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য বিচিত্রানুষ্ঠান, এ ছাড়া হাজারো রকমের জনসমাগমে সারা দেশের সভায় সভা-গায়কের সম্মান পেয়েছি। সারা দেশের আবালবৃদ্ধবণিতার শুভেচ্ছা, প্রীতি কুড়িয়েছি। যশের আশায় নয়, তাদের মনে ক্ষণিকের জন্য দিতে পেরেছি আনন্দ, গানের ভিতর দিয়ে দুটো কাজের কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি বলেই নিজেকে ধন্য মনে করতাম।

।। শেরে বাংলা ফজলুল হকের সাথে ।।

এ. কে. ফজলুল হকের সাথে একদিন হল পরিচয়। এক সভায় তিনি আমাব গান শুনে কাছে ডাকলেন। তখন তিনি বেনেপুকুর লেনে এক বাসায় থাকতেন। গোলটেবিল বৈঠকে যাবার আগের দিন তিনি আমাকে দাওয়াত করলেন মিলাদে! মিলাদ হয়ে গেলে তিনি একটা হারমোনিয়াম নিয়ে এলেন ঘরে। আট দশজন মাথায় পাগড়ী-বাঁধা মওলানা দাঁড়িয়ে উঠল। ফজলুল হক সাহেব বলে উঠলেন, "আপনাদের যাদের আপত্তি থাকে যেতে পারেন, এবার হারমোনিয়াম দিয়ে আব্বাসের মিলাদ-পড়া শুনব"। কথার ভেতর নতুনত্ব আছে বৈকি! বাংলাদেশে মোল্লা সমাজের মুখের ওপর এতবড় কথা কেউ কখনো শুনেছেন কি? মোল্লারা একথা শুনে সত্যিই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। আমাকে গাইতে বললেন তিনি। আমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরলাম "তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে"। ফজলুল হক সাহেবের দু'চোখ বেয়ে বইছে অশ্রুর লহর। মোল্লারা দরজার গোড়ায় থ'খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একে একে সবাই আসন গ্রহণ করল। আমি আর একটা গান ধরলাম—

'জাগে না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান'।।

মোল্লাদের চোখেমুখে ফুটে উঠল আনন্দের হাসি। হক সাহেব বোঝালেন, "এ গান কি হারাম? আগেই চলে যাচ্ছিলেন তো, এখন কেমন লাগছে?"....

হক সাহেব ফিরে এলেন গোলটেবিল বৈঠক থেকে। ময়মনসিংহে বিরাট কৃষক-প্রজা কনফারেন্স। এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আকরম খাঁ, কে. জি. এম. ফারুকী, নলিনী সরকার— বড় বড় নেতার সমাবেশ। বিরাট প্যাণ্ডেল, প্রায় ষাট হাজার লোকের সমাবেশ। এত বড় সভায় গাইবার সুযোগ জীবনে সিরাজগঞ্জের পরে এই-ই। বুকে এক অদম্য সাহস এল।

গান ধরলাম—

বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি
মুসলমান
দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার ভাঙা কেল্লায়
ওড়ে নিশান।।

—সভা জমে উঠেছে। এক একজন বক্তার বক্তৃতার শেষে আমাকে এই ধরণের গান গাইতে হচ্ছে। রেকর্ডের মারফতে যারা আমার নাম শুনেছে তারা আমাকে সামনে দেখে উল্লসিত। জোশের মাথায় সভাশেষে আমার সান্নিধ্য লাভ করবার জন্য সভাগৃহে সে কী হুটোপুটি! গিয়াসউদ্দিন পাঠান আমাকে কোনরকমে সেই জনসমুদ্র থেকে বাঁচিয়ে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আসেন।

বরিশাল জেলায় হক সাহেবের নিজ গ্রাম চাখারে কলেজের উদ্বোধন। হক সাহেব বললেন, "আব্বাস, তুমি কিন্তু যাবে"। কথা দিলাম। কলকাতা থেকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন তাঁর সংগ নিয়েছেন। আমি পরের ট্রেনে রওনা হলাম ববিশাল। রাত চারটার সময় ঝুলারহাট ষ্টেশনে ছোট্ট লঞ্চে উঠতে যাব, এমন সময় হক সাহেব বাইরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "সব্বাই চলে গেছে চাখার। আমি তোমাকে নেবার জন্য লঞ্চ নিয়ে এখানে আছি"। অবাক হলাম। রাত চারটার সময় পোলাও কোর্মা খেতে দিলেন আমাকে।

বাংলার লাট আসবে চাখার কলেজ উদ্বোধন করতে। কলেজ হোস্টেলের ছেলেরা আমাকে হোস্টেলে নিয়ে গেল। বিস্কুট দিয়ে মালা গেঁথে আমার গলায় দিয়েছে। বললাম "এ মালা যে বেশীক্ষণ গলায রাখতে পারব না, মালার গন্ধ যে উদরে জ্বালিয়ে দিচ্ছে ক্ষুধার হুতাশন"! ছাত্রদের এক মজার বক্তৃতা শোনালাম, যে-বক্তৃতার অবিকল উদ্ধৃতি কবেছিলেন লাট সাহেব কলেজ উদ্বোধনী বক্তৃতায়। বললাম, "জানি না তোমাদের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যের দিন বলব। কারণ চাখারের মত অপগণ্ড গ্রামে কিনা কলেজ হল! দুর্ভাগ্যই বলব, কারণ ম্যাট্রিক পাশ করে কোথায় যাবে কলকাতা, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, ঘোড়াব গাড়ী, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, সিনেমা, থিয়েটার, নারী-প্রগতি দেখে শুনে কোথায় জ্ঞানের পরিধি বাড়াবে, তা নয় সেই লগি ঠেলে ঠেলে কলেজে আসা"—খুব হাততালি পড়ল।

"কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তোমাদের আজ মহা সুদিন। এমন ভাগ্য বাংলাদেশের ছেলেদের ক'জনের হয়েছে? কলকাতা তো একদিন যাবেই বি. এ. পড়তে; কিন্তু আরো যে দুটি বছর শান্তশ্রী পল্লীর বুকে মায়ের কোলে থেকে গ্রামের খাঁটি দুধ ঘি খেয়ে উচ্চশিখরে দুটো ধাপ এইখান থেকেই উঠতে পারবে একি কম কথা! কথায় কথায় কলকাতার মত দালানে দৃষ্টি আছাড় খেয়ে পড়বে না, যেদিকে তাকাও নীল আর সবুজ, সবুজ আর নীল, তোমাদের মনটিও থাকবে এমনি চির সবুজ-চির-তাজা"।

ফজলুল হক সাহেব কাজিদাকেও খুব ভালোবাসতেন। ওয়াছেল মোল্লার দোকানের দোতালায় একবার ঈদ-রি-ইউনিয়নে কাজিদা আর আমাকে দাওয়াত করা হয়েছিল। সেখানে ফজলুল হক সাহেব উপস্থিত। তিনি বললেন, "কাজি একটা ঈদের গান গাও দেখি"। হালে একটা গান আমি রেকর্ড করেছি, কাজিদা আর আমি দু'জনে মিলে গাইলাম—

ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক হো
রাহেলিল্লাহ্ কে আপনাকে বিলিয়ে দিল
কে হল শহীদ?

—হক সাহেবও ঐ মজলিসে বসে একটা কবিতা লিখলেন এবং সেটা পাঠ করে শোনালেন—

'দেখিনু সেদিন রাত্রে অদ্ভুত স্বপন
শ্মশান মাঝারে, এক মহান মানব বিভূতিভূষিত

জিজ্ঞাসিনু তারে ঃ কহ তুমি কেবা?
কহিল—আমি যে কবি। পৃথিবী
শ্মশানে আমি গাহি সদা জীবনে গান'।

—সবাই অবাক। তিনি বললেন, "দেখুন, আমি যদি কাজি আর আব্বাসকে নিয়ে বাংলাদেশে বের হই তাহলে সারা বাংলা আমি জয় করতে পারি কদিনের ভেতরেই"।

মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে আম্রকুঞ্জে সভা বসেছে। সৈয়দ বদরোদ্দোজা সে সভায় বক্তা—বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে আমি গান গেয়ে চলেছি। সভাশেষে সেই রাতেই কলকাতা ফিরে আসবার কথা, কিন্তু মুর্শিদাবাদে এসে সিরাজের স্মৃতি মনকে করে তুলল ভারাক্রান্ত। কালকাতা না ফিরে মুর্শিদাবাদে এলাম। নবাববাড়ী দেখার পর সিরাজকে যেখানে হত্যা করা হয়েছে সেই শহীদ-রক্ত-রঞ্জিত পবিত্র স্থানটি দেখতে গেলাম। একটা নিমগাছের গোড়ার পাশেই নাকি তিনি শহীদ হয়েছেন। সে জায়গার কিছু মাটী তুলে নিলাম।

এর কয়েকদিন পরেই কলকাতায় অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিচিহ্নটি তুলে দেবার জন্য আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে উঠল। গ্রামোফোন কোম্পানীতে সোমবাবুকে বললাম, "হেমদা, সিরাজের স্মৃতি নিয়ে একটা রেকর্ড করলে হয় না"? তিনি বললেন, "চমৎকার কথা। গান জোগাড় করুন"। বন্ধুবর কবি শৈলেন রায়কে বললাম। চমৎকার গান দিল দু'খানা। একধারে সিরাজ, অন্য ধারে পলাশী। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুরশিল্পী বন্ধুবর হিমাংশু দত্ত সুর-সাগরকে দেওয়া হল সেগানে সুর-সংযোগ করবার জন্য। অপূর্ব সুর সংযোজিত হল। গান রেকর্ড করলাম।

কিন্তু এ গান বাজারে ছাড়তে গিয়ে সোমবাবু একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ তখনো অপসারিত হয়নি। বাংলার প্রধানমন্ত্রী তখন এ.কে. ফজলুল হক। সোমবাবু বললেন, "আপনি যদি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে 'রেকর্ড বের করতে আপত্তি নেই' কথাটা নিয়ে আসতে পারেন তবে বড় ভালো হয়।" রেকর্ডের দু'খানা নেগেটিভ কপি নিয়ে একদিন প্রধানমন্ত্রীর বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। তাঁকে বললাম, "আপনাকে দু'খানা গান শোনাতে এসেছি।" তিনি বললেন, "কি গান"? বললাম "সিরাজ-পলাশী"। তিনি বললেন, "আচ্ছা, শোনাও"। সাথে এক পোর্টেবল গ্রামোফোন নিয়ে গিয়েছি। রেকর্ড জুড়ে দিলাম। ঘর-ভরা লোকের মধ্যে তিনি রেকর্ড দু'খানা যতক্ষণ বাজছিল ছেলেমানুষের মত কেঁদেই চলেছেন। ...রেকর্ড থামল। বললেন, "বেশ সুন্দর হয়েছে।" আমি বললাম, "তা তো হয়েছে, কিন্তু এ রেকর্ড তো বাজারে বের করা যাচ্ছে না"। তিনি ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে বললেন, "সিরাজকে হত্যা করেও তাদের মনের ঝাল মেটে নি? তার জন্য দু'দণ্ড শোকও প্রকাশ করতে দেবে না? কোথায় সেই মীরজাফর, কোথায় সেই মোহাম্মদ আলী বেগ......"। ও বাবা, এযে দেখছি নাটকীয় ভংগীতে অভিনয় করে চলেছেন। হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন, কথা বলতে পারছেন না, গলা ধরে আসছে। কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন, "এ রেকর্ড কে বের করতে দিচ্ছে না? গ্রামোফোন কোম্পানীকে বলো গিয়ে এই রেকর্ড লক্ষ লক্ষ ছাপিয়ে যেন প্রতিটি বাঙালীর ঘরে পৌঁছে দেয়"। আমি বললাম, "তা আমার কথায়

তো হবে না, আপনি শুধু একটু কাগজে লিখে দিন 'নো অবজেকশন' অর্থাৎ 'আপত্তি নেই"। কাগজ বের করে তক্ষুনি তাই লিখে দিলেন।

বহু জাতি, বহু ভাষাভাষী, বহু মতাবলম্বী ভারতে মুসলমানকে তার কৃষ্টি, তার ধর্ম, তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বেঁচে থাকবার জন্য যে পথের আলোকরশ্মি নিয়ে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দেখা দিলেন, সে পথের শরিক হয়ে একে একে ভারতের মুসলমান নেতা, দেশপ্রেমিক, কর্মী তাঁর হাতে হাত মিলিয়ে বলে উঠলেন, তোমার নেতৃত্ব আমরা মেনে নিলাম। একতার বাণী যা ইসলামের মূলমন্ত্র আত্মবিস্মৃত জাতি তাকে আবার গ্রহণ করল। সত্যি মুসলমান তখন জেগেছে। আত্মচেতনা তারা ফিরে পেয়েছে। লীগের পতাকাতলে দলে দলে এসে জমায়েত হয়েছে তারা।

এই লীগের মর্ম, লীগের বাণী বহন করে এক সময় সৈয়দ বদরোদ্দোজা বাংলাদেশে তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতার ভিতর দিয়ে ইসলামের সৌন্দর্য, শিক্ষা, ধর্ম এমন প্রাঞ্জল ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় প্রচার করতে আরম্ভ করলেন যে অতি অল্প দিনের ভিতরই তিনি সারা বাংলার মুসলমান তরুণদের অন্তর জয় করতে সক্ষম হলেন। এই বদরোদ্দোজা সাহেবের সাথে সেই সময় বাংলাদেশের বহু সভা-সমিতিতে যোগদান করেছি।

সৈয়দ বদরোদ্দোজা আর আমাকে সিলেটের ছাত্রেরা একবার নিয়ে গেল সিলেটে। সিলেটের প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হলাম। সামনেই সুরমা নদী। প্রথম গান গেয়েছিলাম—

এই সুন্দর ফল সুন্দর ফুল মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহের বাণী।।

সেদিন বদরোদ্দোজার বক্তৃতা সিলেটবাসীর প্রাণে জাগিয়ে তুলেছিল এক অপূর্ব প্রেরণা।

ফজলুল হকের নাম তখন বাংলার আপামর জনসাধারণের মুখে। অতবড় জনপ্রিয় নেতা আর বাংলাদেশে নেই, শুধু বাংলায় কেন সারা ভারতে তখন তাঁর উপাধি শেরে বাংলা। একাদশ মন্ত্রীকে যেদিন কলকাতার টাউন হলে প্রথম অভিনন্দন দেওয়া হয় সেদিন আমি গেয়েছিলাম—

ভারতের দুই নয়ন-তারা হিন্দু মুসলমান
দেশ-জননীর সমান প্রিয় যুগল সন্তান।
হিন্দু মুসলমান।।

দেশবরেণ্য পি, সি, রায় সভাপতি। আমার এই উদ্বোধনী সংগীতের জের টেনে তিনি বলেছিলেন, "একাদশ মন্ত্রী হিন্দু মুসলমান মিলিত একাদশ ফুটবল খেলোয়াড়ের মত সারা ভারত জয় করুক তাঁদের আদর্শে, কর্মে এবং সেবায়, এই আমি প্রার্থনা করি।"

ফজলুল হক বলেছিলেন, "আমি বাংলার কৃষক-কুলের ভাত-ডালের যাতে সংস্থান হয়, দু'মুঠো ভাতের অভাবে যেন কষ্ট না পায় সেদিকে আর বাংলার চির উপেক্ষিত স্কুল-মাষ্টার যাঁরা দেশের মেরুদণ্ড তাঁদের আর্থিক কষ্ট দূর করার দিকেই দেব আমার প্রথম এবং সর্বপ্রধান দৃষ্টি। সভায় পড়েছিল করতালি।

।। রেডিওতে ।।

কলকাতা রেডিওতে ফাতেহা দোয়াজ দহমের উপর এক জীবন্তিকা প্রচারিত হবে। হজরতের জন্মবৃত্তান্ত, কোরেশদের অত্যাচার, ওহোদের যুদ্ধ ইত্যাদি নানা ঘটনা শুধু কথা, বক্তৃতা এবং গানের মাধ্যমে রূপায়িত করা হবে। ষ্টেশন ডিরেক্টর নৃপেন মজুমদার বললেন, "না আব্বাস, এ ধরণের প্রোগ্রাম এই প্রথম ; মুসলমানরা যা গোঁড়া, আমার রেডিও অফিস উড়িয়ে দেবে। আচ্ছা, তুমি যদি মওলানা আকরম খাঁর কাছ থেকে 'আপত্তি নেই' বলে এই স্ক্রিপ্টের ওপর তাঁর সই নিয়ে আসতে পার আমি ব্রডকাষ্ট করব।"

মওলানা সাহেবের কাছে গিয়ে আগাগোড়া স্ক্রিপ্টটা শোনালাম। তিনি তো মহাউল্লাসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "এই রং দিয়ে আমাদের নীরস সমাজকে জাগাতে হবে। চমৎকার, চমৎকার"। তিনি লিখলেন, "এই ধরণের জীবন্তিকা যত প্রচারিত হয় ততই মংগল"। নৃপেন মজুমদার দেখে মহাখুশী। তিনি বললেন, "লিখে দাও তো সারা বৎসর তোমাদের কি কি পর্ব আছে"? আমি লিখে দিলাম, শবেবরাত, শবেকদর, ফাতেহা দোয়াজ দহম, ফাতেহা ইয়াজ দহম, মোহররম, ঈদুল ফেতর, ঈদুজ্জোহা ইত্যাদি। মুসলমানের এই সমস্ত পর্বের জন্য লেখা হয় বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রাম। গান, কথা, আবৃত্তি—নানাভাবে নানা রস-সম্ভারে সেই সমস্ত অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে লাগল। রোজার মাসে রেডিওতে আজান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল, শবেবরাতে প্রোগ্রাম করে খুব খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হল রেডিওতে।

রেডিওতে প্রথম প্রথম শুধু হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতে হত। গায়কের কাছে থাকত হারমোনিযাম। মাইকটা মুখের কাছে, তবলচি বসতেন একটু দূরে। হারমোনিয়ামটা যতখানি সম্ভব খুব আস্তে বাজাতে হত, নইলে ওর শব্দে গানের বাণী চাপা পড়ে যেত। এরপর হারমোনিয়ামের শব্দ সংযত করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর হত না বলে হারমোনিয়ামটা একটা বড় কাঠের বাক্স দিয়ে তিন দিক থেকে ঢেকে দেওয়া হল। তাতে হারমোনিয়ামের শব্দ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হল। যখন এই হারমোনিয়াম যন্ত্রকে একদম রেডিও থেকে বাতিল করে দেওয়া হল তখন সব গায়ক-গায়িকা পড়লেন মহা-বিপাকে। তানপুরার সাথে আগেই সুর বেঁধে যাদের একক গানের প্রোগাম থাকত, তারা তো সুরটা মিলিয়ে একবার আ-করে গান ধরলেন, উৎরে গেলেন, প্রোগ্রাম শেষে বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বললেন, বাবাঃ, বড্ড বেঁচে গেছি। ও মশাই, কী মশাই, বেসুরো হয়নি তো? কেলেংকারী আর কি! মুস্কিল হত কোন ফিচার প্রোগ্রাম শুরু হলে। পুরুষদের সবারই কণ্ঠ একই সুরে বাঁধা নয়, মেয়েদেরও তাই। কোরাস গান হলে বিপদের কিছু ছিল না। বিপদ হতে লাগল, ধরুন, আমি এক স্কেলে গাইব, পঙ্কজ মল্লিক এক স্কেলে—ওদিকে অন্য দুটি মেয়ে কেউ বা 'জি'-তে কেউবা 'জি শার্পে' গান ধরবে।

প্রোগ্রাম শুরু হবার আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। পঙ্কজবাবু হাত নেড়ে চোখ উল্টে বলে উঠলেন, "বুঝুন ঠেলাটা—বলি তোরা হারমোনিয়াম উঠিয়ে দিলি বেশ করেছিস, কিন্তু এ যন্তরটা ওঠাবার আগেই যে পঞ্চাশটা বিভিন্ন স্কেলের তানপুরা দরকার হবে এটা

কি মাথায় ঢোকেনি? নাও এখন ঠ্যালা সামলাও। সবেধন নীলমণি ঐ তো একটা তানপুরা! এক কাজ কর, সোলো গানগুলো যে যার সুরে গাইবে বাবা, মনে মনে ঠিক করে নাও। শুধু কোরাসগুলো ঐ বি ফ্লাটে, কেমন? বাঁধ তানপুবা বি ফ্লাটে'—বলেই সুর দিলেন গলায়, "ও—ম"। তানপুরাওয়ালা বলে উঠলেন, "না পঙ্কজবাবু হল না, আর একটু সুরে। পিয়ানোটায় একবার স্ট্রাইক দিন না—"। কী বিচিত্র! এরপর অবশ্য এসব অসুবিধা দূর হয়ে গিয়েছিল।

এরপর শুধু তানপুরায় আর গান জমে কৈ? আমদানী হল বেহালা, সেতাব, এসরাজ, ফ্লুট, এককথায় পুরো অর্কেস্ট্রা-সহযোগে হতে লাগল গান।

রেকর্ড জগতেও তো প্রথম গান করেছি শুধু হারমোনিযাম ও তবলা সহযোগে। তারপর সে জগতেও ক্লারিওনেটে তুলসী লাহিড়ীর ছোট ভাই গোপাল লাহিড়ী এক আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। তিনিই প্রথম ক্ল্যারিওনেটে ক্ল্যাসিকাল গানের সুর বাজান। তিনি গড়ে তুললেন এক অর্কেস্ট্রা। হরিমতীর নাচের গানে গানে এই অর্কেস্ট্রা বাদ্য প্রথম যুগান্ত আনয়ন করে। তারপর ধীরেন দাসের স্বদেশী গান 'শঙ্খে শঙ্খে মংগল গাও' ইত্যাদিতে অর্কেস্ট্রা প্রযোগ হল। মানুষ আর শুধু হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাওয়া রেকর্ড কিনবে কেন? শুরু হল গ্রামোফোন কোম্পানীতে অর্কেস্ট্রা পার্টীর চিরস্থায়ী আসন। এতে বহু গুণীজন স্থান পেলেন। কমিক গাইয়ে রঞ্জিত রায় বাজাতেন পিয়ানো, ক্ল্যারিওনেটে রাজেন সরকার, বেহালা-বাদক পরিতোয শীল, ম্যাণ্ডোলিনে টোপা, বাঁশের বাঁশীতে রাজাবাবু, তবলায় পরেশ ভট্টাচার্য, অসিত, সুবল দাশগুপ্ত। আমার আধুনিক বাংলা গান, ইসলামী গজল, কওমী-সংগীত, নাত এবং উর্দু-নাত-হামাদের সাথে অর্কেস্ট্রা সহযোগেই বেশীর ভাগ গান পরিবেশিত হয়েছে। শুধু ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া গানে পাক-ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী দোতারা-বাদক কানাইলাল শীলের দোতারা আর রাজাবাবুর বাঁশীই বেশী ব্যবহার করেছি। দোতারা আর বাঁশীই ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালীর প্রাণ। নেহাৎ যখন এরা কার্যব্যপদেশ কলকাতার বাইরে ছিলেন অথচ রেকর্ড না করলেও নয় তখন টোপাবাবুর ম্যাণ্ডোলিন বাদ্য-সহযোগে দু'চারখানা ভাটিয়ালী সুরে গান রেকর্ড করতে হয়েছে। এতে ভাটিয়ালী গানের অমর্যাদা করা হয়েছে স্বীকার করি। গ্রাম্য সুরকে যেমন আমি চিরঅবিকৃত রেখেছি, উচিত ছিল সেই সুর যে যন্ত্র সহযোগে আবহমান কাল ধরে গীত হয়ে আসছে সেই যন্ত্র ব্যবহার করা। দোতারা বাদকের অনুপস্থিতিতে ম্যাণ্ডোলিন বা গীটার সহযোগে গান রেকর্ড না করলেও পারতাম. কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি একটুখানিক বৈচিত্র্য ইচ্ছে করেই দিতে চেয়েছিলাম। অবশ্যি রেকর্ড আমার ঠিকই উৎরে গেছে—বিক্রীর দিক দিয়ে কোনও ভাটা পড়ে নি, আর যেটা আশংকা করেছিলাম, এ সম্বন্ধে কাগজে কোন বিরূপ সমালোচনাও শুনতে হয় নি। তবে আমার এ সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ তখন দেবার জন্য ঠিক করে রেখেছিলাম। গ্রামের এই সুরকে অবিকৃত রেখে নতুন যন্ত্র-সহযোগে গাইবার এ প্রচেষ্টা মন্দ কি? দোতারার সুরের সাথে প্রায় সামঞ্জস্য রেখে এই ম্যাণ্ডোলিন বাদ্য কি কানে শ্রুতিকঠোর ঠেকে? কথাটা উঠলে হয়ত আমার এ উত্তর অনেকের মনঃপূত হত।

আজ মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যিই সেভাবে আদৌ এক্সপেরিমেন্ট করা উচিত ছিল না আমার। সারা দুনিয়া আজ তৎপর হয়ে উঠেছে পল্লীগীতি ও সুর, তার আনুষংগিক যন্ত্রপাতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। তাই ঢোল, কাঁশি, খোল, করতাল, বাঁশী, মৃদংগ, দোতারা, যে-যন্ত্র আবহমানকাল থেকে চিরাচরিত পল্লীগীতিতে বাজানো হয়ে আসছে, সে-যন্ত্রের গণ্ডী ছাড়িয়ে অন্য নতুনের আমদানী করা আমার পক্ষে উচিত হয়নি। দু'হাজার বছর পরেও যেন আগামী দিনের মানুষ আমাদের অতীত ও বর্তমানের পল্লীসুর ও তাদের আদিম পুরুষের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে।

উত্তরকাল

।। কুচবিহারের কথা ।।

বাল্যের স্মৃতিকথার সাথে জড়িয়ে আছে একদিনের একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। কুচবিহরের মহারাজা মারা গেলেন। বর্তমান মহারাজা শ্রীজগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের বয়স তখন ছয় বৎসর। সেই ছোট্ট রাজার রাজ্যাভিষেক হল। আমরা সেই রাজ্যাভিষেক দেখতে গিয়েছিলাম। কত লক্ষ লক্ষ টাকা গান-বাজনা, আতসবাজি পোড়ানো, শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে ব্যয় হল। আমার ছোট্ট মনে তখুনি একটা কথা দোলা দিয়েছিল—রাজার রাজ্যাভিষেকে এত টাকা বাজি পুড়িয়ে, খাওয়াদাওয়ায় খরচ হল। এর এক সিকি কেন এক পাইও যদি আমার বলরামপুর স্কুলের জন্য দিত তাহলে তো ছাত্রবৃত্তি স্কুলটা আমাদের হাইস্কুল হতে পারত। আমাদের গ্রাম থেকে কত ছেলে বছরে ম্যাট্রিক পাশ করত।

সেই ধারণা অঙ্কুরিত হয়েছিল শৈশবে। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে সে চিন্তা শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছে। মনে মনে বৃথাই আক্রোশ হত যখন দেখতাম টাকোয়ামারী শিকার ক্যাম্পে প্রতি বছর মহারাজা (তখন অবশ্যি রাজমাতা রিজেন্ট) মৃগয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতেন। রাজার শিক্ষার জন্য তাঁকে বিলাত পাঠানো হল কত টাকা ব্যয় করে, আর আমার দেশের গরীব মেধাবী ছাত্রের জন্য বিলাত যাওয়ার ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার কথা রাজার মনে জাগে না!

ক্রমশঃ বৃহত্তর জগতের সামনে এসে আরো হোঁচট খেতে লাগলাম। বাংলা গভর্ণমেণ্ট দেশের স্কুল-কলেজগুলির সম্প্রসারণের জন্য কেমন তৎপর। আমাদের কুচবিহারের ঐ বিশাল রাজ্যে চারটা মহকুমায় মাত্র চারটা হাইস্কুল আর সদরে একটা করে স্কুল ও কলেজ! রাজ্যে এ নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে দেখিনি বা জীবনে কারুর মুখে কোন প্রতিবাদ শুনিনি।

নিজের গ্রাম বলরামপুরের উন্নতির কথা ভাবতাম কত ছোটবেলায়। তুফানগঞ্জে পড়ি তখন ফোর্থ ক্লাসে। তুফানগঞ্জে মেয়েদের পড়বার স্কুল আছে আর আমার গ্রামে নেই, মনে প্রবল ইচ্ছা জাগল স্কুল করতে হবে। বাড়ী এসে বাবাকে বললাম ;তিনি বললেন, "মেয়েদের লেখাপড়ার দিকে গ্রামের তো কারো উৎসাহ দেখি না"। আমি বললাম, "একটা সভা ডাকি।" স্থানীয় ছাত্রবৃত্তি স্কুলে একটা সভা ডাকা হল। গ্রামে বহু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর বাস। প্রায় আশী নব্বুই জন লোক সে সভায় উপস্থিত হলেন। বালিকা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর দু'একজন বক্তৃতা করলেন, চাঁদা দিতে সবাই স্বীকৃত হলেন। যাঁরা টাকা দিতে পারবেন না তাঁরা বছরের শেষে আট দশ মণ এমনকি বিশ মণ পর্যন্ত ধান

দেবেন বলে অংগীকার করলেন। আরো ঠিক হল পাঁচ ছ'দিন পরে আমি স্কুলঘরে 'রাতকানা' নামে একখানা নাটক অভিনয় করব। দু'তিনজন ছেলেপেলে নিয়ে টিকিট হবে চার আনা ও দুই আনা।

স্কুল ঘরে আর জায়গা দিতে পারি না, এমনিই লোকের ভীড়। প্রথম রাতে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকার টিকিট বিক্রি হল। পরের রাতেও তাই। একশ' টাকা মূলধন করে পরের দিন চাঁদার খাতা হাতে করে মাড়োয়ারীদের বাসায় বাসায় ঘুরে শ'তিনেক টাকা চাঁদা আদায় হল। যাঁরা ধান দিতে স্বীকার করেছিলেন তাঁদের ধান আদায় করে মোট প্রায় পাঁচশ' টাকা দিয়ে স্কুলের অন্যদিকে অর্থাৎ দীঘির দক্ষিণে এক টিনের ঘর তোলা হল। প্রথম মাসেই ছাত্রী সংখ্যা হল উননব্বই জন। স্কুলের বৃদ্ধ পণ্ডিত নাছেরউদ্দিন সাহেবকে বালিকা স্কুলের কাজে নিযুক্ত করা হল ,দু'চার মাস বেশ চলল স্কুল। সদর থেকে স্কুল ইন্সপেক্টর এসে স্কুল পরিদর্শন করে খুশী হয়ে লিখে গেলেন—এক বৎসর স্কুল চালাতে পারলে আসছে বছর সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে।

নাজির দেউ সাহেবের বংশধর টিকেন্দ্রনারায়ণ সিংহ তখন আই. এ. পাশ করে বলরামপুরে বাড়ীতে এসে বসেছেন। শিক্ষিত লোক....স্কুলের কাজে নিশ্চয়ই সহানুভূতি পাব তাঁর, তাই তাকে গিয়ে বললাম, "টিকেন দা, বড্ড খেটে খুটে বালিকা বিদ্যালয়টি করলাম। আপনার কাছে স্কুলের ফাণ্ড এই প্রায় শ'চারেক টাকা রাখতে চাই। আর আপনি তো বাড়ীতেই বসে আছেন, আমার এদিকে স্কুল করতে হয়। আমার নিজের স্কুলের তো ক্ষতি করতে পারি না। যতদিন আপনি কাজকর্মে না যান ততদিন আশা করি স্কুলটা চালাবেন। এই জমানো টাকা থেকে দশটাকা করে শিক্ষকের মাইনা দিলেও এক বছরের উপর মাইনা দেওয়া চলবে। ইন্সপেক্টর বলে গেছেন, এক বছর স্কুল চালালে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করা হবে।" টিকেনদা খুশী হয়েই টাকাটা রাখলেন।

তিন মাস পরে নাছের পণ্ডিত সাহেবের চিঠি পেলাম। "বাবা আব্বাস তিন মাস থেকে মাইনা বন্ধ করেছে টিকেন সাহেব। বলে যে জমা টাকা থেকে মাইনা চালালে তো শেষ হয়ে যাবে। আপনি মাসিক চাঁদা আদায় করে মাইনা নিন।"

টিকেন সাহেবকে চিঠি দিলাম উত্তর পেলাম না। কয়েকদিন পরে খবর পেলাম তিনি দারোগাগিরি পেয়ে মাথাভাঙ্গায় চলে গিয়েছেন। এ টাকাটা শেষ পর্যন্ত আর উদ্ধার করা গেল না বলে কয়েকমাস পর স্কুলটা বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর গ্রামের নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য আমাদের বাড়ীতেই নাইট স্কুল খুললাম। গ্রামের বৃদ্ধ, ছোকরা, চাষী সবাই এসে স্কুলে ভর্তি হল। একশ' খানা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রথম ভাগ তখনকার দিনে এক আনা দাম দিয়ে আমার বাবাই কিনে দিলেন। সাত আটটা ডিজ্ মার্কা হ্যারিকেন লণ্ঠন কিনে দেওয়া হল। বিনা পয়সায় মাষ্টারী করতে লাগলেন তরিপ দাদা, খগেন্দ্র দাদা আর মাঝে মাঝে আমার বড় ভাই আবদুল গফুর আহ্‌মদ। একশ' কুড়ি জন ছাত্র ঠিক একটি বছর পড়েছিল। তারপর স্কুল ভেঙে যায়।

আমাদের গ্রাম থেকে প্রথম ম্যাট্রিক পাশ করেন আমার মামাতো ভাই জনাব মজিরউদ্দীন

আহ্‌মদ। গ্রামবাসীর কি আনন্দ। তারপর যখন তিনি বি. এ. পাশ করেন তখন তো তাঁকে দেখবার জন্য কয়েক গ্রামের লোক ভেঙে এসেছিল। আইন পাশ করে তিনি কুচবিহারে ওকালতি করেন, বর্তমানে তিনি পশ্চিম বাংলা বিধান সভার সদস্য।

কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কুচবিহারে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ কুচবিহারে এসেছিল অন্যভাবে। কুচবিহারবাসী হিন্দু-মুসলমান বহিরাগত বর্ণহিন্দুদের দ্বারাই একরকম শাসিত। উকিল, হাকিম, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, প্রফেসার, মাষ্টার সব লাইনেই এদের কর্তৃত্ব। চাকরী-বাকরী খালি হলে ওদের ছেলেমেয়েদের দাবীই অগ্রগণ্য। স্কুল-কলেজে কুচবিহারী ছেলেদের প্রথম স্থান অধিকার করার ব্যাপারেও মাস্টার-প্রফেসারদের পক্ষপাতিত্ব দেখা যেত। কেবলমাত্র কুচবিহার জেন্‌কিন্স স্কুলে আমার সহানুধ্যায়ী ফয়েজউদ্দিন প্রতি বৎসর সব পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করত। দু'চারটি কুচবিহারী হিন্দু ছেলে যেমন সতীশ সিংহ রায় দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকার করত, আর তুফানগঞ্জে আমি প্রতি বৎসরই প্রথম স্থান অধিকার করতাম। কুচবিহারী ছেলেদের লেখাপড়ায় উৎসাহ দেবার জন্য বর্তমান মহারাজার খুল্লতাত প্রিন্স ভিক্টর এন, নারায়ণ কুচবিহার সদর এবং চারটি মহকুমার স্কুলে সব ক্লাশে পুরস্কার বিতরণের সময় নেটিভ প্রাইজের বন্দোবস্ত করলেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্থানীয় ছাত্রদের মধ্যে যারা শীর্ষস্থান অধিকার করবে তাদের জন্য নেটিভ স্কলারশিপও দিলেন। এ ছাড়াও গরীব মেধাবী ছাত্রের জন্য ফ্রি ষ্টুডেন্টশিপেরও বন্দোবস্ত করলেন।

যখন আমরা থার্ড ক্লাশে পড়ি তখন ফয়েজউদ্দিন একদিন তুফানগঞ্জে এল। স্কুলে যে কয়জন কুচবিহারী হিন্দু-মুসলমান ছেলে ছিলাম সবাইকে খবর দিয়ে রায়ডাক নদীর ওপারে কুলক্ষেতে গিয়ে মিলিত হলাম। ফয়েজ বলল, "দেখ আমরা কুচবিহারে কুচবিহারী ছাত্রদের নিয়ে 'কুচবিহার হিত-সাধিনী সভা' করেছি। উদ্দেশ্য আমরা আমাদের দাবীদাওয়ার উপর জোর দেব, সর্বত্র সেবাসদনের শাখা খুলব এবং বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যাতে কুচবিহারী ছাত্রদের দাবী উপেক্ষিত না হয় তার ব্যবস্থা করব এবং আমাদের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হবে—কুচবিহার কুচবিহারবাসীদের জন্য, অর্থাৎ বহিরাগত বা ভাটিয়াদের প্রভুত্ব আমরা এ রাজ্য থেকে উচ্ছেদ করব। এটা হচ্ছে শাখা সভা, প্রধান সভা কুচবিহারে।......কাজ হবে আমাদের খুবই গোপনে। বৎসরে একবার সদরে সভা হবে, যথাসময় তার খবর পাবে।"

কুচবিহারী ছেলেদের মধ্যে একটা আলোড়ন পড়ে গেল। কুচবিহার জেন্‌কিন্স স্কুলের হেডমাষ্টার মণীন্দ্রচন্দ্র রায় বাঘা লোক। সামান্যতম অপরাধ করলেই ছাত্রদের পিঠে তিনি বেত মারতেন। ফয়েজউদ্দিন তার জন্য একদিন প্রতিবাদ করেছিল বলে হেডমাষ্টার রাগে অন্ধ হয়ে তার পিঠে বেত মারবার জন্য উদ্যত হলেন। সারা স্কুলে ছাত্রসমাজে সে অতি ভাল ছেলে বলে পরিচিত। ছাত্ররা সবাই প্রতিবাদ করল, ফলে কুচবিহার স্কুলের জীবনে প্রথম হল ধর্মঘটের আয়োজন। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ল জেন্‌কিন্স স্কুলের বারান্দায়। হেডমাষ্টার প্রমাদ গুণলেন। রাজার রাজ্যে চাকুরী। রাজার কানে গেলে চাকুরী রাখা দায়। মানে মানে সকল দাবী তিনি মেনে নিলেন। ছাত্রদের আর বেত মারা হবে না, রাসের মেলায় যাত্রাগানের আসরে ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট আসন থাকবে—আরো যেন কি কি তা আজ মনে নেই।

বহিরাগত লোকজন বা ভাটিয়াদের একচ্ছত্র প্রাধান্য দেখে কুচবিহার হিত-সাধিনী সভার পত্তন হল। বর্তমান মহারাজা সত্যি সত্যিই কুচবিহারের আদি অধিবাসীদের মংগল কামনা করেন। বড় বড় চাকুরীতে দেশের উপযুক্ত লোককে নিয়োগ করলেন। বহিরাগতরা ক্রমশঃ মনে মনে প্রমাদ গুণতে আরম্ভ করলেন। কুচবিহার হিত-সাধিনী সভায় পরোক্ষে মহারাজার উৎসাহ ও আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পায়।

বিরাট আকারের কুচবিহার লাইনের মাঠে দুই লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে এক সভা হল। কুচবিহারের ইতিহাসে এত বড় জনসভা এই-ই প্রথম। কলকাতা থেকে আমি এসেছিলাম। সভায় আমার ছোট ভাই আবদুল করিমের লেখা "ও ভাই মোর কুচবিহারী রে" গানটা গাওয়ার পর সভায় অপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি হল। সেই গান সারা কুচবিহারে ছড়িয়ে পড়ল।

মহারাজা তখন কিছু পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন দিলেন। রাজ্যে কয়েকজন মন্ত্রী হলেন—অবশ্যি জনসাধারণের নির্বাচিত মন্ত্রী তাঁরা ছিলেন না, সবই রাজার মনোনয়নে। তবু যে কয়জন মন্ত্রী গ্রহণ করা হল তাদের অধিকাংশই মনোনীত হল কুচবিহারের আদি অধিবাসী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে থেকে।

রাজ্যের রাস্তাঘাট উন্নয়ন, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা এ সব দিকে দৃষ্টি দেওয়া হতে লাগল—মহারাজার ব্যক্তিগত গুণের উপর মুগ্ধ হয়ে দেশবাসী পরম শ্রদ্ধার চোখেই তাঁকে দেখতে লাগল। তিনি সুদূর গ্রামাভ্যন্তরে সাধারণ পোষাকে গরীব চাষীর ঘরে যেতে লাগলেন। বহু সভাসমিতিতে যোগ দিতে লাগলেন—দেশে সত্যিকারের একটা সাড়া পড়ে গেল। বাংলায় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা গেল। কুচবিহারের মহারাজা ফরমান জারী করলেন তাঁর দেশ থেকে যেন এক ছটাক চাউল বাইরে কোথাও না যায়। রংপুর ও জলপাইগুড়ি কুচবিহারের তিনদিক ঘিরে আছে। কড়া প্রহরী বসল সীমান্তে। সারা বাংলায় যখন চাউলের মণ একশ' ও তদূর্দ্ধে কুচবিহারে তখন চাইলের মণ মাত্র বারো টাকা। দলে দলে বাংলা দেশ থেকে অনাহারী অভুক্ত লোক প্রবেশ করতে আরম্ভ করল কুচবিহারে। মহারাজা তাদের জন্য ক্যান্টিন খুলে দিলেন এক জায়গায়—সীমাবদ্ধ করে রাখলেন তাদের একই জায়গায় এক ক্যাম্পে। কুচবিহারের লোক জানতেও পারল না সারা বাংলার উপর দিয়ে যুদ্ধের দিনে কত বড় মড়কের ঝড় বয়ে গেছে।

রাজার উপর আমারও গভীর শ্রদ্ধা হল। নিজের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এঁর পূর্বপুরুষদের মত আজ লণ্ডন, কাল বম্বে, পরশু দার্জিলিং বেড়িয়ে অনর্থক অর্থ অপচয় করতেন না। কুচবিহারেই বছরের অন্ততঃ আট মাস কাটাতেন।

দেশভাগ হবার বেশ কয়েকমাস আগে থাকতেই কুচবিহারের মহারাজা বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ সোহরাওয়ার্দীর কাছে একবার নয় আমি জানি তিন তিনবার গিয়ে তাঁর অভিমত চেয়েছিলেন ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেবেন কিনা সে সম্বন্ধে। তিনি বলেছিলেন, "আমার রাজ্যের তিনদিকেই পাকিস্তান, আপনার কি মত?" তিনবারই মন্ত্রীপ্রবর মহারাজাকে বলেছিলেন, "আমি খুব ব্যস্ত, কায়েদে আজমের সাথে পরামর্শ করে আপনাকে বলব।"

তখন আজাদী অর্জন করার মুখে পূর্ব পাকিস্তানের ওজারতির নেতৃত্ব নিয়ে শুরু হয়েছে নাজিমউদ্দীন সোহরাওয়ার্দীর দ্বন্দ্ব। কলকাতা-দিল্লী দিল্লী-কলকাতা করতে করতেই মন্ত্রী ও হবু-মন্ত্রীদের সময় চলে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী কে হবে এটাই তখন বাংলার মুসলিম রাজনীতিকদের সমস্যা, কুচবিহার বা ত্রিপুরা কোন্ চুলোয় গেল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।

মহারাজা আর কতদিন অপেক্ষা করবেন? ভারতে যোগদান করলেন তিনি অতি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর মৌনতা দেখে। কুচবিহার ভারতভুক্তির সাথে সাথেই মহারাজার হাত থেকে দুহাজার বছরের শাসনদণ্ড খসে পড়ল। কুচবিহার হিত-সাধিনী সভার কর্মকর্তাদের চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল। মহারাজা স্তম্ভিত হলেন, কিছুই তাঁর বলবার উপায় নেই।

তাঁর সম্মানে পড়ল প্রচণ্ড আঘাত। বাংলা দেশ ছেড়ে দলে দলে হিন্দুরা ঢুকতে লাগল কুচবিহার রাজ্যে। যে রাজা রাস্তায় বের হলে দু'ধারে লাভ করতেন অজস্র অভিবাদন, নবাগতের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা সেই রাজাকে দেখিয়ে দূর থেকে বলা শুরু করলে, "ঐ যে জগৎবাবু যাচ্ছেন।" কেউ বলত, "ঐ জগৎদা আসছেন!" রাজার নাম ছিল শ্রীশ্রী মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর। তাঁর নামের আগে শ্রী এবং পরের ভূপবাহাদুর খসে গেল—নামিয়ে আনল তাঁকে সিংহাসন থেকে একদম জগৎবাবুর আসনে।

চেয়েছিলাম নিজের গ্রামে হাইস্কুল, চেয়েছিলাম নিজের গ্রামের বারো মাইল রাস্তাটি পাকা হয়ে শহরের সাথে মিলিত হোক, চেয়েছিলাম হাসপাতাল। হাসপাতালের গোড়াপত্তন করে এসেছিলাম বহুদিন পূর্বেই। কিছুদিন আগে বাড়ী গিয়ে দেখলাম হাইস্কুলের জন্য দুটো ক্লাশ খোলা হয়েছে। একরাতে সংগীত জলসা করে প্রায় সাত শ' টাকা উঠেছিল—সব টাকা স্কুলের জন্য দিয়ে এসেছি। দেখলাম রাস্তাও পাকা হচ্ছে। আমার জন্মভূমির উন্নতি চাই। যতদিন বাঁচব আমার গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সবারি জন্য চাই দিন দিন উন্নতি।

এর আগেই বলেছি আমাদের গ্রামে হিন্দু-মুসলমান মিলে বসতি। তবে আমাদের গ্রাম বলতে সামান্য কয়েকঘর লোকের বসতি নয়। গ্রামের দৈর্ঘ্য প্রায় তিন মাইল, প্রস্থ প্রায় তিন মাইল। আমার বাড়ী গ্রামের মধ্যস্থলে। বাড়ীর পাশেই বিরাট বন্দর, সে বন্দরে দশ-বারো ঘর মাড়োয়ারী এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, বরিশালের বহু হিন্দু ব্যবসায়ীর দোকান। সপ্তাহে দু'দিন প্রকাণ্ড হাট বসে—তা ছাড়া দৈনিক বাজারও বসে। আমার বাড়ীর দক্ষিণে এক মাইল ব্যাপী মুসলমানের বাস। পূর্বে দিগন্ত-বিস্তৃত শস্যশ্যামলা মাঠ, তার মাইল দেড়েক পরেই হিন্দু বসতি। কোথাও আবার হিন্দু বাড়ীর পাশেই মুসলমানের বাড়ী।

একটা মজার ব্যাপার ছিল কুচবিহার রাজ্যে। মুসলমানরা প্রকাশ্যে গরু জবাই করতে পারত না। গোপনে জবাই করত। গরু জবাই করার খবর পেয়ে যদি কোন হিন্দু থানা বা কাছারিতে খবর দিত তবে গরু জবাইকারীর জরিমানা হত পঞ্চাশ টাকা আর যে খবর দিত তারও জরিমানা হত পঞ্চাশ টাকা। কাজেই কেউ খবর দিত না, আর হিন্দুদের মনে যাতে আঘাত না লাগে সেজন্য মুসলমানরাও গরু জবাই করত অতি গোপনে। কুচবিহারে যথেষ্ট

বাঁশবন। অবস্থাপন্ন লোক থেকে শুরু করে অতি সাধারণ কৃষিজীবীর বাড়ী পর্যন্ত এই বাঁশের চেগার দিয়ে ঘেরা। কাজেই বাড়ীর ভিতর এ কাজ করলে বাইরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়ার কথা নয়।

ছোটবেলায় মাষ্টারমশাইরা আমাকে বলতেন, "আব্বাসকে মুসলমান বলে মনে হয় না, ঠিক যেন বামুনের ছেলে।" আমি একবার এক মাষ্টারমশাইকে বলেছি, "স্যার আপনাকেও তো ঠিক মুসলমানের মত দেখা যায়।" তিনি বলেছিলেন, "কী করে আমাকে মুসলমান বলে মনে হয় তোমার?" আমি বলেছিলাম, "এই তো আপনার চেহারা বেশ আমাদেরি মতো সুন্দর।" এই কথা নিয়ে তিনি মাষ্টারদের সাথে আলোচনা করে একদিন বলেছিলেন, "আব্বাস, তোমার ধারণাই ঠিক, কারণ দেখতে পাচ্ছি কুচবিহারের মুসলমান ছেলেরা শতকরা নব্বুই ভাগই সুন্দর। এখানকার আদিম হিন্দুদের চেহারার সাথে তোমাদের মিল নেই।" স্কুলের মাষ্টার, অফিসার, হাকিম, মোক্তার এদের ছেলে-মেয়েদের চাইতে আমরা ভাইবোন কেউ তো দেখতে খারাপ নই, কাজেই সরল মনে মাষ্টারকে ঐ উত্তরই দিয়েছিলাম।

কুচবিহারে বি. এ. পর্যন্ত পড়ার সময় অর্থাৎ প্রায় ২৩/২৪ বছর বয়স পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটা বুঝতে পারিনি। কর্ম-জীবনে ক্রমশঃ হোঁচট খেতে শুরু করলাম, অথচ কলকাতা জনসমুদ্রবিশেষ, এখানে কেন এই ছুঁৎমার্গ ভাবতেও ব্যথা লাগে।

কলকাতায় বাসা ভাড়া নিতে গিয়ে এই জিনিষটা প্রথম চোখে পড়ল। বাসাভাড়া ঠিক হল। কিন্তু যেইমাত্র গৃহস্বামী আমার নাম জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন আমি মুসলমান অমনি বলে উঠলেন, "না না হবে না মশাই।" গৃহস্বামিনী পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমার দর্শনধারী চেহারা দেখে বোধহয় একটু প্রীতই হয়েছিলেন এই ভেবে যে যাক বাসায় এক ভদ্রলোক ভাড়াটেই এল, কিন্তু তিনি স্পষ্ট বলে ফেললেন, "ওমা ভদ্রলোক তো দেখতে ঠিক ভদ্রলোকের মতো, তা ভদ্রলোক মুসলমান?" আমার মুসলমানত্বই বলুন আর মনুষ্যত্বই বলুন এই প্রথম আঘাত লাগল। মেসে এসে সেদিন কী কান্না কেঁদেছি। এর চাইতে আমার কুচবিহার-ই ভালো। সেখানে সত্যিকার মানুষের বাস, এ কোন্ জনারণ্যে এলাম রে বাবা!

কিন্তু ক্রমে ক্রমে এ যেন সারা মুসলমান সমাজে নব নব সমস্যারূপে দেখা দিতে লাগল। উঠল কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে 'শ্রীপদ্ম' নিয়ে আন্দোলন। আমার আশৈশব নামের পূর্বেকার শ্রী সেখ আব্বাসউদ্দীনের 'সেখ' বর্জিত হয়েছিল অতি শৈশবে—যৌবনের সূচনায় এবার উঠে গেল 'শ্রী', রইলাম শুধু আব্বাসউদ্দীন। চাকুরীর বাজারে শুনতে পাচ্ছি হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের সমান তালে চলতে হলে সেখানে হওয়া উচিত ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি। বাংলায় হিন্দুরা শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত। দেশজননী দুই বাহু হিন্দু-মুসলমান, এক বাহু দুর্বল, কাজেই ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি করে অন্ততঃ চাকুরীর বাজারে কিছুদিন মুসলমানকে স্থান দিলে—ইত্যাদি।

তবু দুই সম্প্রদায়ে মনকষাকষির অন্ত নাই।

কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করে এসেছি—সেটা হচ্ছে খুব বড় বড় মুসলমানবিদ্বেষী

হিন্দু বন্ধুদের বাড়ীতে মগরেবের নামাজের সময় যখুনি নামাজ পড়বার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছি তখুনি তাঁরা অতি সমাদরে বাড়ীর সব চাইতে ভালো কামরাটায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তোয়ালে বা কাপড় বিছিয়ে দিয়ে নামাজ পড়তে বলতেন। এই জায়গায়ই হোঁচট খেয়েছি। কারণ একঘণ্টা আগের বন্ধুর বৃদ্ধকাকার সাথে ধর্মালোচনা করতে গিয়ে কী বাগবিতণ্ডাই না হতে যাচ্ছিল আর যেই নামাজ পড়বার জন্য মনোভাব ব্যক্ত করেছি অমনি বাড়ীর সব চাইতে ভালো ঘরটাতেই তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল।

নামাজ পড়ে শান্ত সমাহিত চিত্তে বন্ধুর কাকার সাথে কথা বলতে গিয়ে কাকা বলে উঠলেন—"কী বাবা, ধর্মের তর্ক আর করবে? বাইরেই আমরা মিছামিছি তর্ক করে মরি। চোখ বুঁজে ভগবানকে ডাকতে গিয়ে তুমিও যাঁকে ডাক আমিও তাঁকেই ডাকি, কাজেই ও-সময়টা বড় শান্তির সময়। আর এ কাজ যারা করে আমরা সত্যিই তাদের ভালোবাসি।"

আমার মনের একটা জিজ্ঞাসার আজো কোন জবাব খুঁজে পেলাম না। ১৯৫৫ সালে আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সংগীত সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় যাই। সেখান থেকে ফেরার পথে রেঙ্গুন আসি। রেঙ্গুনে প্যাগোডা দেখবার মত জিনিষ। লাখো লাখো টাকার হীরা মোতি মাণিক্যের মুকুট চন্দ্রহার দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে এক একটা বুদ্ধমূর্তি। এমনি এক বুদ্ধমূর্তির সামনে এক নবীন দম্পতি চোখ বুঁজে জোড় হাত করে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। চিরকালই প্রার্থনারত লোকের দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার বড় ভালো লাগে। নামাজ-রত নামাজীর দিকে চেয়ে থাকতে ভালো লাগে। প্রতিমার সামনে পুরোহিতের একাগ্রচিত্তে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে চেয়ে থাকতে দেখা ভালো লাগে। বৌদ্ধ দম্পতির দিকে তেমনি চেয়ে আছি। অকস্মাৎ দেখি ওঁদের চোখ বেয়ে নেমেছে শ্রাবণের ধারার মতো অশ্রুর ঢল। তেমন মূর্তি আর জীবনে দেখিনি। বুদ্ধের মূর্তি সামনে, শান্ত-সমাহিত, দম্পতি-যুগল চোখের পানিতে সেই মূর্তিকে করেছে স্নান সিক্ত।

আমার খোদাকে তখন মনে মনে ডেকে বলেছি—খোদা এরা চোখ বন্ধ করে চোখের পানিতে তোমাকে ডাকছে, এদের তুমি উদ্ধার করবে না যারা চোখ চেয়ে ধর্মের নামে ডাকাতির ব্যাসাতি করছে তাদের তুমি বেড়াপার করবে?

আগেই বলেছি, ধনীর ঘরের দুলাল না হলেও বাবার অবস্থা মন্দ ছিল না। বাড়ীর পূর্ব দিকটায় একসাথে দেড়শ' বিঘা খাস জমি আমাদের। ভোরবেলা সেই মাঠে আধিয়ারী প্রজারা হাল জুড়ত। কুচবিহারের আধিয়ারী প্রজার ব্যাপারটা একটু বলি। জমাজমি অল্পবিস্তর সব প্রজারই থাকত। কাজেই আধিয়ারী প্রজাদের মহা খোশামোদ করে আবাদ করাতে হত। হালের গরু দিতে হত, বীজধান দিতে হত, এরপরেও তাদের তোয়াজ করতে হত। সেজন্য সংগতিপন্ন লোকদের আধিয়ারী প্রজার উপর নির্ভর না করে বাড়ীতে চাকর রেখেও কৃষিকাজ করাতে হত। তেমনি নিজেদের চাকরবাকর দিয়েও পাঁচছয়খানা হাল চলত। মাঝে মাঝে বাবা বলতেন, "যাও তো হালুয়াদের (চাষীদের) তামাক দিয়ে এসো।" কল্কিতে তামাক সেজে মাঠের দিকে যেতাম। কল্কির আগুন যাতে নিভে না যায় সেজন্য গুড়ুক গুড়ুক করে হুঁকাটা টানতামও। তামাক নিয়ে গিয়ে বলতাম, "ও নিজা দাদা, নেও তামাকু

খাও। আমি একটু হাল বাই"। এমনি করে আমি হাল বাইতে শিখি, মই দেওয়া শিখি, পাট নিড়ন দেওয়ানি, বিছন ধান তোলা মানে বীজধান তোলা শিখি, রোয়া রোপন করা শিখি। শুধু তাই নয়, পাটক্ষেতের ছোট ছোট পাট যাকে বলে "বাজ পাটা" অর্থাৎ অকেজো পাট তাই কেটে পানিতে জাগ দিতাম, অর্থাৎ পাট পচাবার বন্দোবস্ত করতাম। ছুটীর দিনে বা স্কুল ছুটীর পরে বাড়ী এসে সেই পাট ধুয়ে শুকিয়ে চুপচাপ হাটে বিক্রী করে পয়সা জমিয়ে রাখতাম। অগ্রহায়ণ মাসে কুচবিহারে প্রসিদ্ধ রাসের মেলা দেখতে যেতাম। ক্ষেতে কারুর গরু-বাছুর বা খাসি-পাঁঠা ক্ষেত খেতে দেখলে সেই গরু বাছুর ধরে খোঁয়াড়ে দিতাম। খোঁয়াড়ওয়ালা গরু বা পাঁঠা প্রতি দু'এক পয়সা দিত। সেই পয়সা জমিয়ে রাখতাম। তুফানগঞ্জে দোলের মেলায় যেতাম সেই পয়সা নিয়ে! দু'আনা দামের লাল নীল রবারের বল কিনতাম। কত খুশীই হতাম! আর আজ বিশাল দুনিয়াটা এনে দিলেও তৃপ্তি নেই। হায়রে চাওয়া-পাওয়ার খেলা!!

সৈয়দ বদরোদ্দোজাকে একবার কুচবিহারে মিলাদ শরীফের সভায় ছাত্রেরা নিয়ে যায়, আমাকেও কলকাতা থেকে সেবারে কুচবিহারে আসতে হয়েছিল। ল্যান্সডাউন হলের সভায় কুচবিহারের মহারাজা সভাপতি। বদরোদ্দোজা সাহেব বার বার তাঁর বক্তৃতায় বলছিলেন, কুচবিহার আসার আগে কুচবিহারকে চিনতে পেরেছি আব্বাসউদ্দীনের গানের মাধ্যমে। এত সুন্দর ভাওয়াইয়া গানের সুর যে দেশের মানুষের কণ্ঠে শোভা পায় সে দেশ কাব্যময়, এ ধারণাটাই আমার মনে দানা বেঁধেছিল। কুচবিহারের মনোরম দৃশ্য দেখে সত্যি বলতে ইচ্ছে হয় এটা কবির দেশ।"

আর একবার অধ্যাপক নলিনী সরকারকে কুচবিহারে বক্তৃতা দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মহারাজ সভাপতি। বক্তা দাঁড়িয়ে উঠেই বললেন, "আব্বাসউদ্দীনের ভাওয়াইয়া গান যেদিন প্রথম শুনি জিজ্ঞাসা জাগল মনে এ কোন্ দেশের গান, এত করুণ, এক মিষ্টি। কুচবিহার বলে এক জায়গা আছে সেই দিনই উদ্ধার করলাম।"

মহারাজা তাঁর জন্মোৎসব দিনে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। কলকাতা থেকে আরো ক'জন বিশিষ্ট শিল্পীকেও আমাকে আনতে বলেছেন। খসরু সাহেব, রাজেন সরকার, কুসুম গোস্বামী ইত্যাদি ক'জনকে এনেছিলাম। রাতে খুব গানবাজনা হল দরবার হলে। আমি মহারাজাকে আমার কিছু রেকর্ড উপহার দিলাম তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। তার পরদিন তাঁর সাথে একটা ইন্টারভিউ নিলাম।

মহারাজার সাথে কথা বলায় অভ্যস্ত নই, হয় হুজুর বলতে হয়, নয়তো ইয়োর হাইনেস বলতে হয়। প্রতি কথায় 'স্যার' বেরিয়ে আসে। হিজ হাইনেসকে বললাম, "আমি আপনাকে স্যার-ই বলব।" তিনি হেসে বললেন "না না, আমি কিছু মনে করব না।"

আমি বললাম, "দেখুন কুচবিহার শহরে বাড়ী করলাম। কলকাতায় বহুদিন রইলাম, এখন মনে ইচ্ছা নিজের দেশে এসে দেশের সেবা করি। সেজন্য যদি একটা চাকুরী—আর শুনছি জেলারের পোষ্টটা নাকি খালি হয়েছে।"

তিনি হেসে বললেন, "দেখুন, পাঁচ সাতশ' টাকার যে কোন চাকুরী আমি আজই

আপনাকে দিয়ে এখানে আনতে পারি, কিন্তু তা দেব না। আপনি কলকাতায় আছেন, ভালোই আছেন। খবরের কাগজ খুললেই আপনার নাম দেখতে পাই। আমার দেশের ইজ্জৎ বাড়াচ্ছেন আপনি। না না, আপনাকে এত সকালে কুচবিহারে আসতে মত দেই না। তবে যদি আর্থিক অসুবিধায় পড়েন কখনো আমাকে নিঃসংকোচে জানাবেন।"

।। নতুন চাকুরীতে ।।

হঠাৎ জরুরী তলব এল হক সাহেবের কাছ থেকে, আমাকে যেতে বলেছেন। ভাবলাম ব্যাপার কি? গিয়ে দেখি আলতাফ হোসেন সাহেব প্রমুখ উচ্চপদস্থ অফিসারদের (প্রাক্তন 'ডন' সম্পাদক) নিয়ে তিনি গল্প করছেন। হক সাহেব বললেন, "বাবা তোমার সেই গানটা গাও ত'?" গাইলাম—"তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।" এ গান শুনলেই অবধারিত আসত তাঁর চোখে পানি। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "আচ্ছা তুমি কী কর?" বললাম, "কেরানীগিরি করতাম ছেড়ে দিয়েছি।" উৎসাহভরে বলে উঠলেন, "বেশ করেছো, কেরানীগিরি জীবন শেষ করে দেয়।" তখন তিনি আলতাফ হোসেন সাহেবকে বললেন, "আচ্ছা, মন্ত্রীদের বক্তৃতা, জাতীয় উদ্বোধনের গান এসব রেকর্ড করবার একটা ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? সেই সব রেকর্ড গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দিলে গবর্ণমেন্টের কাজের প্রচার...." যেই বলা অমনিই লেখা হল একটা নোট। টাইপ করা হল। ফজলুল হক সাহেব বললেন, "পোষ্টটার নাম কি হবে আলতাফ তুমিই ঠিক কর।" তিনি বললেন, রেকর্ডিং এক্সপার্ট টু দি গবর্ণমেন্ট অব বেঙ্গল।"

সত্যি সত্যিই কলকাতায় ফিরে এসে দু'মাসের মধ্যে আমাকেই সে চাকুরীতে বহাল করে নেওয়া হল। এর আগের প্রায় বারো বছরের চাকুরী সত্যি সত্যিই ইস্তফা দিয়েছিলাম আমার উর্ধ্বতন অফিসারের দুর্ব্যবহারে। কি করে বলছি। রাইটার্স বিল্ডিং থেকে অফিস উঠে গেছে এ্যাণ্ডারসন হাউস—সেই আলীপুর। কলকাতা পার্ক সার্কাস থেকে অতদূরে অফিস করা। ক্রমেই যেন মন বিদ্রোহ ঘোষণা করতে লাগল। চাকরী করব না করব না ভাব। এমন সময় এল পূজার ছুটী। আমার উর্ধ্বতনকে বললাম, "স্যার পূজার বন্ধের সাথে আমি আরও দিন পনের ছুটী চাই, দার্জিলিং যাব। প্রত্যেক পূজার ছুটীতে তাই করি।" তিনি বললেন, "না হবে না, রোষ্টার করা হচ্ছে ছুটীতে। আপনাকে অফিস আসতে হবে।" আমি তখন অনুনয় করে বললাম, "স্যার এর আগে যত সাহেব এসেছিলেন কেউই আমাকে রোষ্টারে আসতে বলেননি, কারণ ৩২৫ মাইল দূরে আমার বাড়ী। এই বন্ধে বাপ-মা আমার আসা-পথ পানে চেয়ে থাকেন। তারপর বায়ু পরিবর্তনের জন্য আমি এ সময়টা দার্জিলিংয়ে....." কথা শেষ করতে দিলেন না। বলে উঠলেন, "পঞ্চাশ টাকার কেরানী তার আবার বায়ু পরিবর্তন।" আমি তাকে আর আদাবটি পর্যন্ত না করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছুটীর এক দরখাস্ত লিখে হেড এ্যাসিষ্টান্টের টেবিলে রেখে সোজা আলীপুর থেকে কলকাতা।

বন্ধে এলাম দার্জিলিং। কেরানীগিরিতে একবার ঢুকলে সত্যিই মানুষ মনোবল হারিয়ে ফেলে। ভাবলাম সাহেবকে চটিয়ে এসেছি—ছুটী তো দিলেই না, তবু এলাম। যাক খুব

কাব্যি করে দার্জিলিংয়েব বর্ণনা দিয়ে প্রায় পাঁচ ছ' পাতা ভর্তি এক চিঠি লিখলাম সাহেবকে। তিনি আবার হালে বিলাত থেকে কৃষি সম্বন্ধে কি একটা ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন, কাজেই মেজাজটা পুরো সাহেবী।

ছুটী শেষ হয়ে গেল। অফিসে যেতেই আমার তলব পড়ল সাহেবের কাছে। দুরু দুরু কম্পমান বক্ষে ঘবে ঢুকলাম। তাঁর প্রথম কথা হল, "ছুটী মন্‌যুর না করিয়ে কেন গেলেন আপনি?" আমি বললাম, "কি করি স্যার, আপনার মেজাজটা ভালো ছিল না; অনুরোধ করেছিলাম ছুটী দেন নি, কাজেই ছুটীর দরখাস্ত রেখে গিয়েছিলাম। রাগ পড়ে গেলে আপনি নিশ্চযই দয়া কবে ছুটী মন্‌যুর করবেন এই আশায়।"

"কিন্তু আপনার কি দুঃসাহস যে আপনি আমার কাছে ব্যক্তিগত চিঠি লিখতে পাবলেন?"

আমার ব্যক্তিত্ব গর্জন করে উঠল। মুচকি হেসে বললাম, "আপনার সৌভাগ্য যে আব্বাসউদ্দীনের কাছ থেকে পাঁচ ছয় পাতা চিঠি পেয়েছেন। যত্ন করে রেখে দেবেন, আপনারও কাজ দেবে, ভবিষ্যতে আপনার বংশধররাও বলতে পারবে আব্বাসউদ্দীনের চিঠি আছে আমাদের কাছে।"

"হোয়াট"— বলে যেন ফেটে পড়লেন। আমি সটান ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চাকুরীর ইস্তফা-নামা লিখে লম্বা লম্বা পা ফেলে সাহেবের ঘরে আবার ঢুকে তাঁর টেবিলের উপর সেখানা রেখে বিরাট মিলিটারী কায়দায় এক সেলাম করে বলে উঠলাম, "দাস-জীবনের এক যুগের ওপর যবনিকা টেনে দিলাম।"

কৃষি দফতরের সদর অফিস তখন ঢাকার তেজগাঁয়ে। আমার ইস্তফার খবর সেখানে পৌঁছে গেছে। ডিরেক্টরের পি, এ, কলকাতায় এসে আমাকে অফিসে খবর দিলেন দেখা করার জন্য। বুঝলাম সাহেবকে খুব করে ধমকে দিয়েছেন। সাহেবের সামনেই আমাকে বললেন, "আপনাকে আবার আসতে বলছি, আপনি ইস্তফা প্রত্যাহার করুন।" আমি বললাম, "হস্তচ্যুত তীর আর ফিরে আসে না।" তিনি বললেন, "যদি হেড এ্যাসিষ্ট্যান্টের পদ দিই?" আমি বললাম, "চাকুরী যদি করতেই হয়".....তারপর সাহেবের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললাম, "ওঁরি মতো একখানি আসনে বসেই যেন করতে পারি।" ওঁরা একটু হাসলেন, হয়তো ভাবলেন কেরানীর দুরাকাঙ্ক্ষা।

রেকর্ডিং এক্সপার্টের পদে পাঁচ বছর চাকুরীর সুযোগে রেকর্ডের মাধ্যমে যে শুধু সরকারের কাজের প্রচারই করলাম তা নয়। দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে বহু রেকর্ড করেছি। কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, কলেরা-বসন্ত, রেডক্রশের, সমাজ-সেবা, দামোদর খালের উপকারিতা, কচুরিপানা ধ্বংসের অভিযান, গো-মড়ক প্রতিবিধান, হাঁস-মুরগীর অসুখের প্রতিবিধান, দেনদার মহাজনের জারী, হিন্দু-মুসলিমের মিলন, ব্যাপক শিক্ষার প্রসারতা ইত্যাদি বিভিন্ন দেশগঠনমূলক বিষয়ে বহু গান ও নাটক এসময় আমি রেকর্ড করেছি। সুবিধা ছিল রেকর্ডের বিষয়বস্তু নির্বাচনে আমি যা স্থির করতাম আলতাফ হোসেন সাহেব কোনদিনও তাতে প্রতিবাদ করতেন না। বরং নিছক সরকারের কাজের প্রচারের চাইতে দেশের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি বলে তিনি খুশীই হতেন।

এই সমস্ত রেকর্ড বিনা পয়সায় ন্যাশনাল ইউনিটে পাঠিয়ে দেওয়া হত। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাছেও দেওয়া হত। জেলা প্রচার দফতরের অফিসাররা বড় বড় মেলা প্রদর্শনী এবং জনসমাগমে এই সমস্ত রেকর্ড পিক-আপের সাহায্যে বাজিয়ে শোনাতেন। গানের ভিতর দিয়ে, ছোটখাটো নাটকের মত করে লেখা এইসব কথোপকথনের ভিতর দিয়ে গ্রামবাসীরা অনেক কিছু শিখতে পারতেন।

এইসব রেকর্ড করার সময় সাহায্য পেয়েছি যাঁদের তাঁদের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি—চিত্ত রায়, শৈলেন রায়, সাঈদ সিদ্দিকী, আবদুল করিম, বিপিন গুপ্ত, কালোবরণ দাস, কমল দাশগুপ্ত, টোপা, বিমলেন্দু কয়াল, জীতেন মৈত্র, রাজাবাবু, নীলিমা সান্ন্যাল, নাজির আহ্‌মেদ, প্রভা দেবী, ঝর্ণা দেবী এবং আরও অনেকে যাঁদের নাম আজ ভুলে গেছি। ভুলে গেছি বহু রেকর্ডের বিষয়বস্তুও।

ঢাকায় লাগল হিন্দু-মুসলমানে দাংগা। এই দাংগার কথা এর আগে জীবনে শুনি নি, কল্পনাও করতে পারিনি কখনো কি করে মানুষ মানুষকে বিনা কারণে মারতে পারে। কাজিদাকে বললাম, "গান লিখে দিন এই হানাহানির বিরুদ্ধে।" তাঁর লেখা গান আমি ও মৃণালকান্তি ঘোষ দ্বৈতকণ্ঠে রেকর্ড করলাম—

হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই
আর—
ভারতের দুই নয়নতারা হিন্দু মুসলমান।

প্রচার দফতরের রেকর্ডেও আমি গাইলাম-

ও ভাই হিন্দু মুসলমান
ভুলপথে চলি দোঁহারে দু'জনে কোরো
নাকো অপমান।।

অপর দিকে কাজিদা হিন্দু-মুসলমানের দাংগার বিরুদ্ধে একটা ডায়ালগ লিখে দিলেন—সাঈদ সিদ্দিকী, বিপিন গুপ্ত এঁদের দু'জনকে দিয়ে সেটা রেকর্ড করালাম।

।। সভাসমিতির বিচিত্র অভিজ্ঞতা ।।

মিঃ পুলিনবিহারী মল্লিক তখন প্রচার-সচিব। দিনাজপুরে রাইপুর নামে এক জায়গায় সেই মন্ত্রীর সাথে গিয়েছি টুরে—সভা বেশ জমকালো। উদ্বোধনী সংগীত গাইলাম। 'বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে।' তারপর উঠলেন মন্ত্রীমহোদয় বক্তৃতা করতে। তাঁর বক্তৃতায় লোকে অধৈর্য হয়ে উঠল, সভায় উঠল অস্ফুট গুঞ্জন। গণ্ডগোল থামাবার সবরকম

প্রক্রিয়াই হল ব্যর্থ। অগত্যা তিনি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আমায় আপ্যায়িত করে বলে উঠলেন, "একখানা গান ধরুন।" হারমোনিয়ামের শব্দ মাইকের মাধ্যমে ঝনঝন করে উঠল। যাদুমন্ত্রে সভাস্থল হল স্তব্ধ। গাইলাম, "তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর। ঐ নতুনের কেতন ওড়ে আসছে ভয়ঙ্কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর।"

সভা নীরব কাজেই গানের শেষে আবার মন্ত্রীপ্রবর উঠলেন তাঁর প্রচারসুলভ বক্তৃতা দিতে, কিন্তু আবার সেই গুঞ্জন। অগত্যা সভাভংগ করতেই হল। সন্ধ্যার পর থিয়েটার হলে গানবাজনার আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় শিল্পীদের গান হল, অতঃপর আমাকে গাইবার জন্য অনুরোধ করলেন তাঁরা, আমি ষ্টেজে উঠেই প্রথমে বললাম, "এ জায়গার নাম রাইপুর হয়েছে কেন? আমার মনে হয় কোন দূর অতীতে কৃষ্ণবিরহিনী উন্মাদিনী রাই এই রাইপুরের পথ দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আনমনা উদাসিনী হয়ে যমুনা জলকল্লোল-কুতোহলী কৃষ্ণের সন্ধানে, তাই এর নাম হয়েছে রাইপুরা।" এই বলেই গান ধরেছিলাম—

'শোন ললিতে ও বিশাখে
মন দুখ কই তোমাকে
শোন্ শোন্ শোন্'।।

সামনেই উপবিষ্ট মন্ত্রীপ্রবর। আমার গানের সময় তিনি পার্শ্ববর্তী এক ভদ্রলোকের সাথে ফিস ফিস করে কি যেন কথা বলছিলেন। গানের সময় কথা বললে আমি কিছুতেই বরদাশ্‌ত করতে পারি না। গানের মাঝখানে হারমোনিয়াম থামিয়ে বলে উঠেছিলাম, "যাঁদের কথা বলা দরকার কথা শেষ করে নিন, তারপর গান ধরব।" বলাই বাহুল্য মন্ত্রীপ্রবরের মুখখানা একথায় এতটুকু হয়ে গেল।

পরের দিন আর এক জায়গায় সভার শেষে ট্রেনে আমাদের বিদায় দেবার প্রাক্কালে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তারই খেসারাৎ দিতে হয়েছিল কলকাতা ফিরে গিয়ে। কিভাবে তাই বলছি।

সভায় প্রায় পাঁচ ছ'হাজার লোক ষ্টেশনে এসেছে মন্ত্রীকে বিদায় দিতে। কিন্তু মন্ত্রীর গাড়ীর সামনে তো পুলিশ প্রহরা। তিনি স্থানীয় ডি, এম-এস পি, এঁদের সাথেই কথা বলছেন আর আমার রেল-কামরার সামনে সেই বিরাট জনতা। উৎসুক জনতার সবাই আমার কাছে এসে সামনা থেকে দেখার জন্য ভীড় করেছে। মন্ত্রীপ্রবরের চোখে এ দৃশ্য প্রীতিপদ মনে হচ্ছিল না নিশ্চয়ই। তাই কলকাতা পৌছেই তিনি তলব করেছেন, "আব্বাসউদ্দীন সভায় উদ্দীপনাপূর্ণ রাষ্ট্রবিরোধী ধ্বংসাত্মক গান কেন গেয়েছে তার কারণ দেখাতে হবে।" আলতাফ হোসেন সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, "কি ব্যাপার? মন্ত্রী এই নোট দিয়েছেন, কি বলবার আছে আপনার? কি গান গেয়েছিলেন?"

এই ব্যাপারের দিন পনের আগে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে 'বাজান জল যাই চল' গানখানা শুনে আলতাফ সাহেবই আবার গাইবার জন্য 'এনকোর' বলেছিলেন। বললাম,

"আপনি সেদিন যে গান শুনে দু'বার গাইবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন সেই 'বাজান চল যাই' গেয়েছি এই কি ধ্বংসাত্মক গান? আসলে ব্যাপার হল মানুষ চেয়েছিল আমার গান, তাঁর বক্তৃতা নয়। তারপর তিনি ষ্টেশনে অবস্থান করছিলেন পুলিশ বেষ্টিত হয়ে আর বিপুল জনতা আমার কামরার সামনে। কাজেই.......।"

আমার সামনেই মন্ত্রীর নোটখানা ছিঁড়ে ফেলে হাসতে হাসতে বললেন, "যান আপনি, সব বুঝেছি।"

ফজলুল হক মন্ত্রীসভা পতনের পূর্বমুহূর্তে ভৈরবে খুব বড় এক রাজনৈতিক সভার আয়োজন হয়। আমিও সে সভায় আহূত হয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছে হ্যাণ্ডবিলে দেখি সারা ভারতের মুসলিম নেতাদের নাম। কায়েদে আজম (তখন মিঃ জিন্না) থেকে শুরু করে ফজলুল হক, নাজিমউদ্দীন, সোহ্‌রাওয়ার্দী, নজরুল ইসলাম আর এই অধমের নাম। প্রায় আধ মাইল জায়গা ঘিরে বিরাট প্যাণ্ডেল। সভা আরম্ভ হল। নাজিমউদ্দীন সাহেব সভাপতির আসন অলংকৃত করে কোরআন-পাঠের নির্দেশ দিলেন। তারপর আমার উদ্বোধনী-সংগীত হল। এরপর সভার চতুর্দিক থেকে প্রশ্ন হতে লাগল— "শেরে বাংলা কোথায়?" বেগতিক দেখে সভাপতি আমাকে আবার অনুরোধ করলেন, "আর একখানা গান হোক।" আমি বললাম, "এ তো আর গানের জলসা নয়। আপনারা আগে সভার শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন।" কে কার কথা শোনে? সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব আমার কাছে এসে দুষ্টুমির হাসি হেসে বললেন, "হোয়েছে হোয়েছে, আর কথা বোলে কাজ নেই। তুমি গান না ধোরলে সোব মাটী হয়ে যাবে।" কি করি, গান ধরলাম—"ওঠরে চাষী জগৎবাসী ধর কষে লাঙল।" সভা হল নিস্তব্ধ। নাজিমউদ্দীন সাহেব তাঁর লিখিত ভাষণ নিয়ে গিয়েছিলেন ছাপিয়ে, ইংরাজী ও বাংলায়। ভাষণ তো নয়, মহাভারত। বললাম তাঁর কানে কানে, "মান যদি রাখতে চান তবে ইংরাজী ভাষণের প্রথম পৃষ্ঠা......আর একদম সেই আপনার গিয়ে শেষ পৃষ্ঠা পড়ুন। তারপর বাংলাটা আমিই পড়ব'খন।" মহাখুশী হয়ে তিনি মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। সত্যি সত্যি ভদ্রলোক তাঁর বিরাট ইংরাজী ভাষণের প্রথম আর শেষ পৃষ্ঠা পড়ে আমাকে অনুরোধ জানালেন তাঁর বাংলা ভাষণটি পড়বার জন্য। মহাভারতের এপিঠ আর ওপিঠ, কাজেই আমিও যথাসম্ভব এক সাথে দু'তিন পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে শেষ করলাম পড়াটা।

সভাশেষে তিনি আমাকে বললেন, "ইজ্জৎ বাঁচিয়েছেন আপনি।"

যশোহরে এক রাজনৈতিক সভায় প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব ও মন্ত্রী সোহ্‌রাওয় সাথে গিয়েছি। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব স্থানীয় এম, এল, এদের সাথে ফজলুল হকের কার্যকলাপের বেশ সূক্ষ্মভাবে সমালোচনা করে তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তাদের মুখের দিকে আড়চোখে তাকান। হঠাৎ কাঁধে দুষ্ট সরস্বতী ভর করল। সোহ্‌রাওয়ার্দীর দিকে চেয়ে হেসে হেসে বললাম, "জানেন আমি হাত দেখতে পারি। দেখি আপনার হাতটা।" তিনি কৌতূহলী হয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাত দেখে আমি কানে কানে বললাম, "ছয় মাসের মধ্যেই আপনি বাংলার প্রধানমন্ত্রী হবেন।" চোখেমুখে তাঁর হাসি ফুটে উঠল, বেশ লক্ষ্য করলাম। আমার পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন, "ফাজলামি হচ্ছে?"

একদিন তিনি সত্যি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। খবরটা শুনে সক্কালবেলা একটা গোলাপ ফুল নিয়ে তাঁর বাসায় গেলাম। গিয়ে দেখি যারা ঝাউতলা রোডে এতদিন ভীড় পাকাত তারাই ওখানে ফুলের মালা, তোড়া নিয়ে হাজির। বহুক্ষণ পরে তিনি বেরিয়ে এলেন, ফুলটা তাঁব হাতে দিলাম। তিনি হেসে বললেন, "জানেন, আব্বাস গানেওয়ালাই না আছে লেকিন গণকভি আছে। আমার হাত গুণে বলেছিল ছ'মাসের ভেতরেই আমি বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোবে।" সবাই এর ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

কলকাতা থেকে কুমিল্লার দেবীদ্বারে এসেছি এক বিরাট সভায়। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব সভাপতি। আমি তাঁর আসার আগেই দেবীদ্বার পৌঁছোবার আগে পথে এক ডাকবাংলায় উঠে বিশ্রাম করছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছি, এমন সময় লোকজনের চীৎকারে অর্থাৎ 'সোহ্‌রাওয়ার্দী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে ঘুম ভেঙে গেল। শুয়েই আছি। বুঝতে পারলাম তিনি সদলবলে ডাকবাংলার বারান্দায় এসে বসলেন। এসেই নাকি তিনি আমার খোঁজ করেছিলেন। তারপর আমাকে শায়িত অবস্থায় দেখে জোরে জোরে বলছেন, "আরে শুনছি নাকি এখানে বাংলাদেশের বুলবুল এসেছে। লেকিন আমরা তো তার কোনো সাড়া পাচ্ছে না।" এটা শুনতেই পেলাম, আর শুয়ে থাকা চলে না। সামনে গিয়ে অভিবাদন করলাম। হঠাৎ মেঘ করে এল সুন্দর বৃষ্টি। প্রধানমন্ত্রী মহোদয় বিজ্ঞের মত বলে উঠলেন, "আচ্ছা এমন সময় কী গান গাইতে হয়?" গানের নামে সবাই সমান উদ্যোগী। হারমোনিয়ামটা এনে টেবিলের উপর বাখা হল। আমি গাইলাম—

স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা
এস মালবিকা
অর্জুন মঞ্জরী কর্ণে
গলে নীপ-মালিকা।।

গান শেষ হল। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব বলে উঠলেন, "কি গান গাইলেন, হামি তো একটা কথাও বুঝতে পারলাম না।"

আমি বললাম, "বাংলার প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে একথা আশা করতে পারি নি।" লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে উঠলেন, "তুমি উচিৎ কথা বলতে ভয় কর না, সাবাস।"

আর একবার এসেছি চুয়াডাঙ্গার এক প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে। ডাঃ মালিকের বাসায় দুপুরে খানাপিনার বিরাট আয়োজন। শুক্রবার। তাঁর বাড়ীর সামনেই মসজিদ। জুম্মার নামাজের আজান পড়ল। নামাজ পড়তে গেলাম! নামাজ শেষে এসে দেখলাম খাওয়া শেষ। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব রোদে বসে খাওয়ার শেষে গল্প করছেন। আমাকে দেখেই বললেন, "কি কোথায় ছিলে এতোক্ষণ? খাওয়ার টেবিলে তো তোমার দেখা পাওয়া গেল না!" আমি বললাম, "অনেক ধন্যবাদ আমার খোঁজ নিয়েছেন বলে, কিন্তু আমিও তো আপনাকে মসজিদে খুঁজে পেলাম না!" হেসে বললেন, "এই নিয়ে ক'বার আমাকে তুমি এমন প্রকাশ্যে জব্দ করলে বল তো?"

জনাব তমিজউদ্দীন খাঁ অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী। কলকাতা থেকে যশোর রোডে যেতে অমৃতবাজার নামে এক জায়গায় আমাকেও সেই মন্ত্রীর সভায় ডেকেছে ছাত্ররা। খুব বড় সভা। তাঁর গলায় ফুলের মালা পূর্ণ করে দিয়ে তাঁর নামে পাঁচ ছ'খানা অভিনন্দন দেওয়া হল, সভায় তাঁর নামে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। একটি যুবক, মনে পড়ে আনোয়ার হোসেন, সভায় দাঁড়িয়ে বললেন, "মন্ত্রীর গলায় এত মালা দেওয়া হল, আর বাংলার শিল্পী যাঁর নামে সভার শতকরা ৯৯ জন লোক এসেছে তাঁকে একখানা অভিনন্দন দেওয়া তো দূরের কথা একখানা ফুলের মালাও তাঁকে দেওযা হল না।" সভায় উঠল বেশ একটা অস্ফুট গুঞ্জন। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, "দেশে মন্ত্রী পূজার যুগ এসেছে কিনা বলতে চাই না। তবে একটা কথা আমি বলতে চাই। চাকুরীর মোহে সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় যে কোন নামেই অভিহিত করতে চান না কেন, মন্ত্রীর গলায় মালা দেওয়া একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবে আমি মালা চাই না। আমি জানি বাংলার ঘরে ঘরে আবালবৃদ্ধবণিতার মনের কোণে স্নেহের ঠাঁই আমি পেয়েছি। সেইটেই আমার সবচেয়ে বড় আত্মতৃপ্তি।" তমিজউদ্দীন সাহেব তাঁর গলা থেকে সব মালা খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "শিল্পীরা স্বাপ্নিক, শিল্পী এঁকে যায় শিল্পী গেয়ে যায় দুঃস্থ মানবতার গান, শিল্পী জাগিয়ে তোলে ঘুমন্ত মানবতাকে।"

সেইদিন থেকে তমিজউদ্দীন খাঁ সাহেবকে শ্রদ্ধা করে আসছি।

•

পাবনা—শাহজাদপুর। প্রাইমারী শিক্ষক সম্মেলনে আমাকে কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। মন্ত্রী তমিজউদ্দীন খাঁ সভাপতি। বক্তা সৈয়দ আসাদ-উদ্-দৌলা শিরাজী, গায়ক আমি। প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার লোকে সমস্ত মাঠটা ভরে গেছে। মন্ত্রীর জন্য বিশেষ জায়গায় থাকার বন্দোবস্ত। শিরাজী এবং আমার জন্য স্কুলঘরের একটা রুমে ভাঙা চারখানা বেঞ্চ দিয়ে একখানা বিছানা করে দেয়া হয়েছে। মনটা বেশ বিক্ষুব্ধ। তা ছাড়া মনের অবস্থাও খারাপ ছিল, কারণ বাড়ী থেকে আমার মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়েছি। তবুও আসতে হয়েছে এখানে কারণ এদের কথা দিয়েছি। একবার কোথাও কথা দিলে আমি কথার খেলাপ করিনি। যাক, সভায় তমিজউদ্দীন সাহেবের বক্তৃতার পর শিরাজী আমাকে বললে, "এমন একটা গান ধর যাতে আমি খুব উত্তেজিত হতে পারি।" গান ধরলাম—

কারার ঐ লৌহকপাট ....

এরপর শিরাজীর আগুনের মত বক্তৃতা ছিল। তখনকার দিনে শিরাজীর মতো বক্তা সত্যি দুর্লভ ছিল। অনেকের বক্তৃতা শুনেছি— কোনটাতে মৌলিকতা নেই, একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি করে যেত অনেকে বিভিন্ন সভায়, কিন্তু শিরাজীর সাথে বাংলাদেশে প্রায় শ'খানেকেরও বেশী সভায় যোগদান করে আমি কোন সভাতেই এক বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি শুনি নি।

প্রায় একঘণ্টা ধরে শিরাজীর বক্তৃতা আর পরপর আমার পাঁচ ছ'খানা গানের পর যখন সভা ভংগ হল তখন স্কুলঘরে সেই ভাঙা টেবিলের বিছানায় ফিরে এলাম। রাতে খান বাহাদুর মোয়াজ্জেম আলী সাহেবের বাসায় খাবার টেবিলে তমিজউদ্দীন সাহেব শিরাজী আর আমাকে দেখতে না পেয়ে প্রশ্ন তুললেন, "ওঁরা দু'জন কোথায়? ওঁরা না এলে কিছুতেই খাব না।" সামনে পোলাও, কোরমা, জরদা অথচ তিনি হাত গুটিয়ে বসে আছেন। কর্মকর্তাদেব তখন হুঁশ হয়েছে। চারধারে বোধহয় ছুটোছুটি। কলকাতা থেকে যিনি আমাকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি স্বয়ং এসে আমাদের ঘরে যখন ঢুকলেন তখন আমরা বারোয়ারী খানা খেয়ে গুলতানি গল্প করছি। যতরকম ভাবে অনুনয় বিনয় সম্ভব সমস্ত অস্ত্রই তিনি প্রয়োগ করলেন। শিরাজী বলল, "আমরা যেদিন মন্ত্রী হব সেদিন দেখা যাবে।" বহু অনুনয়ের পর যখন বুঝলাম যে বেচারী মন্ত্রী খাবার সামনে রেখে আমাদের জন্যই হাত গুটিয়ে বসে আছেন তখন গেলাম। সত্যি খাবার তাদের হিমশীতল।

কর্মকর্তারা কিন্তু পরের দিন প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিকের একটি পয়সাও দিলেন না। বলেছিলেন, "ভাই, শিক্ষকদের কনফারেন্স টাকা ওঠে নি!" বড় ব্যথিত প্রাণে বাড়ী রওয়ানা হলাম।

আমার মা বোধ হয় আমাকে দেখবার জন্যই বেঁচে ছিলেন। বাড়ী পৌঁছবার চারদিন পরেই মা আমাদের শোকসাগরে ভাসিয়ে দুনিয়া ছেড়ে যলে যান। আমার মায়ের তিরোধানে সারা গ্রামে শোকের ছায়া পড়ে গেল। অমন দয়া, অমন পরোপকার, অমন দানশীলা চিরহাস্যময়ী মা গ্রামের সবারি এত আপন ছিলেন যে তাঁর শোক ভুলতে পেরেছে এমন লোক এখনো দেখিনি।

টাংগাইল ভুয়াপুর গ্রাম। প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁর স্থাপিত কলেজে আমাকে আমন্ত্রণ করেছে ছাত্রেরা। সে জায়গায় পা দিয়েই ভদ্রলোকের উপর অসীম শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল। নিজে প্রতিষ্ঠা করেছেন সে গ্রামে প্রাইমারী স্কুল, তার পাশেই হাই স্কুল, তার পাশেই কলেজ। জানতাম তিনি শিক্ষাব্রতী, কিন্তু এতবড় কর্মী তা জানতাম না। নিজের একক প্রচেষ্টায় একটি অপগণ্ড গ্রামে প্রাইমারী স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন—এটা সত্যি শুধু প্রশংসনীয় নয়, তাঁর এই প্রচেষ্টার জন্য গভীর ভক্তির উদ্রেক করে মনে।

সেই কলেজে সন্ধ্যার পর হবে আমার জলসা। সকাল দশটা থেকেই লক্ষ্য করছি দলে দলে লোক আসছে। প্রথমে মনে করেছিলাম আজ বোধ হয় হাটবার, তাই লোক সমাগম হচ্ছে। পরে জানতে পারলাম সন্ধ্যার সময় আমার গান হবে সেই জন্যই লোক জমায়েত হচ্ছে। লোকজন ক্রমশঃ আমার বিশ্রাম করার ঘরটাতে আমাকে দেখার জন্য ভীড় করতে শুরু করল।

এর মধ্যে একটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল যে আব্বাসউদ্দীনের দাড়ি নেই, এ লোকের গান কি শুনবে? অর্থাৎ যারা এতদিন ইসলামী গান শুনে আসছিল আমার রেকর্ডের মাধ্যমে তাদের মনে তো সাধারণতঃ আমার সম্বন্ধে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। আসরের সময় মাইক সহযোগে প্রচার করে দিলাম যে যারা মগরেবের নামাজ পড়বে না, আব্বাসউদ্দীন তাদের গান শোনাবে না। ফলে মগরেবের সময় বিরাট আকারে জামাতে নামাজ পড়া হল।

সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে শুধু নরমুণ্ড ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। প্রায় লক্ষ লোকের সমাবেশ। আমার একা সভায় এতবড় জনসমাগম জীবনে আর দেখি নি। পরম করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় চোখ পুরে পানি এল। গান গাইব কি, কণ্ঠ রুদ্ধ ! মনে মনে তাঁর উদ্দেশ্যে কোটী শুকুর গুজার করে গান ধরলাম। প্রথমে গাইলাম, "স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা।" গানটা শেষ করে উৎসুক জনতাকে লক্ষ্য করে বললাম, "এ গান কে কে বুঝতে পারেন নাই হাত তুলুন আমি খুব খুশী হব। এ গানের কথাগুলো খুব শক্ত, বোঝা কঠিন। তা দেখুন, উপরের দিকে থুথু ফেললে নিজের গায়েই পড়ে। আপনারাও মুসলমান আমিও মুসলমান, আপনারাও মূর্খ আমিও মূর্খ।" এই বলে সহজ সরল ভাটিয়ালী গান ধরলাম, মাঝে মাঝে ইসলামী গান গাইলাম। তারপর বললাম বর্তমান মুসলমানের শোচনীয় অধঃপতনের কথা। শিক্ষার অভাবে আমরা কোন উন্নত চিন্তা করতে পারি না। তার উপর নিরক্ষর গ্রামবাসীকে ইসলামের নামে এতকাল সস্তা বুলি দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে। ইসলাম মানে নামাজ-রোজা, হজ্ব আর জাকাত এর বাইরে সারা দুনিয়াটাই মুসলমানের দৃষ্টির বাইরে। আমি বললাম, নামাজ-রোজা করতে পয়সা লাগে না, কিন্তু হজ্ব জাকাত দু'টোই অর্থসাপেক্ষ। কাজেই পুরা মুসলমানে দাখিল হতে হলে চাই টাকা। টাকা রোজগার করতে গেলে মূর্খ হয়ে থাকলে চলবে না, সুতরাং চাই শিক্ষা।

সভায় সেদিন যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল, তা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

মিঃ ওয়াছেক তখন ছাত্রনেতা। রংপুরে ছাত্রদের নিয়ে রাজনৈতিক এক সভার আয়োজন করেছেন তিনি। সভা ভালোভাবে জমাবার জন্য কলকাতা থেকে গিরীণ চক্রবর্তী, আবদুল করীম (বালি), তবলা-বাজিয়ে বজলুল করীম এবং আমাকে নিয়ে আসার জন্য তিনি বন্দোবস্ত করলেন। যথাসময়ে রংপুর গেলাম। সভা কোথায়, টাউন হলে বন্দোবস্ত করলেন তিনি সংগীত জলসার। সন্ধ্যার পরে হলে গিয়ে দেখি তিলধারণের স্থান নেই, বাইরে অগণিত জনতা। এই হট্টগোলে গান তো দূরের কথা মান আর প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসতে পারলেই রক্ষে। এই ধরণের বহু অভিজ্ঞতা আমার ছিল। জলসার উদ্যোক্তারা সবাই পালিয়েছে। আর খানিকক্ষণ পরেই আরম্ভ হবে সেখানে মারামারি, পরিষ্কার বুঝতে পারছি। আমি বললাম, "মাইক ঠিক করে দিন।" অসীম সাহসে ভর করে ষ্টেজে দাঁড়ালাম। বললাম, "জানি না কে বা কারা এ জলসার অধিনায়ক! টিকিট করে ভিতরে যাঁরা বসে আছেন তাঁরাও গান শুনতে চান, বাইরে যাঁরা টিকিট করে ঘরে আর জায়গা নেই বলে আসতে পারছেন না তাঁরাও গান শুনতে চান। এখন উদ্দেশ্য সবারি গান শোনা। আপনারা হট্টগোল করলে সুরশিল্পী বাধ্য হবেন চলে যেতে। টিকিট যাঁরা বিক্রী করেছেন তাঁদের টিকিটিও আর দেখতে পারছেন না, অতএব এখানে আমার একটা কথা যদি আপনাদের মনঃপূত হয় তবে সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। আপনাদের আমরা গান শোনাতেই চাই, তবে বাইরে যাঁরা টিকিট করে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদেরও হতাশ করতে চাই না। আপনাদের একটু কষ্ট হচ্ছে, আরাম কেদারা ছেড়ে বাইরে সবুজ ঘাসে গিয়ে বসতে হবে, তারপর আজ গান শুনে টিকিটের পয়সা ফেরৎ নেবেন কাল সকালে।"

সবাই মহাখুশী। বাইবে জ্যোৎস্না-প্লাবিত মাঠে গিরীণের উদাত্তকণ্ঠ, বালির ঠুংরী, গজল—গানে গানে সবাইকে মাতিয়ে তোলা হল। গানশেষেও নেতা উপনেতাদের আর দেখা পাওয়া গেল না। পারিশ্রমিক তো দূরের কথা বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে টাকা কর্জ করে কলকাতায় ফিরে আসা গেল পরদিন।

জয়দেবপুর ষ্টেশন থেকে কয়েক মাইল দূরে খঞ্জনপুর গ্রাম। সেখানে অবিভক্ত বাংলার একটি খাসমহল অফিস ছিল। ম্যানেজার হিন্দু ভদ্রলোক। সেখানে প্রতি বৎসর যাত্রা, কীর্তন ইত্যাদিতে বহু অর্থ ব্যয় হয় এবং সেই উপলক্ষ্যে খাসমহল কাছারী প্রাংগনে ছোটখাট মেলা বসে। কাছারীর কতিপয় উৎসাহী মুসলিম কর্মচারীর অনুরোধ এড়াতে না পেরে একবার আমাকে কলকাতা থেকে সেখানে এক জলসায় আমন্ত্রণ করা হয়।

আমি সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গিয়ে পৌঁছুলাম—সাথে কয়েক জন বন্ধুবান্ধব। অগণিত লোক যাত্রাগানের আসরের মত গায়কের আসন ঠিক সভামণ্ডপের মাঝখানে। আমি ম্যানেজারবাবুর সাথে দেখা করতে চাইলাম। এক ঘণ্টা পর তিনি দর্শন দিলেন। কোন উপক্রমণিকা না করেই তিনি বললেন, "আপনিই আব্বাস সাহেব, তা যান গান আরম্ভ করুন গিয়ে।" আমি বললাম, "দেখুন এত বড় জনতা হবে এ যদি আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন তবে মাইকের বন্দোবস্ত করেন নি কেন? যেরকম হট্টগোল হচ্ছে এবং যাত্রার মতো যেভাবে আসব করেছেন তাতে কি চারধারে ঘুরে ফিরে আমাকে গাইতে হবে?" তিনি মেজাজ দেখিয়ে বলে উঠলেন, "গণ্ডগোল হট্টগোল থামানো কি আমার কাজ, সেটা আপনি বুঝুন গিয়ে।"

শিল্পীর মন তখন কী হতে পারে সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারবেন না। যাক কথা দিয়েছি, আসরে গেলাম। জনতাকে উদ্দেশ্য করে হাত ইশারায় বললাম, "আপনারা শান্ত হোন।" খোদার কাছে লাখো শুকুর, প্রায় দশ বারো হাজার লোক একদম শান্তভাব ধারণ করল। আমি প্রথমেই গান ধরলাম, "ও ভাই হিন্দু মুসলমান, ভুলপথে চলি দোঁহারে দুজনে কোরো নাকো অপমান।" আর একখানা গান আরম্ভ করেছি এমন সময় আমার প্রায় আট দশ হাত দূর থেকেই ক'জন যুবক চীৎকার করে উঠল, "কিছু শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না মশাই, জোরে গান জোরে, জোরে।" আবার অন্যদিকে প্রায় একশ' গজ দূর থেকে চীৎকার উঠছে, "পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। আপনারা চীৎকার বন্ধ করুন"। সবাই তখন বলছে "চীৎকার থামান চীৎকার থামান" আর সমানে হট্টগোল। এই হট্টগোলের মাঝখানে এক বন্ধু এসে কানে কানে বললে, "এক্ষুনি সভামণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এসো, বাইরে বিশেষ প্রয়োজন আছে।" আমিও ভাবলাম গণ্ডগোলটা একটু থামুক, সভা শান্ত হলে আসব। বাইরে এলাম। সংগে সংগে আমার বন্ধুটির সাথে একদল তরুণ এসে আমাকে কিভাবে এবং কেন যে কাঁধে করে নিয়ে ছুটতে লাগল বুঝতে পারলাম না। অন্ধকারে প্রায় আধমাইল পথ তারা আমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে ছুটে এসে নামিয়ে দিয়ে বললে, "ভাই আপনার আজ মহা বিপদ। যাক, আপনাকে রক্ষা করতে পেরে আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি।" বললাম, "ব্যাপার কী?" তারা বললে, "এই ম্যানেজার আগাগোড়াই আপনাকে এখানে নিয়ে আসার বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু কী আর করা জনসাধারণ আপনাকে চায়, তাই শেষ পর্যন্ত

মত দিতে হয়েছিল আপনাকে কলকাতা থেকে এখানে আনার জন্য। তার আক্রোশ হল এই যে প্রতি বৎসর এত যাত্রা, ঢপ, কীর্তন, বাইজির নাচ আসে, এত তো জনসমাগম হয় না, কিন্তু কে এই আব্বাস একা একটা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গায়, তার জন্য কেন এত জনসমাগম? ম্যানেজার গোপনে ষড়যন্ত্র করেছে যেমন করেই হোক দাংগাহাংগামা বাঁধিয়ে সভা পণ্ড করবে এবং আপনার প্রাণের ওপরেও........।" আর বেচারীরা বলতে পারল না। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম কণ্ঠ তাদের বাষ্পরুদ্ধ। একে একে সবারি নাম জিজ্ঞেস করলাম। তার ভেতর চার পাঁচটি ছেলে নাম বললে, তারা হিন্দু। ষ্টেশনে এসে সবার সাথে প্রাণভরে আলিংগন করলাম। হিন্দু ছেলে ক'টিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, "তোমরা ভাই এমনি করেই শিল্পীকে বাঁচাবে, যারা জাতধর্মের বহু ঊর্দ্ধে বিচরণ করে।"

১৯৪৬ সাল। রংপুরে রসুলপুর নামে এক গ্রামে শিরাজীর বক্তৃতা হবে আর আমার গান। রংপুর শহর থেকে আমরা বাসে করে সভাস্থলে যাচ্ছি প্রায় কুড়ি জন যাত্রী। রসুলপুর গ্রামে যে জায়গায় সভা হবে তাব পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। নদীর পানি কমে গেছে কিন্তু পাড়টা খুব উঁচু। সামনে বহু লোক দাঁড়িয়ে। মোটর হর্ন দিচ্ছে। গ্রামের লোক হর্ন শুনে কেউ এদিক কেউ ওদিক ছুটোছুটি করছে। তিন চারজন লোককে বাঁচাতে গিয়ে ড্রাইভার ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিয়েছে নদীর দিকে। মোটর আর থামে না, একদম নদীর পাড়ে গিয়েও ছুটে চলেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি মোটর নদীতে পড়ল এবার, হাজার কণ্ঠে লোকের চীৎকার, দেখতে দেখতে কুড়িজন যাত্রীসহ মোটর নদীগর্ভে পড়ে গেল। আমার মনে হল বাসখানা উল্টে পিঠের উপর পাহাড়ের মতো চেপে রয়েছে। তারপর আর কোন জ্ঞান নেই।

আধঘণ্টা পরে যখন সামান্য জ্ঞান হল, চেয়ে দেখি অজস্র জনতার ভীড়। সবারি মুখে হায় হায় শব্দ, আহতদের করুণ চীৎকার। আমার কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে দর দর করে! মাথায় ফেটি বাঁধা। রক্ত পড়া থেমে গেছে, কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা মাথার চাইতেও বুকে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছিল বুকের ভেতর প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে সূঁচ দিয়ে কে যেন হানছে।

বাইরে জনতা তেমনি দাঁড়িয়ে। জ্ঞান তখন পরিপূর্ণ। সাথের লোকদের কথা জিজ্ঞেস করলাম। অবস্থা প্রায় সবারি সমান; কিন্তু কেউ প্রাণ হারায়নি। শুনলাম ত্রিশ মাইল দূরে রংপুর শহরে মোটর আনবার জন্য খবর পাঠানো হযেছে। প্রাথমিক চিকিৎসার সাজসরঞ্জামসহ ডাক্তার আসছে।

রাত দশটা, তখনো লোকজন থৈ থৈ করছে। শিরাজীও খুব সাংঘাতিক চোট পেয়েছে। তা সত্ত্বেও সে বললে, "মাইকটা ঠিক করে দিন, আমি লোকজনকে কিছু বলি, নইলে তো কেউ বাড়ী যাবে না।" মাইক লাগানো হল। কি আশ্চর্য ব্যাপার সেই অবস্থায় ক্ষত-যন্ত্রণা উপেক্ষা করে সে আধঘণ্টা বক্তৃতা দিল, আবেদন জানাল লোকজন যেন বাড়ী ফিরে যায়। বক্তৃতার পরেই আবার সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

মোটর এল। অতরাতে আর শহরে যাওয়া হল না। ডাক্তার এসেছেন। সবাইকে ব্যাণ্ডেজ, ইনজেকশন দিয়ে রাতটা রসুলপুরেই রাখা হল। পরদিন মোটরে রংপুর যাবার সময় কি যন্ত্রণাই পেয়েছি বুকের ভেতর। খোদা যে কিভাবে সেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত

থেকে বাঁচিয়েছিলেন আজো সে কথা ভাবতে দু'চোখ পানিতে ভরে আসে—মাথা আপনি নুইয়ে আসে তাঁর অনন্ত করুণার উদ্দেশ্যে।

আর একবার কলকাতা যাচ্ছি কুচবিহার থেকে দার্জিলিং মেইলে। তখন যুদ্ধের সময়। আত্রাই পুলের উপর সমস্ত ট্রেনখানায় প্রচণ্ড এক শব্দ হল এবং সে শব্দে বিরাট এক ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুমের মানুষটি একদম উঠে বসে পড়লাম। সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় আমরা চারজন যাত্রী। নীচে তাকিয়ে দেখি এক নদীর উপর আমরা। সামনে কিছুই দেখা যায় না, শুধু অসংখ্য কণ্ঠের কাতরানি, গেলাম, বাঁচাও, বাঁচাও। ঘড়িতে দেখি রাত তিনটা। অন্ধকারে এখানে ওখানে টর্চ জ্বলে উঠতে লাগল, দুটো-চারটে করে লণ্ঠনের আলো দেখা গেল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কি। ভোর না হওয়া অবধি এরকমই কাটল। সামান্য একটু ভোরের আলো ফুটে উঠতেই নীচে তাকিয়ে দেখি নদীর বুকে ভেসে চলেছে কতকগুলো নৌকা। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল পুলখানার উপর এত বড় ভারী ট্রেনখানা দাঁড়িয়ে আছে, না জানি কখন পুলখানা ভেঙে পড়ে। এক একটি সেকেণ্ড মৃত্যুর নব নব পরোয়ানা নিয়ে আসছিল। এক মাড়োয়ারী ছিল আমাদের রুমে, সে প্রায়ই অজ্ঞান। এক মেমসাহেব ও জেসাস, ও লর্ড বলে অবিরাম চীৎকার করছে, আমি মনে মনে ডাকছিলাম সর্ববিপদহারী আনন্দ করুণাময় খোদাকে।

বেলা হল। ট্রেনখানা পিছন দিকে চলতে আরম্ভ করল। আমরা নামলাম। এ পারেও বহু লোক এসে ভীড় করেছে। জানতে পারলাম দার্জিলিং মেইল আর নর্থবেংগল এক্সপ্রেস কলিশন হয়েছে। সামনের বহু বগী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। কত লোক যে মরেছে কেউ জানতে পারছে না, কারণ মিলিটারীতে সমস্ত জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। বুঝলাম অত রাতে অত টর্চ কারা জ্বালিয়েছিল। যুদ্ধের বাজার। পুল পাহারা দেবার জন্য তখন বড় বড় পুলে মিলিটারী মোতায়েন থাকত।

নৌকা করে ওপারে গেলাম। চূর্ণবিচূর্ণ ধ্বংসবিধ্বস্ত ট্রেনের দিকে উঁকি মেরে দেখলাম তাজা রক্তে রঞ্জিত। মৃতদেহ দেখলাম না। না জানি এরি মধ্যে কি করে কোথায় সরিয়ে ফেলেছে। প্রায় একটার সময় ওপারে ট্রেন এল। এর মধ্যে আত্রেয়ী বাজার থেকে বাজার উজাড় করে বড় বড় দোকানদাররা সন্দেশ, রসগোল্লা, চিড়া, মুড়ি, চা এনে যাত্রীদের খাবার বন্দোবস্ত করেছে। কত সাধাসাধি করেও দোকানদার বা ওখানকার লোকদের কাউকে পয়সা দিতে পারা যায় নি। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে যারা বেঁচে গিয়েছি, মানুষ বলে ভাই বলে তাদের খাওয়াতে পেরেছে বলে আত্রেয়ীর অধিবাসীরা সেদিন যেন কত তৃপ্ত। আর যারা ঘুমের জোরেই অজানিতে করল অপঘাত মৃত্যুবরণ তাদের উদ্দেশ্যে অনেকেই ফেলেছিলেন চোখের পানি। মানুষের জন্য মানুষের সহানুভূতি আত্রেয়ীবাসীর প্রাণে সেদিন যেভাব নিয়ে দেখা দিয়েছিল আজ পর্যন্ত ভুলতে পারিনি তা।

।। পাকিস্তান ও তারপর ।।

রেকর্ডিং এক্সপার্টের চাকুরী চালিয়ে গেলাম পাঁচ বছর। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল,

খোলা হল সং পাবলিসিটি অর্গানাইজেশন। সুরেশবাবু ও জসিম হলেন যথাক্রমে সং পাবলিসিটি অর্গানাইজার এ এ্যাডিশনাল সং পাবলিসিটি অর্গানাইজার। দু'বছর পরে সুরেশবাবু জজ হলেন। জসিম তখন হল সংপাবলিসিটি অর্গানাইজার। যুদ্ধ তখন থেমে গেছে। অতিরিক্ত সং পাবলিসিটি অর্গানাইজার-এর পদটা খালি হয়েছে। আলতাফ হোসেন সাহেবকে বললাম পদটা আমাকে দিতে। তিনি বললেন, "এসব পোষ্ট তো তুলে ফেলে দেওয়া হবে দু'তিন মাসের মধ্যেই। না আর হয় না।" আমি বললাম, "এখনো দু'তিন মাস আছে তো! দু'এক দিনের জন্য হলেও গেজেটেড পদ যদি পাই.........।" আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বোধ হয় আমার চাকুরী জীবনের ব্যথাটা কোথায় ধরতে পারলেন। সেই মুহূর্তে নথি তলব করে অর্ডার দিলেন। মনে পড়ে গেল এ্যাণ্ডারসন হাউসে বসে ডিরেক্টরের পি. এ'র সামনে বলেছিলাম, "চাকুরী যদি করি ঐ সাহেবের মত।" খোদা আমার অভিমানরুদ্ধ প্রার্থনা মন্‌যুর করেছিলেন।

বৃহত্তর জীবনের স্বাদ এল। সারা বাংলার গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে টুর করবার অবাধ স্বাধীনতা। গেয়ে গেয়ে ফিরতে লাগলাম বাংলার শত সমস্যার সমাধানের বাণী।

যুদ্ধের দিনগুলিতে সারা কলকাতা রাতে ব্ল্যাক-আউট, ব্যাফ্‌ল্‌ ওয়ালে পথ চলতে হোঁচট খেতে হয়। এক একদিন সাইরেন বেজে ওঠে আর আমাদের গানের আসরে নেমে আসে কল্পিত বোমার শব্দ। হারমোনিয়াম, বাঁয়া-তবলা ফেলে আশ্রয় নিই আশ্রয়স্থলে। মৃত্যুর যবনিকা নেমে আসে যেন ধীরে ধীরে। কারো মুখে কথা নেই, ইষ্টনাম সবারি মুখে মুখে। কেউ কেউ সে নামও ভুলে যায়। কেউ বলে ওঠে, "ভাই, সুরা ইয়াসিনের প্রথম লাইনটা কি?" মহাদুঃখেও হাসি পায়। সাইরেন শেষ হয়, আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে পড়ি শুকনো মুখে। কারো মুখে তখন হাসি নেই। যাক্‌, এ যাত্রা বাঁচা গেল। পরের দিন খবরের কাগজে দেখি রেংগুনে বোমা পড়েছে। মনে করি হয়ত কলকাতার উপর দিয়ে বোমারু প্লেনখানা চিলের মত কাল একবার উড়ে গিয়েছিল, নইলে সাইরেন পড়বে কেন?

একটা কথা ইদানীং কানে এল। কালোবাজারে জিনিষ কিনতে গিয়ে দেখি এটা নাই ওটা নাই, যেটা আছে সেটাও অগ্নিমূল্য। দোকানদার বলে, "মশাই নিতে হলে এখুনি কিনে ফেলুন, কাল আর পাবেন না।" ব্যাফ্‌ল্‌ ওয়ালের আশে পাশে কঙ্কালসার নরনারী এখানে ওখানে নজরে পড়তে লাগল। তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে। শুনতে পেলাম দেশে ধান চাউল নেই। মহাদুর্ভিক্ষ। রাতে 'ফেন দাও ফেন দাও' বলে সেইসব কঙ্কালসার নরনারীর কী চীৎকার! পেটে আর ভাত যায় না। একবেলা খাই আর একবেলার ভাত পথের কাঙালীকে দিই। চোখের সামনে ইতস্ততঃ না-খেয়ে-খেয়ে শুকিয়ে-মরা লাশ নজরে পড়তে লাগল। তারপর এ দৃশ্য দেখতে পেলাম যত্রতত্র। পুলিশের তৎপরতা বাড়ল। গাড়ীভর্তি করে কঙ্কালগুলোকে শহর থেকে কোথায় চালান দেওয়া শুরু করলে—কলকাতায় আর ভিখারী বা দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত কঙ্কালসার মূর্তি চোখে পড়ে না।

এর পর ক্রমান্বয়ে ঘটে গেল আরও নানান্‌ ঘটনা। কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট, নেতাজীর আসাম-সীমান্ত পর্যন্ত আগমন, যুদ্ধবিরতি, কলকাতায় রশীদ আলী দিবসে অভূতপূর্ব প্রাণোন্মাদনা, মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা।

মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। ১৯৪৬-এর ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগ ডাইরেক্ট এ্যাকশন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করল। আরম্ভ হল হিন্দু-মুসলমানে নিধন যজ্ঞ। সে দৃশ্য আমার দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। মানবতার অমন কলঙ্কময় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতেও চাই না, কারণ ভবিষ্যৎ বংশধররা একদিন আমাদের এই বর্তমান মানবগোষ্ঠীকে বর্বর আখ্যা দেবে।

কলকাতার পথে পথে মোটরে বাইক লাগিয়ে গেয়ে ফিরতে লাগলাম, "গান্ধীজিন্নার এই আবেদন, শোন গো দেশের সন্তান।" গেয়ে চললাম, "ও ভাই হিন্দু মুসলমান, ভুল পথে চলি দোঁহারে দুজনে কোরো নাকো অপমান।"

ভারত ছেড়ে বৃটিশ চলে যাবে। কায়েদে আজমের নেতৃত্বে ভারতের মুসলমানের দাবী পাকিস্তান চাই—অবশেষে সে দাবী স্বীকৃতি পেল।

গ্রামোফোন কোম্পানীতে ফোন করে সোমবাবুকে একদিন বললাম, "পাকিস্তান তো হল, এই পাকিস্তানের গান রেকর্ড করবেন?" কোম্পানীর বড় সাহেব একদিন গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে আমার সাথে দেখা করলেন। গান রেকর্ড করতে রাজী হলেন। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল এই যে গ্রামোফোন কোম্পানীর যন্ত্রীরা এ গানের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করল। অগত্যা ক্যাসোনোভার ইংলিশ অর্কেষ্ট্রার সাথে গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়ে গানের স্বরলিপি করিয়ে দিলাম। দু'খানা বাংলা দু'খানা উর্দুগান ঠিক করলাম। বাংলা গান দু'খানা কবি গোলাম মোস্তফার রচিত— 'সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা দুনিয়াতে ভাই সে কোন্ স্থান' ও 'ঝির ঝির ঝির ঝির পূবান বাতাসে ধাও!' উর্দু গানখানি দু'পিঠেই ফৈয়াজ হাশমী রচিত 'জমি ফেরদৌস পাকিস্তান কি হোগি জমানেমে'। পাকিস্তানের উপর বাংলাদেশে এবং খুব সম্ভবতঃ পাক-ভারত উপ-মহাদেশে এই প্রথম রেকর্ড।

কলকাতায় তখনো দাংগা চলছে। ওয়ার্ক ডে-তে রেকর্ড করতে যাওয়া বিপদজনক, তাই সোমবাবু ঠিক করলেন কোন এক রবিবারে শুধু ষ্টুডিও খোলা রাখা হবে। চার-পাঁচ জন গায়ক আর ক্যাসানোভার অর্কেষ্ট্রা-পার্টি রওয়ানা হলাম দমদমের পথে। দু'তিনবার আমাদের মোটরের রুট বদলাতে হল। চলতে চলতে হঠাৎ হয়ত দেখি উন্মত্ত জনতা কোথাও চলেছে মুসলমানের পিছনে, কোথাও চলেছে হিন্দুর পিছনে।

মনে জেগেছিল, এই রেকর্ড করে বাসায় নাও ফিরতে পারি, কারণ এই পরিস্থিতিতে বাসায় যে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব তার নিশ্চযতা কি? তাই দমদম রওয়ানা হওয়ার আগে আমার কাছে কে কত টাকা পাবে আর আমিই বা কার কাছে কি কি পাব সব কিছু একখানা কাগজে লিখে রেখে বাসা থেকে রওয়ানা হয়েছি।

বেলা দু'টোর সময় দমদমে পৌঁছেছি, কারখানা বন্ধ। কারখানার পিছন দরজা দিয়ে ষ্টুডিওতে ঢুকলাম। চারখানা গান রেকর্ড করলাম। আমি, কবি গোলাম মোস্তফা, বেদারউদ্দীন আহ্‌মদ, কাদের জমিরী ও ক্যাপ্টেন মোস্তফা আনোয়ার মিলে। ষ্টুডিও বন্ধ হয়ে গেল। বাসা ফেরার পথে মনে হচ্ছিল, প্রাণ যদি এখন যায়ও, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব এই ভেবে যে এত রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তানের প্রথম প্রশস্তি গাইবার সৌভাগ্য তো অর্জন করে গেলাম!

পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহরে আসার জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেছে। আমার জীবনে যা কিছু নাম, যশ, সম্মান, প্রতিপত্তি—সব কিছুর লীলাক্ষেত্র এই কলকাতা চিরজীবনের মত ছেড়ে চলে যেতে হবে। ক'দিন ধরে শুধু এই কথাই মনে হচ্ছিল। দেখবার, শুনবার, শিখবার, দেবার আর নেবার এমন মহাতীর্থ কবে যে পাকিস্তানে গড়ে উঠবে একথা বারবার মনে হতে লাগল।

শুধু একটুমাত্র আশার আলো প্রাণের আর এক কোণে জ্বলে উঠল। তার আলোকে স্পষ্ট পড়তে লাগলাম অনাগত কালের পাতায় লেখা রয়েছে, "লাখো শুকুর, গড়ে যাবার নসিব যাদের হয়।" নবসৃষ্টির উল্লাসের ঢেউ এসে পৌঁছল প্রাণের কূলে। সেই ঢেউয়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলাম।

এলাম ঢাকায়। সম্পূর্ণ এক অপরিচিত পারিপার্শ্বিকে। চৌদ্দই আগষ্ট, ১৯৪৭ শবেকদরের রাত। রাত ঠিক বারোটার পর ঢাকা রেডিওতে প্রথম কোরানের আয়াত গম্ভীর সুরে আবৃত্তি করলেন এক মওলানা। তার পরেই আমার সৌভাগ্য হল পাকিস্তানের রেডিওতে প্রথম পাকিস্তানের গান গাইবার—

'সকল দেশের চেয়ে পিয়ারা
দুনিয়াতে ভাই সে কোন স্থান?
পাকিস্তান সে পাকিস্তান'।।

তারপরেই গাইলাম—

'জমি ফেরদউস পাকিস্তান কি হোগি
জমানেমে'।।

সারারাত জেগে ইকবালের তারাণায় সুরসংযোগ করলাম লাট-ভবনের একটি প্রকোষ্ঠে বসে। ঢাকা শহর তখনও জেগে ওঠে নি। প্রদোষের অন্ধকার থাকতেই বের হল আমার একক প্রভাত-ফেরী। একা আমি মোটরে মাইক বসিয়ে সারা শহরে পাকিস্তানের গান গেয়ে ফিরলাম। সেদিন ঢাকা যে অপূর্ব উন্মাদনায় জেগে উঠেছিল তা আমার স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

অফিসে এলাম। অফিস কোথায়? কোথায় চেয়ার, কোথায় টেবিল? কলকাতার ভাগ-করা মালপত্র কোন কোন অফিসে এসে পৌঁছেছে, কোন কোন অফিসের মাল হয়তো এখনো বঙ্গোপসাগরের বুকে ঢেউয়ের দোলা খাচ্ছে। মাস দুই তিন এইভাবেই কাটল।

ইডেন বিল্ডিংয়ে যাই, ভবিষ্যৎ কাজকর্ম কি হবে না হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। ছেলেমেয়েরা কুচবিহারে, তাদের তো আর ঢাকায় না আনলে চলে না। কোথায় বাড়ী, কোথায় ঘর, কে কাকে সাহায্য করে? সবাই আপন আপন মাথা গুঁজবার ঠাঁই খুঁজতে ব্যস্ত। ইষ্টেট অফিস বলে একটা অফিস খুলেছে সরকার, কিন্তু কার সাধ্য সেখানে ঢোকে?

রিকুইজিশন করা বাড়ীগুলো বড় বড় কর্তারা অধিকার করে বসে আছেন। কোনোমতে মাথা গুঁজে আছি এক জায়গায়। নারিন্দায় এক বাসা পেলাম। চার-পাঁচ মাসের ভেতরেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলাম।

১৯৪৮-এর মার্চ মাসে কায়েদে আজম এলেন ঢাকায়। ঘোড়দৌড়ের মাঠের সেই ঐতিহাসিক সভায় আমারি উপর পড়েছিল উদ্বোধনী সংগীত গাইবার ভার।

কায়েদে আজমের অকস্মাৎ তিরোধানে নাজিমউদ্দীনের ভাগ্যাকাশে উঠল নতুন বিজয়-সূর্য। তিনি হলেন কায়েদে আজমের পদাভিষিক্ত। নূরুল আমিন সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন। ওদিকে কায়েদে মিল্লাত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তিনি এলেন ঢাকায়। সিলেটের জনসভায় তিনি চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। সভায় আমি গেয়েছিলাম, "বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা।" গানটার অনুবাদ তাঁর সামনে রাখা হয়েছিল ইংরেজীতে। তিনি গানের বাণীর উপরই ভিত্তি করে আগাগোড়া অগ্নিস্রাবী বক্তৃতা দিলেন। আমার সাথে পরে বহুক্ষণ আলাপ হয়েছিল।

ঢাকা ভিক্টোরিয়া পার্কে পূর্ববাংলায় নাজিমউদ্দীনের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় সর্দার আবদুর রব নিশতার এক সভা করেন। আমার জাতীয় সংগীত শুনে তিনি বলেছিলেন, "আপকা শেরমে দেমাগ হ্যায়, হামারা বাজুমে তাকদ্ হ্যায়। আইয়ে দোনো ভাই এক হো ক্যর দুনিয়ামে আগে ব্যঢ় ক্যর হামারা কওমকা ঝাণ্ডা উঁচা রাখেঁ।"

নাজিমউদ্দীন সাহেব যখন প্রধানমন্ত্রী ও অন্যদিকে পাক-ভারত সম্পর্ক যখন ক্রমশঃ তিক্ত হতে তিক্ততর হয়ে উঠছিল তখন মন্ত্রী হবিবুল্লা বাহার আর আমি সারা পূর্ব পাকিস্তানে জনসাধারণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য খুব কম হলেও অন্ততঃ দুশো জনসভায় যোগদান করেছিলাম। প্রত্যেক সভায় কবি গোলাম মোস্তফা রচিত "আল্লা আল্লা বলরে ভাই যত মোমিনগণ—পাকিস্তানের বয়ান করি শোন দিয়া মন" এবং "ওরে ও মোমিন ভাই তুই করিস কেন ভয়, পাকিস্তানের দুর্দিন যাবে হবে হবে জয়"—এই দু'খানা গান গেয়ে ফিরেছি।

চোরাকারবারীর দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পূর্ব পাকিস্তানের চাউল পাট গোপনে প্রকাশ্যে কতভাবে যে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে পাচার হতে লাগল তার ইয়ত্তা নেই। সীমান্তের কাছে গিয়ে শত শত সভা করে গাইলাম প্রহরীর গান, কবি গোলাম মোস্তফার লেখা—

'পাকিস্তানের কওমী ফৌজ আমার পাহারাদার
চোরাবাজারের শয়তান সব হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার'।।

তখন আনসার দল গঠন করা হয়েছে। দেশময় আনসারদের মধ্যে কী কর্মচাঞ্চল্য, তাদের ভেতর কি উম্মাদনা! আনসারদের এই গান শিখিয়ে দিলাম। তারা হাজার কণ্ঠে এই গান গেয়ে ফিরতে লাগল। যেখানেই যেতাম আনসার ক্যাম্পে গিয়ে এইখানা আর "উড়াও উড়াও উড়াও আজি কওমী নিশান," এই গান দু'খানা শিখিয়ে দিতাম।

পাকিস্তান অর্জনের পরের বছরই গ্রামোফোন কোম্পানী নারায়ণগঞ্জের ইউরোপীয়ান ক্লাবে তাদের রেকর্ডিং মেশিন পাঠিয়ে দেয়। আমার তত্ত্বাবধানে বহু গান রেকর্ড করা হয়, কবি গোলাম মোস্তফার এই গানগুলো সে সময়ই রেকর্ড করেছি। বন্ধুবব গিরীণ চক্রবর্তী এসব গানে (পল্লী সংগীতগুলি ছাড়া) সুরসংযোগ করেছিলেন। প্রচার দফতর থেকে এসব বেকর্ড কিনে সমস্ত প্রচার ইউনিটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রেডিও পাকিস্তান ঢাকা-ই শুধু ঢাকা রইল। আমি বহু চেষ্টা করলাম এই সমস্ত গান রেডিওর মাধ্যমে প্রতিদিন প্রচার করতে, কিন্তু তারা কিছুতেই করলে না। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানের উপর লেখা গান দু'একখানা ছাড়া আর কারুরই রেকর্ড করা নেই। আমার নিজের গাওয়া রেকর্ড, লজ্জা ও সংকোচ এসে উঁকি মারত, কি করে নিজের এসব গান বাজাবার জন্য তাগিদ দেব? কিন্তু দেশের তৎকালীন পরিস্থিতিতে এসব গানের মূল্যই বা অস্বীকাব করি কি করে? লজ্জা-সংকোচের মাথা খেয়ে, নিজে বিনীত হয়ে এসে রেডিওর কর্তাদের বহু অনুরোধ করেও কামিয়াবী হতে পারি নি।

বাঙলার বিভিন্ন গ্রাম এবং শহরের উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী স্কুলের উন্নতিকল্পে চ্যারিটি শোতে, বিচিত্রানুষ্ঠানে কত জায়গায় যে যোগদান করেছি বলে শেষ করা যায় না। নিজের পারিশ্রমিকের বেলায় কতবার কতভাবে যে প্রতারিত হয়েছি সে কথাও বলে শেষ করতে পারব না। তবু আজ মনে হচ্ছে নিজের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের ফলে অজস্র স্কুলের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে, এইটাই আমার চরম পাওয়া। পাঁচ ছ'জন গায়ক দল করে কোথাও গিয়েছি, আট-দশ হাজার দর্শকে ঘেরাও-করা প্যাণ্ডেল পূর্ণ হয়ে গেছে। আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলব জানি না, গান যখন আরম্ভ করেছি এক এক বারে একসাথে সাত-আটখানা গানের কমে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারি নি। আমার সাথে আর একটি জনপ্রিয় অভিনেতারও কম খাটুনি হত না। তিনি বগুড়ার বিখ্যাত ক্যারিকেচারিষ্ট আলাউদ্দীন সরকার। অমন আমুদে লোক আমার জীবনে আর দেখি নি। কোথাও গেলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গ্রামের ছেলের দল তাঁর পাশে ভিড়ে যায়। এত বিভিন্ন ধরণের কৌতুক-জানা অভিনেতা আমি খুব কমই দেখেছি। বাংলা দেশের স্কুল-কলেজের আর্থিক অনটন কিছুটা উপশম করার ব্যাপারে এঁর দান অতি নগণ্য নয়।

আজাদী-পূর্ব ও আজাদী-উত্তর যুগে ভুরি ভুরি মন্ত্রীর সাথে আমি বিভিন্ন ধরণের সভাসমিতিতে যোগদান করেছি। এর ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলেও সমস্ত মন্ত্রীদের কার্যকলাপের সাথে আমি ভালভাবেই ওয়াকিবহাল ছিলাম। আমি কোন মন্ত্রীরই সমালোচনা করতে চাই না, তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মন্ত্রীর গদীতে যারাই বসেছেন, তারা মন্ত্রীত্বের পূর্বের অবস্থাটা প্রায়ই ভুলে যান এবং যে অংগীকার নিয়ে অর্থাৎ দেশবাসীর কাছে যে কাজ করবেন বলে ওয়াদা দিয়ে এম, এল, এ হয়ে আসেন, গদীতে বসেই তাদের প্রায় সবাই পূর্ব প্রতিশ্রুতি একদম ভুলে গিয়ে শুধু 'চাচা আপন পরাণ বাঁচা' অথবা সোজা কথায় নিজের পকেট কিসে ভর্তি হবে এই চিন্তাতেই মশগুল হয়ে থাকেন। একথা আমি অতি জোর গলায় বলতে পারি যে আজ পর্যন্ত কোন মন্ত্রীকেও আমি মুখ্যতঃ দেশের জন্য ভাবতে দেখি নি। যখনি যার সাথে যাবার সৌভাগ্য হয়েছে, দেখেছি

সর্বক্ষণই তারা এম, এল এ-দের সাথে জনসাধারণের সাথে বা সেখানকার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সাথে সেখানকার অভাব-অভিযোগ ও নানা সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন শুধুমাত্র লোক দেখানোর খাতিরে। স্থানীয় জনসাধারণ তাঁদের দরদী নেতাকে দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মনে করলেন ; কিন্তু তাঁদের অনেকের পক্ষেই মন্ত্রীপ্রবরের কথা ও কাজের ভেতর পার্থক্যটা খোঁজার অবসর হয়নি। আমি মন্ত্রীদের সাথে আবার রাজধানীতে ফিরে এসেছি, দেখেছি রাজধানীতে এসে কোনদিনও পুরোনো ওয়াদা নিয়ে তারা মাথা ঘামান নি। মন্ত্রী হলে দেশের বহু বিষয়ে জানাশুনা থাকা চাই। কোন কোন মন্ত্রী-মহামন্ত্রীকে একথাও বলতে শুনেছি, "আজ সতের বৎসর থেকে খবরের কাগজ পড়ি না।" সেই মুহূর্তে বহু কথা তাকে বলবার জন্য উদ্যত হয়েছিলাম ;কিন্তু মনের রাগ চেপে রেখে শুধু একটি মাত্রই কথা বলেছিলাম, "দেখুন, সক্কাল বেলা উঠেই কেন মিথ্যে কথাটা বললেন? খবরের কাগজ পড়েন, নিশ্চয়ই পড়েন, এবং সবগুলো কাগজই পড়েন! তা হচ্ছে খবরের কাগজের অংশবিশেষ। কোন্ কাগজে আপনার ছবি বের হল, কে আপনাকে দেবতা বলে প্রশংসা করল, এইসব, তাই না? তা সব খবর পড়ার সময়ই বা কোথায়? আপনার তো ভাবতে হচ্ছে, কাল দশ লক্ষ টন লোহা আনার জন্য যাকে পারমিট দেবার বন্দোবস্ত করলেন তার সাথে ব্যবস্থাটা পাকাপাকি হয়নি। আপনার তো আরও ভাবতে হচ্ছে শহর থেকে আপনার নিজ গ্রাম প্রায় বিশ মাইল রাস্তা বাঁধার জন্য যে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হচ্ছে, তাতে আর কিছু করণীয় নেই কী? দশ হাজার সস্তা রেডিও আনার জন্য আপনার সেক্রেটারী নিজে বিদেশে যাবার জন্য এত পীড়াপীড়ি করল, আপনার মনেও হয়েছিল একবার সেক্রেটারীকে না পাঠিয়ে টেণ্ডার আহ্বান করি, তাহলে পার্টির সাথে আপনার সরাসরি যোগাযোগ ঘটবে। কিন্তু দূর ছাই চারদিকে এত টাকা ছড়ানো আছে, আমিই যদি সবটাতে ভাগ বসাই তাহলে সেক্রেটারীরা তো চটে যাবে। যাক, দু'চারটে ব্যাপারে তারাও কিছু পাক। নতুন রেলগাড়ী, ড্রেজার, রাস্তা মেরামতের ভূয়া কোম্পানী..........কত দিকে কত ভাবনা ছড়ানো আপনার।" এইসব নির্জলা সত্যের ছবি নির্ভীকভাবে এঁকে যেতাম বলে বহু মন্ত্রীর বিরাগভাজন হতে হয়েছে আমাকে।

কবির একটা কথাকেই আমি আমার দৈনন্দিন কাজের সামনে রেখে চলেছি। 'লাখো শুকুর গড়ে যাবার নসিব যাদের হয়'। পাকিস্তানে আসার উদ্দেশ্যও তাই। ভারতে তো খাওয়া পরার অভাব ছিল না। পৈত্রিক সম্পত্তি যা ছিল তাতে চিরজীবন পায়ের উপর পা দিয়েই কেটে যেত পরম নিশ্চিন্তে। কিন্তু পাকিস্তানে এলাম প্রথম এই কারণে যে আমার সারা জীবনের সাধনা দিয়ে আমি চেয়েছি জাতির মংগল। জ্ঞানে, শৌর্যে, বীর্যে সব দিক দিয়েই জাতি দিগন্ত-অভিসারী হোক এই-ই কামনা করেছিলাম। মুসলমানের এই নতুন আবাসভূমির সৃষ্টিতে তাই মহাউল্লসিত হয়েই ছুটে এসেছি সৃষ্টির আনন্দে মেতে থাকব বলে। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, চোরাকারবারী, হঠাৎ ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মুনাফা-শিকারী মহাজন, কোন কোন পদস্থ কর্মচারী, এদের দুর্নীতি আকাশচুম্বী স্বীকার করি। তবু যখন ভাবি দুনিয়ায় আমরাও স্বাধীন, তখন গর্বে বুক ভরে ওঠে। রাতারাতি কখনো কোন জাতির মধ্যে

সামগ্রিকভাবে উন্নতি আসে না। কোনো কালে সত্যি সত্যি আমাদের মধ্যে আসবে খালেদ, তারেক, মুসা, আমাদের মধ্যে আসবে কামাল আতাতুর্ক ......তাদের আদর্শে দেশ হবে উদ্বুদ্ধ। চলবে দেশে গঠনমূলক কাজ।

এ-পরিচ্ছেদ শেষ করার আগে বলতে চাই সংগীতে দেশ কতখানি এগিয়ে গেছে। পঁচিশ বছর আগে রেকর্ডে এক কে, মল্লিক আব আমি। অবশ্যি কে, মল্লিকের পবে আব একজন একখানা গান রেকর্ডে দিয়েই থেমে গিয়েছিলেন, তাঁর নাম আবদুল গফুর। তিনি এখনো বেঁচে আছেন। আজীবন ব্রহ্মচারীই বয়ে গেছেন। স্বাধীনভাবে দু'চারটে ছাত্র পড়িয়ে একা জীবন-পথে চলছেন। সেদিন রেডিওতে একা আমি। আর আজ বেডিও পাক বলে একটা প্রতিষ্ঠান চলছে মুসলমান শিল্পী দিয়ে। রেকর্ড কোম্পানী ঢাকায় আজো এলো না, নইলে রেকর্ডের মাধ্যমে বহু শিল্পীর পরিচয় পেতেন দেশবাসী, আর অনেক শিল্পী অনুপ্রেরণা পেয়ে এদিকে এগিযে আসত।

আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের পল্লীসংগীত পৃথিবীর পল্লীসংগীতের দরবারে বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেছে। দুই দুইবার জসিম, পল্লীসংগীত সংগ্রাহক, কবি ও অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বিশ্বের দরবারে পূর্ববাংলার পল্লীগীতিকে পরিচয় করিয়ে এসেছেন। আমি আর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোস্তাফা কামাল জার্মানীতে আন্তর্জাতিক লোকসংগীত কাউন্সিলের অধিবেশনে বক্তৃতা ও সংগীত সহযোগে আমাদের পল্লীগীতির পরিচয় দিয়ে এসেছি ১৯৫৬ সালে। এর আগে ১৯৫৫ সালে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সংগীত সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করার ভার পড়ে আমার উপর। ফেরার পথে রেংগুনে বাঙালী সমাজ আমাকে পল্লীসংগীত পরিবেশন করার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। তাঁদের সে অনুরোধ এড়াতে পারি নি। ১৯৫৭ সালে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আবাব রেংগুন গিয়েছি তাঁদের ডাক এড়াতে না পেরে প্রবাসী বংগ সাহিত্য সম্মেলনে।

নানাদিকে পল্লীগীতির সুধা ছড়িয়ে এলেও আমি মনে করি দেশ যত শিল্পায়িত হবে, পল্লীগীতি তত লোপ পেতে থাকবে। বিভিন্ন সভা-সমিতি পত্র-পত্রিকায় আজ আট-দশ বছর ধরে আমি বহুভাবে বলে আসছি, এই পল্লীসংগীত সংরক্ষণের ব্যবস্থা হোক, টেপ রেকর্ডে পল্লীর গান, তার কথা ও সুর অবিকৃতভাবে রেখে দেওযা হোক কালজয়ী লোকজযী করে। আজও আমাব সব কথা অরণ্যে রোদন সার হয়েছে।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, আধুনিক মুসলমান গায়কদের মধ্যে ইসলামী গান গাওয়ার রেওয়াজটা উঠে গেছে। যে ইসলামী গানের রসধারা পান করে ঘরে ঘরে বাংলার মুসলমান সংগীত-মনা হয়ে উঠেছে এই ক'বছরে শিল্পীরা সেই ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ইসলামী গানকে একেবারে বর্জন করে বসবে, এটা ভাবতেও দুঃখ হয়। ইতিমধ্যে কলকাতা গিয়ে একটা জিনিয লক্ষ্য করেছি, যে কোনো গানের আসরে গায়ক-গায়িকামাত্রই কোনো একখানা আধুনিক গানের পরেই গেয়ে উঠেছেন একখানা ভজন। আর আমাদের এখানকার শিল্পীরা ইসলামী গান গাওয়াটা যেন হীনম্মন্যতা মনে করে গান না। মেয়ে-শিল্পীও বহু এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু বেশ লক্ষ্য করছি তাঁরা পল্লীসংগীত বা ইসলামী গানের অনুরক্ত নন। আমাদের পল্লীসংগীতে

অফুরন্ত প্রাণসম্পদ রয়েছে, এদিকে একটু মনঃসংযোগ করলে এ সংগীতের ধারাকে আরো বেশী প্রাণবন্ত করে তোলা যায় এবং জগৎ-সভায় একে চিরকাল শ্রেষ্ঠত্বের সুউচ্চ শিখরে দাঁড় করিয়ে রাখা যায়। আমাদের তরুণ শিল্পীরা এদিকে অবহিত হোন, এই আমার কামনা ও প্রার্থনা।

অবশ্য এর জন্য চাই নানান্ দিক থেকে সহযোগিতা। ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের কলকাতা বেতার কেন্দ্রে শিল্পীরা আধুনিক গানের পর একখানা ভজন গান গায় এবং সেভাবে প্রোগ্রাম করতে কলকাতা বেতার কর্তৃপক্ষ কোন লজ্জা, সংকোচ বা হীনম্মন্যতা বোধ করেন না। জানি না ঢাকা রেডিও কেন স্পষ্ট ভাবে 'ইসলামী গান' নাম দিয়ে সুখ্যাত শিল্পীদের মারফৎ ইসলামী গান পরিবেশন করেন না।

আরও দরকার সংগীত স্কুল। আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নয় বছর ধরে সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বহু প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছি। পূর্ব পাকিস্তান সরকার তিন তিনবার সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে কি পরিমাণ টাকার দরকার, কতজন শিক্ষকের দরকার, কি কি যন্ত্রের প্রয়োজন ইত্যাদি তথ্যসম্বলিত প্ল্যান চেয়েছিল, আমি দিয়েছি, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আর্টস্ কাউন্সিল থেকে শেষবারের মত এই ধরণের প্ল্যান চাওয়া হয়েছে, সেটাও সম্ভবতঃ উপেক্ষার মরুভূমিতে শুকিয়ে গেছে। বুলবুল একাডেমী অবশ্যি এবিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ করেছে। এখন সরকার যদি অন্ততঃ এর কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করে তাহলে এটা টিকে থাকতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

আর একটা জিনিষ আমাদের দেশ থেকে প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে—সেটা হচ্ছে ক্ল্যাসিকাল মিউজিক। এই ক্ল্যাসিকাল মিউজিকই হচ্ছে সংগীতের বুনিয়াদ। বড় বড় কয়েকজন ক্ল্যাসিকাল গাইয়ে বা ওস্তাদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এখানে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এদেশ ছেড়ে কলকাতায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এখনো যে কয়জন বিশিষ্ট শিল্পী আছেন তাঁদের যদি উৎসাহিত করা না হয় তাহলে সংগীত জগতে এক বিরাট শূন্যতা দেখা দিতে বাধ্য। আমাদের গৌরব পরলোকগত ওস্তাদ খসরু যখন অসুস্থ ছিলেন তখন দেশবাসীর নীরবতা আমার বুকে বড় বেজেছিল। এজন্য সরকারকে দোষ দিলে চলবে না, দেশের অন্ততঃ শিক্ষিত বিত্তশালী জনগণকে এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে। নইলে তাঁরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বেশী।

বিদেশ ভ্রমণ

।। ম্যানিলা-হংকং-ব্যাংকক-রেংগুন ।।

ইংরেজী ১৯৫৫ সালে প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সংগীত সম্মেলনে যোগদান করবার জন্য ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলায় যাই। সেখানে ফার ইষ্ট ইউনিভার্সিটি হলে ভারত, পাকিস্তান, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা প্রভৃতি দেশের সংগীতবিশারদদের তিন দিন ধরে (২৯-৩১শে আগষ্ট) ঐসব দেশের সংগীতের বিভিন্ন ধারা বা গতি নিয়ে আলোচনা-সভা বসে। ইউনিভার্সিটির দালান-কোঠা যে জায়গায় অবস্থিত তার পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক শোভা প্রথমেই মনকে আকৃষ্ট করে। তিনদিকে দূরে দূরে পর্বতশ্রেণী, আর একদিকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে ম্যানিলা শহর—দিগন্ত-প্রসারী মাঠ....ইউনিভার্সিটির কোন কোন বিষয়ের বিল্ডিং এক একটা পাহাড়ের উপর—অতি চমৎকার।

পূর্ব পাকিস্তানের গানের ধারা বা গতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নদীমাতৃক পূর্ব বংগের ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদী, মুর্শিদী, কীর্তনের কথাই বলেছি। আমি প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে পূর্ববাংলার পল্লীগীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছি। বক্তৃতার মাঝে মাঝে প্রায় সাত-আটখানা গানও গেয়েছি। গানের বাণী ইতিপূর্বে ইংরাজীতে সবার কাছে অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছিল। ভাটিয়ালী সুরের সাথে সে দেশের লোকের পরিচিতি ঘটেনি কখনো, কিন্তু সংগীতের সভায় দেশ-বিদেশের সংগীতজ্ঞদের কাছে এ-সুর ভালোই লেগেছিল বোধ হয়, নইলে এক একটা গানের শেষে উচ্ছ্বসিত হাততালির স্থায়িত্ব এতক্ষণ ধরে হত না।

অন্যান্য দেশ থেকে যে সমস্ত প্রতিনিধিরা এসেছিলেন তারা অধিকাংশই গ্রামোফোন রেকর্ড সহযোগে তাঁদের দেশের গানের ধারার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে।

ম্যানিলার এক প্রকাণ্ড অপেরা হলে একদিন আমাদের সংগীতের জলসা বসে। লায়লা আর্জুমান্দ বাণু একখানা রবীন্দ্র-সংগীত, দু'খানা নজরুল-গীতি এবং একখানা পল্লীগীতি পরিবেশন করেন। গায়িকার কণ্ঠ-মাধুর্যে সে দেশের গুণীজন অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন—প্রত্যেকটি গানের শেষে করতালি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। গানের সাথে তবলা সংগত করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানেব বিশিষ্ট তবলা-বাদক মোহাম্মদ হোসেন। আমিও চার-পাঁচ খানা পল্লীগীতি পরিবেশন করি। গানের শেষে বহু নরনারী আমাদের সাথে পরিচিত হতে এলেন। তবলা বাজনা তাদের খুবই মুগ্ধ করেছিল। আমি ভারত হতে আগত প্রফেসর দেওধরের সাথে হারমোনিয়াম সংগত করি। এক ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন—তোমাদের দেশের গান এত চমৎকার এমন চিত্তাকর্ষক যে আমি আমার স্বামীর সংগ

পরিহার করে দূরের আসন থেকে একদম ষ্টেজের সামনে এসে বসেছি। তবলা কি করে শেখা যায় এই নিয়ে খানিকক্ষণ খুব ঔৎসুক্যসহকারে অনেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

ফিলিপাইনের সে সময়কার যুবক প্রেসিডেন্ট ম্যাগসেসের বাসায় বিভিন্ন দেশের সংগীতজ্ঞদেব সম্মানেব জন্য চায়ের নিমন্ত্রণে গেলাম। চমৎকার বাড়ীটি। বিশ্ব-সুন্দরী নামে পরিচিতা ফিলিপাইনের এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের সাথে আলাপ হল। একটি পনের-ষোল বছরের মেয়ে এমন সুরেলা হাতে বেহালা বাজাল যে সুরে সুরে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়লাম।

মিস কাসিলাগেব মিউজিক একাডেমীতে একদিন চায়ের দাওয়াত ছিল। একাডেমীটি সত্যি চমৎকার। সাউণ্ড প্রুফ ছোট ছোট এক একটা প্রকোষ্ঠ। সেই সব ঘরে এক একটি ছাত্র বা ছাত্রী প্রাণ ভরে চীৎকার করে গলা সাধে। পাশের ঘর থেকে একবিন্দু শব্দ ভেসে আসে না।

ম্যানিলা ছেড়ে এলাম হংকং। এমন সুন্দর শহর আর কোনদিন দেখি নি। খান সাহেব তাজুদ্দিন এখানকার বড় ব্যবসায়ী। তাঁরই সৌজন্যে শহরের সব দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখা হল।

এই সুন্দর শহর ছেড়ে আমরা একদিন উড়লাম ব্যাংককের পথে। পোখরাজ, চুনী, পান্না এগুলো এখানকার প্রসিদ্ধ জিনিষ। এসব পাথর যে এদেশে এত সস্তা সে কথা ভাবতেও পারি নি।

এলাম রেংগুন। রামকৃষ্ণ মিশন হলে আমাদের উপলক্ষ্য করে ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালী হিন্দু-মুসলমান একটি সংগীত-জলসার আয়োজন করেছিল। মিশন হলটির নীচের প্রকোষ্ঠে প্রকাণ্ড লাইব্রেরী—এখানে বাঙালীরা বিকালে পড়াশুনার জন্য ভীড় জমায়। দ্বিতল প্রকোষ্ঠে বিরাটায়তন হল। সেইখানে সংগীত-জলসা বসল সন্ধ্যায়। হলে তিলধারণের স্থান নেই। রাত দশটা অবধি রবীন্দ্র-সংগীত, আধুনিক, পল্লীগীতি এবং গজল লায়লা, রেংগুনের কয়েকজন শিল্পী এবং আমি পরিবেশন করলাম।

রেংগুন থেকে সোজা ফিরে এলাম ঢাকায়।

।। করাচী-বাগদাদ-বৈরুত-রোম-জুরিখ ।।

আন্তর্জাতিক লোকসংগীত কাউন্সিলের ১৯৫৬ সালের অধিবেশনে সুরশিল্পী হিসেবে যোগদান করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি কবি-সাহিত্যিক বা বক্তা নই। গান গেয়ে চলেছি আজীবন। আমার কথা বলি সুরে সুরে। গদ্য বা পদ্য লিখে বলতে গেলে কথার খেই হারিয়ে ফেলি, বলার ছন্দপতন হয়। এ কৈফিয়ৎ দিচ্ছি এইজন্য যে, আমাকে পল্লী-সংগীতের অধিবেশনে গবর্ণমেন্ট পাঠাবেন, এ খবরটা যখন একটু জানাজানি হয়েছিল, তখন এক বন্ধু আমাকে বলেছিলেন, "এ-সব পণ্ডিতের আসরে তুমি মূর্খ মানুষ গিয়ে দেশের বদনামই করে আসবে।" বন্ধুর এই সাবধান-বাণী প্রতিনিয়ত আমার মনে জাগরুক ছিল। অতি ভীরু পায়ে সংগীত-সম্মেলনে প্রবেশ করেছি, অতি বিনয়ে আমার দেশের পল্লী-সংগীতের অবস্থা বর্ণনা করেছি, ফলে লাভ হয়েছে এই যে, আমার দেশের ফলভারাবনত

বৃক্ষের দিকে চেয়ে পাশ্চাত্যের মনীষীরা আমার দেশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেছেন। বিশ্বের দরবারে পূর্ব পাকিস্তানের পল্লী-সংগীত যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দখল করে আছে তা আমার গানে ভাবে সুরে কিছুটা প্রমাণ করে দিতে পেরেছি। বহু পণ্ডিত অংক দিয়ে যা প্রমাণ করতে পারেন নি, পল্লী মায়ের সেই মেঠো সুরের আসনখানি পথের ধারে না পেতে বিশ্ব-সভায় পেতে ধরেছিলাম, এবং যাবার আগে আমার কল্যাণকামী বন্ধুবান্ধবের শুভ কামনায়, সর্বোপরি পরম করুণাময় খোদাতালার অসীম অনুকম্পায় আমার দেশের মর্যাদা বহাল রেখে ফিরেছি।

১৭ই জুলাই, ১৯৫৬! তেজগাঁও বিমানঘাঁটী থেকে এরোপ্লেন উড়ল করাচী অভিমুখে। দুদিন সেখানে থেমে ১৯শে জুলাই রওনা দিলাম বৈরুত অভিমুখে।

২০শে জুলাই—খুব ভোরে এক জায়গায় প্লেনখানা মাটিতে নামল। বলে দেওয়া হল, "আপনারা নেমে যান, টিফিন করে আসুন।" এয়ারপোর্টের ঘরে গিয়ে জানতে পারলাম আমরা বাগদাদে নেমেছি। সম্ভ্রমে দু'মিনিট চোখ বুঁজে হজরত বড় পীর সাহেবের উদ্দেশ্যে দোওয়া দরুদ পড়লাম। হোটেলের বয় বাবুর্চিদের পোষাক লক্ষ্য করলাম—আরবী পোষাক। টেবিলে চা, কফি এনে দিল—সংগে দিল অন্ততঃ দুশো আংগুর। প্রাণ ভরে আংগুরই খেলাম—চা, কফি পড়েই রইল। প্লেন মাত্র এক ঘণ্টা বিরাম। ইচ্ছা হচ্ছিল হজরত বড় পীর সাহেবের পবিত্র মাজার জেয়ারত করে আসি—কিন্তু উপায় নেই। হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—"ফ্লেন খখন ছাড়বো ইয়ারে",—মহাবিস্ময়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পরে জানতে পারলাম, সিলেট থেকে তিনি বিলাত রওনা হয়েছেন। সেখানে তাঁর ভাই হোটেলে কাজ করেন। ইনিও চলেছেন সে দেশে ভাগ্যান্বেষণে। ইংরাজী লেখা পড়া এ, বি, সি-ও জানেন না। যাই হোক প্রাণ খুলে তাঁর সাথে বাংলা বললাম। জানি না কতদিন এ ভাষায় আর কথা বলতে পারব না। প্লেন উড়ল। তখনো সূর্য ওঠেনি। আমার ঘড়িতে ঢাকার টাইম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছি—ঢাকা টাইম ৮টা ১০মিনিট।

প্লেনখানা উড়ছে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছি বাগদাদের বড় বড় মসজিদের চূড়া, ঘরবাড়ী.....ক্রমে ক্রমে সে দৃশ্য সরে গেল। তারপর শুধু ধূ ধূ মরুভূমি। মাঝে মাঝে তরুলতাবর্জিত ধূসর পাহাড়-শ্রেণী। আরব দেশ। কত ইতিহাসের পাতাই না এরোপ্লেনের দ্রুতগতির সাথে উল্টে যাচ্ছিল—কারবালা প্রান্তরের মর্মভেদী ইতিহাস—হজরতের ওপর কোরেশদের অত্যাচার—ইসলামের প্রথম রবি এই আরব আকাশেই দেদীপ্যমান হয়ে সারা পৃথিবীতে আলো বিকিরণ করেছিল। এবার প্লেন যখন ভূমি স্পর্শ করল, শুনলাম আমার গন্তব্যস্থল বৈরুতে এসে পড়েছি।

সমুদ্রের বিরাট ঢেউ বৈরুত শহরের পাহাড়ের গায়ে আছড়ে আছড়ে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে—সে জায়গায় সৃষ্টি হচ্ছে সফেদ্ ফেনার শ্বেত উত্তরীয়। এয়ারপোর্টের দৃশ্যই এত মুগ্ধ করে তুলল যে মনে হচ্ছিল এইখানেই বসে থাকি। ট্যাক্সি ভাড়া করে শহরের দিকে চললাম। রাস্তার দু'ধারে কমলালেবুর গাছ—পাইন গাছের সারি। ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে

গল্প করছি। যেইমাত্র আমার পরিচয় পেয়ে বুঝতে পারল আমি মুসলমান অমনি সে আস্‌সালামু আলাইকুম বলে দু'হাত ধরে মোসাফা করল। ট্যাক্সির হাতল ছেড়ে সে যেভাবে আমার হাত মোসাফা করার জন্য ঔৎসুক্যে হাত চেপে ধরে রইল তাতে আমি তো দস্তুরমতো ভড়কে গেলাম। প্রায় আধমিনিট সে আমার হাত চেপে ধরেই রইল—ওদিকে বল্গাহীন অশ্বের মত মোটর ছুটে চলেছে। যাই হোক সে বললে, আমি খোদ্‌রা—তুমি সৈয়দ,—আমি খোদ্‌রা তুমি সৈয়দ, তাই না? আমি বললাম, "ধরে নাও তাই।"

ব্রিষ্টল হোটেলে নিয়ে এলো আমাকে। বিরাট হোটেল এবং চমৎকার পরিচ্ছন্ন পরিপাটী। হোটেলের বয়গুলোর চেহারা কি সুন্দর। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে হোঁচট খেলাম। সামান্য দুই একটা ইয়েস, নো, ভেরীগুড্ ছাড়া ইংরাজী বলতে পারে না। আরবী কথা বলে। অগত্যা হোটেলের রিসেপশন-ইন-চার্জের সাথে ইংরাজীতে আলাপ জমাই।

বিকেলে শহর দেখতে বের হলাম। কিন্তু বিরাট শহর দু'একদিনে কতটুকুই বা দেখা যাবে? পাহাড়ের উপরে, নীচে, সমতলভূমিতে ছড়িয়ে আছে শহরের দর্শনীয় কত কি— ট্রাম লাইনগুলো সমতলভূমিতে চলতে চলতে হয়ত হাজার ফুট নীচে নেমে গেল একদম সমুদ্র সৈকতের বেলা ভূমিতে, আবার উঠে গেল পাহাড়ের অভ্রভেদী চূড়ায়। এক একটা বিরাট মনোহারী দোকানের পাশেই আলু, পিঁয়াজ তরী-তরকারীর দোকান। এ জিনিষ প্রথম এইখানেই নজরে পড়ল। আমাদের দেশে যেমন মাছ তরী-তরকারীর আলাদা বাজার—এই বৈরুত থেকে সারা ইউরোপ ভূখণ্ডে আরম্ভ হল তার ব্যতিক্রম। যেখানে খুশী সেখান থেকে দৈনন্দিন বাজার করা চলে। অর্থাৎ পথ চলতে চলতে কিছু দূর পরে পরে বড় বড় দোকানের পাশেই মাছ, মাংস, তরী-তরকারীর দোকান সাজানো রয়েছে।

এখানকার লোক শতকরা ৫০ ভাগ খৃষ্টান আর বাকী ৫০ ভাগ মুসলমান। মুসলমানী লেবাস পরা বা এমন কি দাড়ি-গোঁফওয়ালা একটি লোকও নজরে পড়ল না। মেয়েরা সবাই গাউন পরা। আরবীই এদেশের ভাষা।

২১শে জুলাই—সকাল আটটায় ব্রিষ্টল হোটেল থেকে বৈরুত এয়ারপোর্ট রওনা হলাম। মাত্র একদিন এখানে অবস্থানের জন্য মনে বড় আক্ষেপ হল।

বেলা দেড়টায় রোম পৌঁছলাম। ইনফরমেশন অফিসে খোঁজ নিয়ে যা শুনলাম তাতে তো হতাশ হয়ে পড়লাম। রোমের সমস্ত হোটেল আগন্তুকে ভর্তি। কোথাও কোনও হোটেলে ঠাঁই নেই। অফিসার ভদ্রলোক প্রায় পনের মিনিট বহু হোটেলে ফোন করে শেষ পর্যন্ত একটা হোটেলে সিট পাওয়া যাবে বলে আমাকে হোটেলের ঠিকানা দিয়ে নিজেই ট্যাক্সি ডেকে ড্রাইভারকে সব বুঝিয়ে দিলেন। হোটেলে এলাম—নাম হোটেল স্‌প্লেন্‌যার।

বিকেলে বেড়াতে যাব, কিন্তু সারা শরীরে নেমে এসেছে অবসাদ। একটু শুয়ে পড়লাম। ঘুম এল। রাত দশটায় ঘুম ভেঙে গেল, বুঝতে পারলাম বেশ জ্বর এসেছে। মনটা খুব দমে গেল।

২২শে জুলাই—সকালে সামান্য নাস্তা করে ঘরে এলাম। শরীরটা খুব দুর্বল, কিন্তু মনে হল ঘরে বসে থাকলে শরীর সত্যিই ভেঙে পড়বে, তাই হোটেলের রিসেপ্‌শন রুমে

এলাম। এখানে রোমের দর্শনীয় জায়গায় ভ্রমণকারীদের নিয়ে যাবার জন্য আধঘণ্টার মধ্যেই বাস আসবে, জানতে পারলাম। এই বাসে সমস্ত দর্শনীয় জায়গা দেখানো হয়।

আমাদের বাস যেখান থেকে রওনা হল সে জায়গাটা রোমের এক বিখ্যাত স্থান। প্রকাণ্ড একটা পার্কের তিনধারে বিরাট বিরাট ইমারত। সেই ইমারতের শীর্ষে খুব বড় বড় সম্রাট, সেনানীর প্রস্তর-মূর্তি।

বাস রওনা হল রোম শহর থেকে ট্রিবলি শহরের দিকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে। কি চমৎকার রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে গম ক্ষেত থেকে গম কেটে নেওয়া হয়েছে—গমের পাশ দিয়ে ফুটে রয়েছে পপিফুল। প্রায় আঠার মাইল এসে মোটর এক জায়গায় থামল। সেখানে যাত্রীদের নামতে বলা হল। গাইড আমাদের নিয়ে চলল রোম শহর গড়ে ওঠার বহু বহু শতাব্দী আগের এক রাজবাড়ীতে। বাড়ীঘর ধ্বংস হলেও এখনো স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব দক্ষতার স্বাক্ষর নিয়ে সে প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। রাজ-প্রাসাদে একটা পুকুরের পাড়ে নিয়ে আসা হল আমাদের। গাইড পুকুরের স্বচ্ছ পানিতে একটা রুটির টুকরো ছুঁড়ে ফেলে দিল, অমনি পানিতে ডুবে থাকা শত শত হাঁস সেই রুটির লোভে কাছে এসে পানির ভিতর থেকেই সেই সব রুটির টুকরো খেতে লাগল। মনে হল সিলেটে হজরত শাজালালের মাজারের পুকুরে গজার মাছের কথা। সেখান থেকে বিরাট উদ্যানে গেলাম। রাস্তার দু'ধারে পাইন গাছের সারি এমন সুন্দরভাবে লাগিয়েছে, মনে হচ্ছিল এ পথ যেন আর না ফুরায়। সত্যি ইটালীর সমস্ত রাস্তার দু'ধারে গাছপালা এমন অভিনব পদ্ধতিতে লাগানো যে অন্য কোন শহরেই তা' চোখে পড়েনি। আবার মোটরে উঠলাম।

পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে মোটর বাস উঠছে। মনে হচ্ছিল দার্জিলিং কার্সিয়াংগামী পথের কথা। ট্রিবলিতে এসে মোটর থামল। ছোট্ট শহর। এখানে কি এমন দর্শনীয় থাকতে পারে ভাবতেই পারি নি। আমাদের গাইড আমাদের এবার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে পাহাড়ের অনেকখানি নীচুতে নিয়ে আসছেন। একটা বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে সবাইকে থামালেন। দাঁড়িয়ে পড়লাম—ব্যাপার কি? তিনি বললেন, "Beware of pickpockets, because they are international—", আর বলতে হল না, সবাই হাসিতে ফেটে পড়লাম।

কল্পনাতীত কাব্যরাজ্যে এসেছি। পাহাড়ের উপর থেকে হাজার হাজার ঝরণার মালা একটা স্বপ্নময় ঝরণা-পুরীর সৃষ্টি করেছে। ঝরণার পানিতে সৃষ্টি করেছে একটা কৃত্রিম গোল হ্রদ। সেই হ্রদের মাঝ থেকে উর্দ্ধমুখে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে শত শত ঝরণার পানি। তরুণ-তরুণীর মেলা বসেছে সেখানে। প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে ক্যামেরা ঝুলানো। পাহাড়ের একটা অংশ কি চমৎকারভাবে, অদ্ভুতভাবে, ভয়াবহভাবে হ্রদের মাঝপথে ঝুলে রয়েছে। কৌতূহলী যুবক-যুবতীরা সেই পাহাড়ের গুহার মতো জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে—তাদের সামনে পড়ছে বৃষ্টিধারার মতো উপর থেকে ঝরণার জল। উপর থেকে নামছে ঝরণা, ডাইনে বাঁয়ে—যেদিকে তাকাই হাজার হাজার ঝরণা। সেই জলপ্রপাতের শব্দে সেখানে ধ্বনিত হচ্ছে এক অপরূপ সুর। কোথাও ব্যাঞ্জো বাজিয়ে কোন তরুণ তার তরুণীর উদ্দেশ্যে গান ধরেছে—কোথাও কেউ ফটো তুলছে। প্রায় দু'টি ঘণ্টা সেখানে ছিলাম—

এর বাইরে যে দুনিয়া আছে ভুলেই গিয়েছিলাম। গাইডের কথাই ঠিক। পকেট তো দূরের কথা নিজেকেই যে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। শুনলাম প্রায় সাতশ' বছর আগে এই ঝরণার দেশ তৈরী হয়েছিল। অন্যপথ দিয়ে আমরা উপরে উঠতে আরম্ভ করলাম। সে পথের দু'ধারেও পাঁচ ছ'হাত পর পর ঝরণা। ঝরণার কাছ থেকে বিদায় নিলাম বটে কিন্তু তার কলতান আজও স্মৃতির মণিকোঠা থেকে বিদায় নেয় নি।

রাতে এর দৃশ্য আরো অপূর্ব। খুব বড় বড় বিজলী বাতির ফ্লাড লাইটে এক একটা ঝরণার ওপর এক এক রঙে আলো ফেলা হয়। সে দৃশ্য চোখে না দেখলে ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

২৩শে জুলাই, সকাল সাড়ে এগারোটায় রোম থেকে প্লেনখানা ছাড়ল। জুরিখ পৌঁছলাম আড়াইটায়। জুরিখ দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সৌন্দর্যের লীলানিকেতন এই সুইজারল্যাণ্ড। শুধু সবুজ—সবুজের মেলা, আর ফুল। প্রতিটি বাড়ী ঘরে মায় ছাদে পর্যন্ত ফুলের টবে ফুল ফুটিয়েছে। উঠেছি হোটেল সিগারটেন-এ। ঠিক হ্রদের উপরেই হোটেলটি। হ্রদের অপর পারে দিগন্তবিস্তৃত পর্বত শ্রেণী—ঢেউ খেলিয়ে আকাশের প্রান্তদেশে নীলের কোলে মিশে গেছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে হংকং-দার্জিলিংয়ের মতো অসংখ্য বাড়ী। হ্রদের এপারে বড় বড় দালান কোঠা, কিন্তু সব দালানের ছাদ-গুলো টালি দিয়ে ছাওয়া আর প্রত্যেকটি বাড়ীতে ফায়ার প্লেসের জন্য চিম্‌নি।

যৌবনে দার্জিলিং দেখে মনে করেছিলাম এর উপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বোধ হয় দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। ১৯৫৫ সালে হংকং দেখে দার্জিলিং ম্লান হয়ে গিয়েছিল। রোম দেখে স্তব্ধ বিস্ময়ে মানুষের বিরাট শিল্পোৎকর্ষের কথা ভেবে মূক হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু সুইজারল্যাণ্ড এসে মনে হচ্ছে খোদা তাঁর বিরাট বিশাল দুনিয়া সৃষ্টি করার পর এই সুইজারল্যাণ্ডেই তাঁর অমর তুলির শেষ আঁচড়টা একটু অকৃপণ হাতেই দিয়েছিলেন। স্নিগ্ধ শ্যামল পাহাড়, ফল-পুষ্প-শোভিত মাঠ ঘাট, জুরিখ শহরের দু'পাশে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা স্বচ্ছ হ্রদ। সেই হ্রদে কত হাঁস বিচিত্র ধরণের পাখী ভেসে বেড়াচ্ছে। শত শত নৌকায় তরুণ-তরুণীরা অবাধে ভ্রমণ করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সুইমিং ক্লাব—তার পাশেই রাস্তায় রেস্তোরাঁ। রাস্তার উপর চেয়ার পেতে খানাপিনা চলছে। পাশে তাকিয়ে দেখুন—বহুদূর বিস্তৃত আলু কপির ক্ষেত। প্রকৃতিকে কি ভাবে ধরে রেখেছে শহরের বুকেও।

সন্ধ্যার কিছু পরেই হোটেলে খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম। যদিও বেশ শীত তবু মনে হল হ্রদের পাড়ে একটু বেড়িয়ে আসি। পথঘাট জনমানবশূন্য হবে মনে করেছিলাম, কিন্তু তা নয়। কারণ এই মাসটাই তো ওদেশে গ্রীষ্মকাল অর্থাৎ আমাদের দেশের নভেম্বরের শীত। হ্রদের পাড় গুলজার হয়ে আছে লোকের আনাগোনায়। পাহাড়ের গায়ে ফুটেছে লাখো লাখো বিজলী বাতি। হ্রদের স্নিগ্ধ শান্ত পানিতে পড়েছে সেই কোটী কোটী আলো—রাতের জুরিখ কি কাব্যময়।

২৪শে জুলাই—ভোর পাঁচটায় উঠে নামাজ পড়ে খোদার কাছে অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম—তাঁর সৃষ্টির নব নব সৌন্দর্যসম্ভার আমার চোখের সামনে প্রতিভাত করার জন্য।

।। জার্মানীতে ।।

সকাল ন'টায় জুরিখ থেকে প্লেন ছাড়ল। ন'টা পঁয়ত্রিশ স্টুটগার্ট এয়ারপোর্টে নামলাম। এত অল্প সময়ে যে জার্মানী এসে পৌঁছব এ ধারণাও করতে পারিনি। এরোপ্লেন থেকে নেমেই দেখি—এয়ারপোর্টে আমার বড় ছেলে মোস্তাফা কামাল আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে সেখানে দেখতে পেয়ে আনন্দে প্রাণ নেচে উঠল। কাষ্টমস-এর চৌহদ্দি পেরিয়ে যখন বাইরে এলাম পিতাপুত্রের সেই মিলন মুহূর্তে অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল অনন্ত করুণাময়ের উদ্দেশ্যে কোটী কোটী শুকরিয়া।

স্বাস্থ্যবতী একটি আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করছিল। পাশে এসে অভিবাদন করে ইংরাজীতে বললে, "ষ্টুটগার্ট যাবে—ট্যাক্সি চাই?" আমরা বললাম, "হ্যাঁ দরকারই তো!" মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল। দু'মিনিটের মধ্যেই সুন্দর একখানা প্রাইভেট গাড়ী নিজেই চালিয়ে নিয়ে এসে বললে, "উঠে পড়'। অবাক হয়ে গেলাম। গাড়ীতে উঠলাম—উঁচু-নীচু পথ। পিচ ঢালা। দুধারে অফুরন্ত ফসল। দূরে পাহাড়—ঝাউ গাছের সারি চলে গেছে দূর হতে দূরান্তরে। খুব জোরে মোটর চালাচ্ছে মেয়েটি। আমি বললাম, "একটু আস্তে চালাও।" মেয়েটি হেসে বললে, "কেন?" আমি বললাম, "পথের দৃশ্য বড় সুন্দর—তাড়াতাড়ি পথ ফুরিয়ে গেলে তো দৃশ্য ভাল করে উপভোগ করতে পারব না।" মেয়েটি আস্তে গাড়ী চালাতে লাগল। আমি বললাম, "দেখ আমি সুইজারল্যাণ্ড থেকে আসছি। প্রকৃতির লীলানিকেতন সুইজারল্যাণ্ড—কিন্তু তোমার এ দেশও তো দেখছি সুইজারল্যাণ্ডের চাইতে কম নয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে। মনে হচ্ছে সুইজারল্যাণ্ড আর জার্মানী এরা দুই যমজ বোন।" মেয়েটি খুব খুশী হয়ে বললে, "তোমার অনুমান মিথ্যা নয়—আমার দেশের প্রশংসা করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

ষ্টুটগার্ট— ভেবেছিলাম ছোট শহর হবে, কিন্তু বিমানঘাঁটী থেকে ট্যাক্সি করে রেলওয়ে ষ্টেশনে যাবার সময় উঁচু পাহাড় থেকে নগরীর যা চেহারা দেখলাম তাতে রীতিমত ভড়কে গেলাম। এ ত' বিরাট নগরী। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ। এ শহর সব চাইতে বিখ্যাত ছাপাখানা ও পুস্তক প্রকাশনার জন্য। সারা জার্মানীর প্রকাশনা ব্যবসায় এই শহরে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যন্ত্রপাতি কলকারখানার প্রায় ৯০ ভাগই গেল যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দশ বছরের ভেতরেই কর্মঠ জার্মান জাত আবার গড়ে তুলেছে এই বিরাট নগরী। ট্রাম, বাস, বিরাট বিরাট দালান কোঠা, বিমানঘাঁটী, কলকারখানা, দোকানপাট—কে বলবে এই শহর গেল যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছিল? আমার মনে হল যে জাত দশ বছরের ভেতরেই এমন অসাধ্য সাধন করতে পারে তার স্বাধীনতা ঠেকিয়ে রাখে এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই।

ষ্টুটগার্ট ষ্টেশন—বিরাট আয়তন। লেফ্‌ট লাগেজে আমার স্যুটকেস জমা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এক রেষ্টুরেণ্টে চা খেতে বসলাম। এই লেফ্‌ট লাগেজ কথাটা আমাদের দেশের অভিধানে নেই। পশ্চিমে সমস্ত রেলওয়ে ষ্টেশনে নিজ নিজ স্যুটকেস, ব্যাগ ইত্যাদি জমা দেবার একটি ঘর থাকে। নামমাত্র দু'চার আনা এক একটা স্যুটকেসের জন্য দিয়ে একটি রসিদ নিয়ে আপনি সারা শহর দেখে বেড়ান—তারপর যখন খুশী এসে রসিদটা দেখালেই

আপনার মাল দিয়ে দেওয়া হবে। শহর দেখবার জন্য স্যাটকেস হাতে করে বেড়াতে হবে না। যাক কয়েকঘণ্টা সেখানে থেকে দুপুরে খাওয়া সেরে নেবার পর ট্রেনে উঠলাম আমি আর আমার ছেলে। কি সুন্দর এখানকার ট্রেন। এতটুকু ঝাঁকুনি নেই—রেলওয়ে ষ্টেশনে নেই এতটুকু হট্টগোল—নেই পান—বিড়ি—সিগ্রেট—চাগ্রম-এর বাজখাঁই আওয়াজ—নেই কুলির ফ্যাসাদ। স্বল্প মাল নিয়ে ইউরোপের লোকেরা ভ্রমণ করে। আমাদের মত বোচকা-বুচকী, হোল্ডল, খাট-পালং, খাটিয়া নিয়ে এরা ট্রেনে ওঠে না। চমৎকার বসবার ব্যবস্থা। উঁচু-নীচু পাহাড়ের বুক চিরে রৌদ্রস্নাত দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানীর উপর দিয়ে চলল আমাদের ট্রেন।

ট্রেন চলেছে শহর ছাড়িয়ে গ্রামের পথে। কিন্তু গ্রাম বা লোকালয় নজরে পড়ছে না। দু'ধারে দিগন্ত-বিস্তৃত শস্যশ্যামল প্রান্তর। লেট্যস, গম, যব, ফুলকপি, পালং শাকের ক্ষেত। সেইসব ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পিচঢালা পথ। সেই পথের দু'ধারে বিরাট ইলেকট্রিকের পোষ্ট। সারা ইউরোপ ভূ-খণ্ডের সুদূরতম পল্লীঅঞ্চলেও ইলেকট্রিকের বন্দোবস্ত। দু'ঘণ্টা পরে এসে পৌঁছুলাম রট্‌ওয়েল নামে এক ছোট্ট ষ্টেশনে। রট্‌ওয়েলের অবস্থান হল জার্মানীর দক্ষিণে ব্ল্যাক ফরেষ্টের ধার ঘেঁসে। এখান থেকে প্যারিস ট্রেনে মাত্র ঘণ্টা দু'য়েকের পথ।

ষ্টেশন থেকে নেমেই খুব কাছেই গেলাম এক হোটেলে। কিন্তু এক মুস্কিল হল—হোটেলের মেয়ে-পরিচারিকা আর মেইড, কেউ-ই ইংরাজী বোঝে না। নানান্ আকারে ইংগিতে শেষ পর্যন্ত বোঝানো গেল যে আমরা একটা রাতের জন্য তাদের অতিথি হয়ে থাকতে চাই। খাওয়া-দাওয়া তাদের এখানেই করব—শূকর আর মদ জাতীয় সব কিছু আমাদের জন্যে হারাম।

সেইখানেই লক্ষ্য করলাম জার্মান জাত কত ভদ্র আর অমায়িক। হোটেল পরিচারিকা আমাদের কথা বুঝতে পারছে না—কিন্তু তবু তার ক্লান্তি নেই। বারবার নানাভাবে আমাদের কথা বুঝবার ও তার কথা বোঝাবার অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছে সে। শেষ পর্যন্ত এক ইংগ-জার্মান ডিক্‌শনারী বের করল ভদ্রমহিলা। অনেক দরকারী কথা সেই অভিধানের সাহায্যে তাকে বোঝানো গেল। হোটেলে এক কোণে বসে একটি সুন্দর যুবক আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। ভদ্রমহিলা ও আমাদের এই সংকটাপন্ন অবস্থা দেখে যুবকটি এগিয়ে এসে সুন্দর হাসি হেসে ইংরাজীতে বলে উঠল, "আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারি?" কি কি খাবার লাগবে ভদ্রমহিলার কাছে ফরমাস দিয়ে যুবকটি আবার হেসে বলল, "আমি না থাকলে তো আজ উপোস করে থাকতে হত আপনাদের।" বহু ধন্যবাদ জানালাম তাঁকে এই সাহায্য করার জন্য।

রট্‌ওয়েল মাঝারী গোছের একটা শহর। কিন্তু কী নেই সেখানে? ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক বাতি, আধুনিক জীবনযাত্রার সব উপকরণ সেখানে রয়েছে। আমাদের দেশের গ্রাম আর এদেশের গ্রামের তফাৎ এত বেশী যে এ সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল। শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আমার দেশের প্রতিটি লোক দলাদলি আর রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ত্যাগ করে একমনে যদি অন্ততঃ দশটা বছর একটানা পরিশ্রম না করে তাহলে এ দেশের সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা, এদেশের কাছাকাছিও আমরা আসতে পারব না।

২৫শে জুলাই—রাতটা রট্ওয়েলের সেই নির্জন পরিচ্ছন্ন হোটেলে কাটিয়ে সকাল দশটায় ট্যাক্সি করে এলাম ট্রসিংগেনে। ট্যাক্সি চালিয়ে এল মাঝবয়সী বেঁটেসেটে এক জার্মান মহিলা। কল্পনা করতে পারি আমরা আমাদের দেশে এই অবস্থা? আমার মনে পড়ে গেল কাজিদার গান—

'আঁধার হেরেমে বন্দিনী হল সহসা আলোর মেয়ে
সেইদিন হতে ইসলাম গেল গ্লানির কালিতে ছেয়ে
লক্ষ খালেদা আসিবে যদি এ নারীরা মুক্তি পায়'।।

এখানে আমাদের দু'জনের জন্যে দুটো আলাদা রুম আগেই রিজার্ভ হয়েছিল হোটেল রোজে। কিন্তু এখানেও ঐ একই সমস্যা, মেইড, পরিচারিকা, ওয়েট্রেস—কেউ-ই ইংরেজী বোঝে না। খাওয়া দাওয়াটা নিয়ে আমার ভাবনা ছিল বেশী, কিন্তু না এরা আমাদের পছন্দ অপছন্দটা বুঝেছে। দু'বেলা পোয়াটেক রুটী গোশত দিচ্ছে—সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলুভাজা, লেটুসপাতা, টম্যাটো, লেবু ও শশা।

খাওয়া-দাওয়া করে শহরটা দেখতে বের হলাম। ট্রসিংগেনকে অবশ্যি এরা গ্রামই বলে। আমি ট্রসিংগেনকে না-বলব শহর, না-বলব গ্রাম। অথচ কেন যে একে শহর বলব না তাও ভেবে পাচ্ছি না। ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক বাতি, ঝকঝকে তকতকে পিচঢালা রাস্তা—এতটুকু কোথাও কিছু পড়ে নেই। সর্বাধুনিক সাজে সজ্জিত এক একটা দোকানপাট—বড় বড় ছাপাখানা, সুন্দর সুন্দর বাড়ী। আশ্চর্য একটা কুঁড়েঘর কোথাও নজরে পড়ল না। প্রত্যেকটি বাড়ীর সাথে অনেকটা জায়গা জুড়ে তরী-তরকারীর বাগান। এতটুকু জায়গা ফেলে রাখেনি জার্মান জাত।

আমি আর আমার ছেলে পথ হাঁটছি। সাত সমুদ্দুর তেরো-নদীর ওপার থেকে অচিন দেশের যাত্রী আমরা। রাস্তার লোকগুলো হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে—এরা কারা? শ্বেতচর্ম অধিবাসীর মাঝখানে কে এই দু'টি লোক যারা বাদামী অস্তিত্ব নিয়ে এল? কিশোরী জার্মান মেয়েরা খিল্ খিল্ করে হাসছে। আমরা অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের হাসির বিরাম নেই। মাঝে মাঝে কেউ কেউ টুপি খুলে আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছে, কেউ পাশ দিয়ে যাবার সময় জার্মান ভাষায় 'শুভদিন,' 'শুভসন্ধ্যা' জানিয়ে যাচ্ছে। আর প্রত্যেকটি মেয়ে, পুরুষ মৃদু হেসে যেন এই কথাই বোঝাতে চাইছে—"অচিন দেশের হে যাত্রী-যুগল, আমাদের দেশের পরম আদরের অতিথি তোমরা।"

হোটেলের পরিচারিকারাও আমাদের সুখ-সুবিধা আর স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে প্রচুর যত্ন নিচ্ছে। সন্ধ্যায় Rauthus ইংরাজীতে যাকে বলে 'টাউন হল' সেখানে ট্রসিংগেন শহরের মেয়র ডেলিগেটদের অভ্যর্থনা জানালেন। চিরাচরিতভাবে এই সব অনুষ্ঠানে যা হয়—তাই হল।

।। সম্মেলনের কথা ।।

২৬শে জুলাই—আজ সকাল ন'টা থেকে আন্তর্জাতিক পল্লী-সংগীত সম্মেলন শুরু

হয়েছে। এবারকার সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা একটি মূল সমস্যা নিয়েই বেশীর ভাগ আলোচনা করবেন। তা হল—কি করে লোক-সংগীত, লোক-নৃত্য ও লোককলা সংরক্ষণ করা যায়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে পল্লীগীতিকে জনপ্রিয় করার বাসনা নিয়ে আমি যখন শিল্পী-জীবন শুরু করি তখন বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে গান, পালাগান, যাত্রা গান, নাচ, কবি গানের যে সমারোহ দেখেছি আজ তার শতাংশের এক অংশও অবশিষ্ট নেই। আমার নিজের গ্রামেও যেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষেত-খামার থেকে অবিরাম চাষীর কণ্ঠে ধ্বনিত হত বিচিত্র সুরে ভাওয়াইয়া গান—সেখান থেকে এখন চাষীর কণ্ঠে কদাচিৎ গান ভেসে আসে। চট্টগ্রামে এই কিছুদিন আগেও সাম্পান-মাঝির গলায় ফিল্‌মি সুরে চট্টগ্রামের ভাষার গান শুনে আমার বুক ফেটে যেতে চাইল যেন। সারাজীবন যার প্রতিষ্ঠার জন্য এত সাধনা করলাম আজ তার এই দুর্দশা। আমার চাষী ভাইয়ের, আমার চিলমারী বন্দরের গাড়ীয়াল ভাইয়ের কণ্ঠে সুর নেই। সে সুর আজ ধারকরা সুরের জালে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। ব্যক্তিগতভাবে এই কঠিন পরিস্থিতি আমার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। বাংলাদেশের গ্রাম থেকে পল্লী-সুরের শেষ রেশটি যেদিন মুছে যাবে, আমি বলব সেদিন দেশের লোক ঘটা করেই আমার অপমান করল।

বিদেশী মনীষীদের সংস্পর্শে এসে আমি যেন আশার আলোক দেখতে পাচ্ছি আবার। আফ্রিকার ঘানা থেকে অধ্যাপক নিকেতিয়া এক প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সে প্রবন্ধ পড়ে শোনানো হল। আফ্রিকার Possession Dance-এর উপর তিনি আলোচনা করেছিলেন। সমাগত অনেক মনীষী আফ্রিকার নাচ সম্পর্কে যাঁরা বিশেষভাবে পড়াশুনো করেছেন, তাঁরা এর উপর আলোচনা করলেন। হ্যাঁ, বলে রাখি, সম্মেলনে তিনটি ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা চলছিল। ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান তিন ভাষাতেই পণ্ডিত এক জার্মান মহিলা সমানে তর্জমা করে যাচ্ছেন।

ফ্রেঞ্চগিনি থেকে আগত জনৈক কৃষ্ণকায় ভদ্রলোক আফ্রিকার লোক-সংগীত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তারপর ভিয়েনার বিদুষী মহিলা ডাঃ ইভা হারিচ জাপানের লোক-সংগীতের উপর প্রবন্ধ পড়লেন। প্রবন্ধের ফাঁকে ফাঁকে টেপ-রেকর্ডের মাধ্যমে কয়েকখানি জাপানী গানও তিনি বাজিয়ে শোনালেন।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর আবার সম্মেলন শুরু হল। মিশর এই প্রথমবারের মতো যোগদান করেছে আন্তর্জাতিক লোক-সংগীত সম্মেলনে। তার প্রতিনিধি মিঃ আবদুর রহমান সামী মিশরের শিল্প দপ্তরের তমদ্দুন বিভাগের অফিসার। বিপ্লবের পর লোকগীতি সংরক্ষণ করার জন্য মিশর সরকার কি কি কাজ করেছেন, তারই বর্ণনা দিলেন তিনি। এর উপর কিছু আলোচনা হল এবং মিশরের নূতন প্রচেষ্টায় অনেকে শুভ কামনাও জানালেন।

এবার টাউন-হল থেকে আমরা চলে এলাম মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংয়ে ঘণ্টা খানেকের জন্য। শ্লোভাক একাডেমী অব্ সাইন্স থেকে এসেছেন মিঃ পেলোডেকে। তাঁর বক্তৃতার পর ফিল্ম দেখানো হল বিভিন্ন ধরণের শ্লাভ নৃত্যের। সকলের প্রশংসামুখর হয়ে উঠল হলগৃহ। রাত আটটায় টাউন হলে স্থানীয় যন্ত্র-শিল্পীরা মোজার্টের কনসার্ট বাজিয়ে শোনালেন। অনবদ্য। মোজার্ট ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় কম্পোজারদের ভেতর একজন। অতি অল্প বয়সে

তিনি মারা যান, কিন্তু তিনি যে সব স্বরলিপি রেখে গেছেন তা' আজও ইউরোপের সংগীত রসিকদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। শুধু তাঁরই কম্পোজিশন নিয়ে গবেষণা করার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছে মোজার্ট সোসাইটি।

কনফারেন্সের বাইরে বহু বিখ্যাত মনীষীর সাথে আলাপ পরিচয় হল। আন্তর্জাতিক লোকসংগীত কাউন্সিলের সুদক্ষা সম্পাদিকা মিস্ মড্ কার্পেলস্ আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন সুদূর পাকিস্তান থেকে এই সম্মেলনে যোগদান কবতে এসেছি বলে। ৩১শে জুলাই অর্থাৎ সম্মেলন যেদিন শেষ হবে, সেদিন ষ্টুটগার্টে আমি আমার প্রবন্ধ পড়ব পূর্ব পাকিস্তানের পল্লীগীতি সম্পর্কে। আমি প্রস্তাব করলাম, আমার ছেলে প্রবন্ধ পড়বে আর আমি গান গেয়ে শোনাব। সানন্দে রাজী হলেন মিস্ কার্পেলস্। বললেন—"তাহলে পাকিস্তান থেকে দু'জন প্রতিনিধি এলেন আমাদের সম্মেলনে—চমৎকার!"

আলাপ হল যুগোশ্লাভিয়ার ডাঃ ভিনকো সুগ্যানেকের সাথে। যুগোশ্লাভ পল্লীগীতির উপর তিনি একজন নামকরা পণ্ডিত। আমার ছেলের সাথে বসে বসে ভদ্রলোক আধ ঘণ্টার ভেতরেই বাংলা স্ক্রিপ্ট আয়ত্ত করে বসলেন। আলাপ হল ইসরাইল থেকে আগত এক দম্পতির সাথে। স্ত্রী গ্রামে থেকে লোক-সংগীত সংরক্ষণের ব্রত নিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ইসরাইলে ইহুদীরা ভীড় জমাচ্ছে। বিভিন্ন দেশ থেকে তারা সে সব দেশের পল্লীগীতি নিয়ে এসেছে। স্ত্রীর কাজ হল ইসরাইলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিশেষভাবে এই পল্লীগীতির চর্চা অক্ষুন্ন রাখা, বিভিন্ন সুর আর কথা স্বরলিপি করে সংরক্ষণ করা। দম্পতি যুগল বললেন, পাকিস্তানেও তো তোমাদের নিশ্চয়ই একই সমস্যা। ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসছে পাকিস্তানে বসবাস করার জন্য। তোমাদেরও উচিৎ সেসব পল্লীগীতি সংরক্ষণ করা এবং একটা সাধারণ পল্লীগীতি গড়ে তোলা।" স্বামীটি সম্প্রতি গবেষণা করছেন এক স্বরলিপি উদ্ভাবন করার ব্যাপারে। তিনি এমন এক স্বরলিপি বার করতে চান যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ধরণের সংগীতই লিপিবদ্ধ করে রাখা যায়। সফলকাম হলে এ যে একটা পথপ্রদর্শকের কাজ হবে—তা বলাই বাহুল্য।

আলাপ হল আরও বহু মনীষীর সাথে। ফরাসী, ইংরেজ, জার্মান, আমেরিকান সবার মুখে ঐ একই কথা,—পল্লীর গান লোপ পেয়ে যাচ্ছে, —কি করে একে সংরক্ষণ করা যায়। টেপরেকর্ড, সিনেমা, মিউজিয়াম এ সবের সাহায্যে উন্নত দেশগুলো ইতিমধ্যেই তৎপর হয়ে উঠেছে। এখানে এসে মনীষীরা শুধু আলোচনা করেছেন আরও কোনো নূতন উপায় আছে কি না তাই উদ্ভাবন করতে। এরা নিজেরা বা আন্তর্জাতিক লোকসংগীত কাউন্সিল এ ব্যাপারে আলোচনা বা মত বিনিময় করা ছাড়া আর কিছু করতে পারেন না। নিজের দেশের লোকসংগীত সংরক্ষণ করা যার যার দেশ তারই দায়িত্ব। নিজের পায়ে না দাঁড়ালে কোন জাত বড় হয় না। আমাদের পাকিস্তানীদের উচিৎ পরমুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করে এখনই এ বিষয়ে সচেতন হওয়া।

২৭শে জুলাই—আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সম্মেলনের আজ দ্বিতীয় দিবস। আজ সকালে অধিবেশন শুরু হয়েছে সকাল নয়টায়। ডাঃ মারিনাস পল্লী-সংগীতের বিবর্তন এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে বললেন।

পাশ্চাত্য দেশগুলো শিল্পের দিক দিয়ে অগ্রসর হয়েছে আজ প্রায় এক শতাব্দী হতে চলল। দাঁড়ের নৌকার স্থান দখল করেছে বড় বড় জাহাজ। বৃহৎ পরিবারের বদলে এসেছে ছোট ছোট পরিবার, ঘোড়া লাংগল দিয়ে হাল-চাষ না করে আজকাল ট্রাক্টরের ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এসব দেশে পল্লী-সংগীতের মুমূর্ষু অবস্থা। আমাদের দেশে সমস্যাটা এত সংগীন নয়। তবে একথাও ঠিক যে আমাদের দেশেও শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে পল্লীগীতির বিবর্তন এবং কিছু কিছু গান লোপ পেতে বাধ্য। বেশী আর কি বলব, আজ থেকে বিশ বছর আগে যে গান শুনতে পেতাম, আজ আর সে-গান শুনতে পাই না। আমাদেরও সচেতন হবার সময় এসেছে পল্লীগীতি সংরক্ষণ করার দিকে। এরা আজ পুরোনো জিনিষ খুঁজে পাচ্ছে না, আমরা যেন এদের অভিজ্ঞতায় অন্ততঃ দেখে শিখি।

ডাঃ মারিনাসের আলোচনার পর আমি কিছুক্ষণ বক্তৃতা করলাম এই বিষয়ে। আমি বললাম যে পাকিস্তানে আজও পাশ্চাত্যের মতো পল্লী-গীতির ঐতিহ্য মৃতপ্রায় হয়ে যায়নি, তবে আমাদেরও উচিৎ হবে এ দিকে সচেতন হওয়া। আমাদের রেডিও থেকে পল্লীগীতি প্রচারের নিয়মিত ও সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। দু'এক বছর আগে আর্টস্ কাউন্সিল করে কাজ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সম্প্রতি গড়ে তোলা হচ্ছে বাংলা একাডেমী। কোন পরিকল্পনা নিয়ে না এগুলেও পূর্ব পাকিস্তানে গ্রাম্যগীতি সংগ্রাহক, গায়ক ও দরদীর অভাব নেই। আন্তর্জাতিক লোক সংগীত কাউন্সিল ও ইউনেস্কো পূর্ব পাকিস্তানের লোকগীতি সংরক্ষণ করার ব্যাপারে যদি আমাদের সাহায্য করেন আমরা বিশেষ উপকৃত হব।

আজকের বিভিন্ন কাগজে আমাদের পিতাপুত্রের ছবি বেরিয়েছে। নীচে ক্যাপশন— পিতাপুত্র। দীর্ঘ এক বছরের পর পূর্ব পাকিস্তানের এঁরা দু'জন ট্রসিংগেন লোকসংগীত সম্মেলনে মিলিত হলেন। কাগজে কাগজে আমাদের দু'জনকে নিয়ে বিরাট প্যারা জুড়ে আলোচনা। সকালে হোটেলে ব্রেকফাষ্ট করছিলাম। হোটেলের মালিক ষাট বছরের স্নিগ্ধদর্শনা বৃদ্ধা এসে কাগজ বের করে আমাদের ছবি দেখাল। জার্মান ভাষার অপরিচিত শব্দে কিসব লেখা—মাঝে মাঝে আমার নাম, আমার ছেলের নাম, Ost Pakistan—মানে পূর্ব পাকিস্তান, এইটুকুই শুধু বুঝলাম। পরে ইংরেজী-জানা লোকের কাছে পরিচ্ছেদগুলোর তর্জমা করে নিলাম। তার আগাগোড়াই আমাদের পিতাপুত্রের প্রশংসায় এতখানি ভরা,—আমাদের মুখের হাসিটুকু থেকে শুরু করে আমাদের কথা বলার ভংগী পর্যন্ত—সবটুকু উল্লেখ করতে সংকোচ বোধ হচ্ছে।

২৯শে জুলাই ট্রসিংগেন ছেড়ে এলাম ষ্টুটগার্টে—সারা পথ ব্ল্যাক ফরেষ্টের ওপর দিয়ে বাসে করে এলাম। ৩০শে জুলাই ষ্টুটগার্টে সম্মেলন পুনরারম্ভ হল।

৩১শে জুলাই—আজ সকালের অধিবেশনে প্রথমেই ছিল আমার প্রবন্ধ পাঠ। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, "আমার ছেলে প্রবন্ধ পড়বে, আর আমি শুধু গাইব।" ঢাকা থেকেই ছবি সহযোগে আমার প্রবন্ধ ইংরেজীতে ছাপিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। সবাইকে তার এক কপি করে দেওয়া হল। প্রবন্ধের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে গান। তারপর শুরু হল প্রশ্নবাণ। কেউ কেউ আমার হারমোনিয়াম ব্যবহার করাটা পছন্দ করল না। আমার ছেলে আমার

হয়ে উত্তর দিল। সে বলল—"আমাদের পল্লীগীতি হারমোনিয়াম দিয়ে গাওয়া হয় না। গাওয়া হয়—খোল, করতাল, বাঁশী, দোতারা, খঞ্জনী ইত্যাদি সহযোগে। এখানে হারমোনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে শুধু স্কেল বজায় রাখার জন্য।" আমাদের গানে স্কেল বদল করা যায় কি না, আরবীয় সংগীতের প্রভাব আমাদের গানে কতটুকু—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন বিশেষজ্ঞরা করলেন। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যখন শেষ হল, তখন পড়ল করতালি। সবার প্রশংসা ও হর্ষধ্বনির মাঝখানে এইটুকু ভেবে আনন্দ হল যে আমার দেশের সংগীত আজ বিশ্বজনের সমাদর পেল।

আমার পরে আরো দু'জন প্রবন্ধ পড়লেন, এবং তারপর সম্মেলনের যবনিকা টানলেন মিস্ মড্ কার্পেলস্। আমার বক্তৃতাকেই উদ্ধৃত করে তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষে এসে পৌঁছুলেন। বললেন, "প্রথম যেদিন আমরা সম্মেলন করতে এলাম, তখন কেউ আমরা কাউকে চিনতাম না, কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের মেলামেশায় আমরা এত অন্তরংগ হয়ে গিয়েছি যে আমাদের অনেকেই অনেকের সাথে বন্ধুত্ব করে ফেলেছেন। এটা সম্ভবপর হয়েছে এই জন্যে, আমি পাকিস্তানের প্রতিনিধি মিঃ আহ্‌মদের কথা উদ্ধৃত করেই বলি,—"All village people are simple, simple people think simply and therefore they are all alike.

কনফারেন্স শেষ হলে অনেকের মুখে শোনা গেল—তোমরা এবারের সম্মেলনে একটা নতুন জিনিষ দিয়ে গেলে। পল্লীগীতি বিশেষজ্ঞেরা শক্ত শক্ত কথা আর বক্তব্য দিয়ে আবহাওয়া ভারী করে ফেলেছিলেন। টেপরেকর্ডে গান জুড়ে দিয়ে যা প্রতিক্রিয়া হয়, তা একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া মাত্র। কিন্তু সুদূর পাকিস্তানের গান একজনের গলায় এতদূরে বসে শোনা—সম্মেলনে এটা একটা নতুনত্ব বৈ কি?

১লা আগষ্ট। সকালে চা খেতে গিয়ে আজকের জার্মান খবরের কাগজ, নাম হচ্ছে Allegemeine Zeitung-এ দেখি আন্তর্জাতিক লোকসংগীত কাউন্সিলে কাল আমি যে বক্তৃতা ও গান গেয়েছি তার সুন্দর রিপোর্ট বেরিয়েছে। এক জার্মান মহিলা ইংরাজীতে তর্জমা করে শোনালেন। সমস্ত প্রতিনিধিদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছি। সবাই খুব হৃদ্যতাপূর্ণভাবে আমাদের সাথে আলাপ করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, "দেখুন, এই সাতদিন ধরে আমরা রোজই সম্মিলনীতে যোগদান করেছি—সব মহাদেশের লোক এখানে জমায়েত হয়েছি। ইসরাইলের লোকের সাথে আরবদের শত্রুতা, পূর্ব জার্মানী পশ্চিম জার্মানী মনকষাকষি, কিন্তু এই সাতদিনের ভেতর আমরা কি ভুলেও কোন রাজনৈতিক প্রসংগ তুলেছি? আমরা যেন সব কটি মহাদেশের এক একটি গানের পাখী। অনন্ত আকাশ, সীমাহীন সাগর, অত্যুংগ গিরিপথ পাড়ি দিয়ে জার্মানীর এই শান্ত-স্নিগ্ধ স্থানটিতে এসে মিশেছি একসাথে নিজ নিজ দেশের সুর শোনাতে। সুরে সুরে হল আমাদের রাখীবন্ধন।"

জীবনসায়াহ্নের স্মৃতি

।। কাজিদা'র প্রসংগে ।।

কাজি নজরুল ইসলামকে প্রথম দেখি আমি যখন কুচবিহার কলেজে বি.এ. ক্লাশের ছাত্র। স্কুল ও কলেজের মিলিত বার্ষিক মিলাদ উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি কুচবিহারে আসেন। ষ্টেশনে গিয়েছি তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনার জন্য। ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা হতে তিনি নামলেন। প্রথম দৃষ্টিতেই কী বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন! মাথায় বিরাট কালোকৃষ্ণ বাবরী চুল, বিশালায়ত আঁখি আর মোমলাগানো এক জোড়া গোঁফ। শোভাযাত্রা করে তাঁকে কলেজ হোস্টেলে নিয়ে আসা হল। সৌভাগ্যবশতঃ আমার প্রকোষ্ঠেই তাঁর শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দুপুরে মিলাদ অনুষ্ঠান শেষ হল। নতুন মসজিদ-প্রাংগনে বিকাল চারটা থেকে কবির বক্তৃতা। তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন আর চার-পাঁচ মিনিট পরে পরেই বলছেন—"আপনারা এই মিলাদ উপলক্ষ্যে আমার বক্তৃতা শুনবার জন্য আমার কাছ থেকে যা আশা করছেন সে আশা পূর্ণ করতে পারব না। আমি বক্তা নই, বক্তৃতা দিতে উঠলে আমি কথার খেই হারিয়ে ফেলি। আমার যা বক্তব্য আমি গানে গানে বলতে চেষ্টা করি।"

আসরের নামাজের জন্য পনের মিনিট সভার কাজ বন্ধ রইল। নামাজ শেষে পুনরায় সভার কাজ শুরু হল। কবি বলে উঠলেন, "আপনারা আমাকে মিলাদের সভায় ডেকে এনে ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনবেন আশা করেছিলেন, কিন্তু আমি ধর্ম বিষয়ে কী বলব? যৌবনই আমার ধর্ম, যৌবনের কর্মচাঞ্চল্যের প্রতিটি মুহূর্তই আমার এপার ওপারের পাথেয়। আমার কথা হল, বর্তমানে বড় ধর্ম দেশের কাজ। পরাধীনতার গ্লানি আর আপনারা কত কাল বয়ে চলবেন? আপনারা লক্ষ্য করেছেন, আসরের নামাজ আমি পড়লাম না। পরাধীন দেশে কী করে নামাজ পড়ি? আমার দেশ স্বাধীন না হলে আজ নামাজ পড়তে বসে যদি ইংরেজ আমার জায়নামাজ কেড়ে নেয়....?"

একথা শোনামাত্রই সভায় উঠল অস্ফুট গুঞ্জন। সে গুঞ্জন ক্রমশঃ কলহে পরিণত হতে চলল। আমরা ছাত্ররা বেগতিক দেখে তাঁকে নিয়ে হোস্টেলে সরে পড়লাম। সন্ধ্যার পর বৈরাগী দীঘির ধারে কুচবিহার ক্লাব প্রাংগনে তাঁর গানের আসর বসল। শহরের আবালবৃদ্ধবণিতা সে আসরে ভীড় জমিয়েছে। সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা অবধি সেখানে তিনি একা গেয়ে চলেছেন তাঁর শিকল-পরার গান, চরকার গান, জাতের নামে বজ্জাতি ইত্যাদি। গানে আবৃত্তিতে সবার প্রাণে এনে দিলেন যৌবন-জোয়ার।

কুচবিহার করদ-মিত্র রাজ্য। ইংরেজের বিরুদ্ধে এত কথা এত গান বড় বড় কর্তাদের

কানে গেল। পুলিশের কর্মচারীরা সাদা পোষাকে হোস্টেলের আশেপাশে আনাগোনা শুরু করল। কাজি সাহেব নির্বিকার। তাঁকে নিয়ে এ-বাসা সে-বাসায় চলল ঘরোয়া জলসা। আমি তখন কলেজ ম্যাগাজিনে গল্প লিখি। আর্য সাহিত্যসমাজ থেকে আমি 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি পেয়েছি। নামের শেষে সেই উপাধিটা দেখে কাজি সাহেব বলে উঠলেন, "এত অল্প বয়সে এত বড় লেজ লাগিয়েছ কেন?" লজ্জায় মরে গেলাম। জীবনে অতঃপর আর এ উপাধিটা কোথাও ব্যবহার করিনি। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কেউ হয়তো গোপনে আমার শত্রুতা সাধন করেছিল, কারণ কাজি সাহেব বলে উঠলেন, "তোমার লেখা গল্প তো পড়লাম, এবার একখানা গান শোনাও দেখি?" আমি এবার সত্যি লজ্জায় যেন মিইয়ে গেলাম। শিল্পীদের প্রথম জীবনে এটা হয়ই। কেউ যদি বলে, "এ বেশ গায়," অমনি বলা হয়, "যাঃ মিথ্যুক কোথাকার।" কিছুতেই সংকোচ কাটিয়ে হারমোনিয়ামের পাশে যেতে পাচ্ছি না। কাজি সাহেব বলে উঠলেন, "তুমি ভয় পেয়ো না আমি কোনও ভুল ধরব না, নিশ্চিন্তে গেয়ে যাও।" রবীন্দ্রসংগীত ধরলাম—"সে আসে ধীরে যায় লাজে ফিরে।" কাজি সাহেব মহা উৎসাহে আমার পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন, "অদ্ভুত মিষ্টি কণ্ঠ। দেখ, তোমার নিজের চেহারা যেমন আয়না ছাড়া তুমি নিজে দেখতে পাও না, তেমনি তোমার গলার সুরও কত মিষ্টি তুমি নিজে বুঝতে পারবে না যদি না রেকর্ডের মাধ্যমে শোনো। তুমি কলকাতা চল, গান রেকর্ড করাব তোমার।"

এর দু'বছর পরে কলকাতা গিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীতে কাজি সাহেবকে দেখে থমকে গিয়েছিলাম। সে গোঁফ আর নেই, সে বলিষ্ঠ দেহ আর নেই। শরীরটা হয়েছে থলথলে, নাদুসনুদুস, তবে মাথার চুলগুলো আর সেই আয়ত আঁখির মদিরা ঠিকই আছে। একটু গম্ভীর প্রকৃতির মনে হল।

কিন্তু এ গাম্ভীর্য যে তাঁর কপট গাম্ভীর্য তা টের পেলাম দু'দিনেই। কোথায় গাম্ভীর্য? এই লোক গম্ভীর হয়ে কি পাঁচমিনিটও থাকতে পারে? বেশ গম্ভীর, চায়ে দু'তিন চুমুক দিয়ে একটা পান মুখে দিলেই মুখ থেকে খৈ ফুটতে আরম্ভ করল। তারপর তিনি গল্প আরম্ভ করলে সে আসরে আর গল্প জমায় কার সাধ্যি? শুধু কি গল্প? হাসি? এমন দিনখোলা উচ্চহাসি যে না শুনেছে সে কল্পনাও করতে পারবে না হাসি কি জিনিষ। গ্রামোফোনের রিহার্সেলকক্ষে বলুন, তাঁর বাড়ীতেই বলুন, রেডিও অফিসে বলুন, দোতলা তেতালা বাড়ীগুলো যেন ফেটে পড়তে চাইত তাঁর এই হাসির শব্দে। সে হাসিতে সমতালে যোগ দিতে পারতেন আর দু'টি মাত্র লোক, তাঁরা হচ্ছেন হাসির গান গাইয়ে হরিদাসবাবু আর রঞ্জিত রায়। আমরাও হাসতাম, কিন্তু অতজোরে এবং অতক্ষণ ধরে নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঐ ধরণের হাসি হাসলে আমাদের ফুসফুস ছিঁড়ে হেঁচড়ে বেরিয়ে আসত হয়ত!

গ্রামোফোন কোম্পানীর জন্য অজস্র গান লিখেছেন তিনি। গানের খাতাগুলো সাধারণতঃ কোম্পানীর রিহার্সেল রুমেই রেখে যেতেন। কোন এক কবি তখন গ্রামোফোন কোম্পানীতে নতুন গান দেওয়া শুরু করেছেন এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ দু'একজন শিল্পীর কণ্ঠে তাঁর রচিত গান গীত হয়ে রচয়িতা হিসাবে পরিচিত হচ্ছেন। এহেন কবি কাজিদার সেই সব গানের খাতা

থেকে কবিতার বিষয়বস্তুই নয়, লাইনকে লাইন হুবহু নকল করে তার গানের ফাঁকে ফাঁকে চালাতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। সুরশিল্পী কমল দাশগুপ্ত একদিন কাজিদাকে বললেন, "কাজিদা আপনি এভাবে গানের খাতাগুলো এখানে রেখে বাড়ীতে যান, কিন্তু এমন কবিও এখানে উদয় হয়েছেন যারা আপনার এইসব খাতা থেকে কবিতার শুধু ভাবই নয় বরং লাইনকে লাইন তাদের রচনার ভেতর চালিয়ে যাচ্ছে।"

কাজিদা একথা শুনে প্রথমতঃ একটু গম্ভীর হলেন, তারপর তাঁর স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বলে উঠলেন, "আরে পাগল মহাসমুদ্র থেকে কয় কলসী আর নেবে?"

হিংসা বলে কোন পদার্থ তাঁর মনে ছিল না। গোলাম মোস্তফার সাথে কাজিদার ইডিয়লজিতে খুব তফাৎ। এই গোলাম মোস্তফা কাজিদার 'বিদ্রোহী' কবিতার সমালোচনা করে কবিতা লিখেছিলেন। অথচ বিহার্সেল রুমে যত দিনই কাজিদার সাথে দেখা হয়েছে তিনি আগেই দু'হাত বাড়িয়ে গোলাম মোস্তফাকে আলিংগন করেছেন। বস্তুতঃ ব্যক্তিগত জীবনে দু'জনের মধ্যে কোনদিন কোন মনোমালিন্য দেখি নি।

কাজিদার কাছে আমরা এই শিক্ষা লাভ করেছি। গিরীণ চক্রবর্তী একদিন স্পষ্টই আমাকে বলেছিল, "তোমার উপর আমার হিংসা হয়। দার্জিলিংয়ে প্রথম আমাদের বন্ধুত্ব। প্রায় একই সময়ে আমরা রেকর্ড জগতে প্রবেশ করি, কিন্তু তোমার কেনই বা এত নাম আর আমার কেন হল না।" আমি উত্তর দিয়েছিলেন, "কিন্তু ভাই আমার চাইতে তো কেষ্টবাবুর নাম, কই আমার তো কোনদিনও সেজন্য হিংসা হয় না।" এই সংগীত জগতে বেশীদিন হয়ত আমি টিকে থাকতে পারতাম না যদি না কাজিদার একদিনের একটা কথায় আমার চমক ভাঙত। রিহার্সেল-রুমের দোতালায় বসে আমি একদিন কৃষ্ণচন্দ্র দে'র একখানা কীর্তন গাইছিলাম 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু ওইখানে থাক গো'। কাজিদা কতক্ষণ হল দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন খেয়াল করিনি। আমি কিন্তু কেষ্টবাবুর 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি সংগীত ভেসে আসে', 'ফিরে চল ফিরে চল আপন ঘরে', 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে' এই গানগুলো খুব গাইতাম আর গাইতাম অবিকল কেষ্টবাবুর গলার স্বর নকল করে।

কাজিদাকে হঠাৎ দেখে গান থামিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। মৃণাল, ধীরেন দাস এরা কাজিদাকে দেখে হেসে বললেন, "দেখুন কাজিদা আব্বাস কি চমৎকার কৃষ্ণবাবুর নকল করেছে।" কাজিদারও খুব খুশী হবার কথা, কিন্তু তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, "আব্বাস, চোখ তোমার অন্ধ হয়নি বরং চশমা পর্যন্ত এখনও নেওনি। কাজেই সেদিক দিয়ে তুমি কানাকেষ্ট নও। তারপর ওঁর গলা নকল করে গান গাইলে জীবন ভরে তোমাকে এই অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়াতে হবে যে 'আব্বাস! ওঃ সে তো কেষ্টবাবুর নকল'। কাজেই কেষ্টবাবু কেষ্টবাবুই, ধীরেন দাস ধীরেন দাসই, মৃণাল মৃণালই আর আব্বাস আব্বাসই থাকবে। কখনো নিজের স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা যাকে বলে অরিজিন্যালিটি নষ্ট করবে না।"

সেদিন থেকে অন্যের কণ্ঠ নকল করে গাওয়ার অভ্যাস চিরদিনের মত ছেড়ে দিয়েছি।

একদিন কাজিদার বাসায় বসে আছি এমন সময় এক চীনাম্যান হকাব পাশ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে সিল্কের কাপড় চাই—। কাজিদার ইংগিতে তাকে ভেতরে নিয়ে আসা হল। এ-কাপড় সে-কাপড় দেখে তাঁর দুই পুত্রের জন্য কয়েক গজ সিল্ক কেনা হল। দাম যা চাইল তাই-ই দিয়ে দিলেন।

এর চার-পাঁচ দিন পরে আবার সেই চীনাম্যান হেঁকে যাচ্ছে কাজিদার বাসার পাশ দিয়ে। আজও তাকে ডাকা হল। চীনাম্যান কাজিদার কথামত সেদিনও সেই ধরনের কয়েক গজ সিল্কের কাপড় মেপে কেটে দিল। লক্ষ্য করলাম আজ দামটা যেন দেড়গুণ বেশী। অম্লান বদনে সেই টাকাটাই তিনি দিয়ে ফেললেন। আমি বললাম, "কাজিদা এই তো চার-পাঁচ দিন আগে খোকাদের জন্য এই কাপড়ই কিনলেন, সেদিন তো এর দাম দিয়েছিলেন—"। তিনি হেসে বললেন, "আরে দু'টো পয়সা লাভের জন্যই তো বেচারী অতবড় একটা কাপড়ের পাহাড় মাথায় করে বেড়ায়?"

মেগাফোন কোম্পানীতে আমি একদিন একটা ভাওয়াইয়া গানের কলি আওড়াচ্ছিলাম। কাজিদা কতক্ষণ ধরে যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন টের পাইনি। গান শেষ হয়ে গেলেই তিনি ঘরে ঢুকে বললেন, "গাও তো আব্বাস, আবার গাও।" আমি গানটা একবার গাইলাম। বললেন, "না, তুমি গেয়েই চল যতক্ষণ আমি থামতে না বলি।" চোখ বুঁজে গানটা বোধ হয় দশ-পনের মিনিট গেয়েছি, এবার তিনি বললেন, "আচ্ছা এবার এই গানটা গাও দেখি, ঠিক ঐ সুরে।" ওরি মধ্যে অবিকল সেই সুরে তাঁর গান লেখা হয়েছে। আমার গানের কলি ছিল—

'নদীর নাম সই কচুয়া
মাছ মারে মাছুয়া
মুই নারী দিচোং ছেকাপাড়া'—

কাজিদা লিখলেন—

'নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি
আমি যাব না আর অঞ্জনাতে
জল নিতে সখি লো
ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকী'।।

ভাওয়াইয়া গান শুনলেই কবি বড় চঞ্চল হয়ে উঠতেন। বহুদিন বলেছিলেন, "জানি না এগানের সুরে কী মায়া; আমার মন চলে যায় কোন্ পাহাড়িয়া দেশের সবুজ মাঠের আঁকাবাঁকা আলো প্রান্তিকে, উপপ্রান্তিকে।" এরপর তাঁর প্রসিদ্ধ একখানা গানে তিনি আমাকে ভাওয়াইয়া সুরই সংযোগ করতে বলেছিলেন। সে গান হচ্ছে, "কুঁচবরণ কন্যারে তার মেঘবরণ কেশ"।

গ্রামোফোন কোম্পানীতে একদিন সবাই বসে বেশ গুলতানী গল্প করছিলাম। এমন সময় কাজিদার প্রবেশ। তিনি বললেন, "দেখ হঠাৎ যদি আজ লটারীতে তোমারা এক লাখ টাকা পাও তাহলে তোমাদের বৌ বল প্রিয়া বল তাকে কী কী জিনিষ দিয়ে সাজাবে তোমরা?" এক একজন এক এক রকম বললে। কেউ বা ট্যাক্সি করে এম, বি সরকারের দোকানে গিয়ে হীরে জহরতের জড়োয়া সেট কিনবে বললে, কেউ বা ওয়াছেল মোল্লার দোকানের শাড়ির যত রকম ডিজাইন আছে সব কিনবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজিদা হারমোনিয়ামটা টেনে বলে উঠলেন, "শোন, আমি কী দিয়ে প্রিয়াকে সাজাতে চাই।" বলেই গান ধরলেন—

মোর প্রিয়া হবে এস রাণী দেব খোঁপায় তারার ফুল
কর্ণে দোলাব দ্বিতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল।
কণ্ঠে তোমার পরাব বালিকা
হংস-শাড়ীর দোলানো মালিকা
বিজলী জরির ফিতায় বাঁধিব মেঘ রং এলো চুল।।
জোছনার সাথে চন্দন দিয়ে মাখাব তোমার গায়
রামধনু হতে লাল রং ছানি আলতা পরাব পায়
আমার গানের সাত সুর দিয়া
তোমার বাসর রচিব প্রিয়া
তোমারে ঘিরিয়া গাহিবে আমার কবিতার বুলবুল।।

—গান শেষ হলে বললেন, "কী মহারথীর দল, ক'টাকা লাগল প্রিয়াকে সাজাতে?"

কাজিদার খাতায় একখানা গান দেখে বড় লোভ হল গানটা নেবার জন্য। বললাম, "কাজিদা, এ গানটা আমি রেকর্ড করতে চাই।" তিনি বললেন, "স্বচ্ছন্দে"। তখুনি গানটা আমাকে শিখিয়ে দিলেন। এর দু'দিন পরেই বিশেষ কোন কাজ উপলক্ষ্যে আমাকে দেশে যেতে হয়—সেখানে আটকা পড়ে থাকি প্রায় দু'মাস। ফিরে এসে কাজিদাকে বললাম, "দাদা, ওখানা গানের সুর তো তোলা হয়ে গেছে—রেকর্ডের অপর পৃষ্ঠার গানটা আজ শিখিয়ে দিন"। তিনি বললেন, "ওহো বড্ড ভুল হয়ে গেছে, গানটা জোর করে পদ্মরাণী চ্যাটার্জী নিয়ে রেকর্ড করে ফেলেছে।" কী আর বলব, দুঃখে চোখে পানি এল। বাজারে যখন সে রেকর্ড বের হল আমি গানের সুর শুনে কাজিদাকে বললাম, "কাজিদা এ গান যে জবাই করা হয়েছে।" তিনি বললেন, 'হ্যাঁ আমি তোমাকে যে সুর শিখিয়েছি মেয়েটা কিছুতেই সে সুর আয়ত্ত করতে পারলে না, কাজেই সহজ সুরই দিতে হল। জানি এ গানের এ সুর গানের বাণীকে রূপায়িত করতে পারে নি।" সে গান হচ্ছে 'যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায় তুমি করিবে প্রণাম'।

ইসলামী গানের যখন ভীষণ চাহিদা তখন কাজিদার বাসায় গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম। প্রথমে বাসায় যেতেই তাঁর এক চাকর 'হইরা' বা 'হরি' বলে উঠত—"নাই কাজি সাহেব বাসায় নাই।" প্রথম প্রথম ঐ কথা শুনে ফিরে আসতাম। একদিন যেই 'হইরা বলে উঠল—'নাই কাজি সাহেব বাসায় নাই' অমনি অন্যঘর থেকে ভেসে এল কাজিদার হাসির শব্দ। এরপরও গতানুগতিকভাবে একই উত্তর পেতাম হইরার কাছে; কিন্তু ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ বসলেই ঠিক দেখা পেতাম কাজিদার। পরে এক গূঢ় তত্ত্ব উদঘাটন করেছি। কাজিদাকে পাওনাদার প্রায়ই বিরক্ত করত। তাই চাকরের উপর এ নির্দেশই ছিল। কিন্তু সেই হাবাকান্ত এটাও বুঝতে পারে নি যে পাওনাদারের পর্যায়ে আমি নই। অবশ্যি আমার উপস্থিতিটা একজনের খুব মনঃপূত হত না এবং একথা আজ লিপিবদ্ধ করতে মনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছি না, তবু সত্যের খাতিরে লিখে যাচ্ছি। কাজিদার শাশুড়ী আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। কারণ ইসলামী গান কাজিদা লিখুন এটা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কী করে বুঝলাম সেই কথাটাই বলছি। একদিন আমি যে বাইরের ঘরে বসে আছি সেটা তিনি হয়ত ভিতর থেকে জানতেন না। সক্কালবেলা, কাজিদা আমার ইসলামী রেকর্ডের একখানা নেগেটিভ কপি বাজাচ্ছিলেন। তাঁর শাশুড়ী বাইরের ঘরের পাশ থেকেই বলে উঠলেন, "সক্কালবেলা নুরু আর গান পেল না—কী সব গান বাজান শুরু করে দিল।" আমাকে দেখলে হয়ত কাজিদাও লজ্জা পাবেন, তাই চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

কাজিদার লেখা ইসলামী গানগুলোর শতকরা ৯৫ ভাগই তাঁর নিজস্ব সুর সংযোগ করা। মাত্র অল্প ক'টি গান তিনি দিয়েছিলেন কমল দাশগুপ্ত আর চিত্ত রায়কে সুর করে আমাকে শিখিয়ে দেবার জন্য। ইসলামী গানে তিনি যে কী অপূর্ব সুরই সংযোগ করেছিলেন যাঁরা সুরজ্ঞ বা গানের সমঝদার তাঁরা একথা স্বীকার করবেনই।

স্বদেশী যুগে ধীরেন দাসের কণ্ঠে 'শঙ্খে শঙ্খে মংগল গাও' ইত্যাদি গান বিশেষ আদৃত হচ্ছে তখন। কাজিদা বললেন, "আব্বাস দু'খানা স্বদেশী গান গাইবে?" রাজী হলাম তখুনি। তিনি দু'খানা গান শিখিয়ে দিলেন। একখানা হচ্ছে 'ভোলো লাজ ভোলো গ্লানি জননী মুক্ত আলোকে জাগো', আর একখানা 'নম নম নম বাংলা দেশ মম চির মনোহর চির মধুর'। গান দু'খানার বাণী কি অপরূপ!

মৃণালকান্তি ঘোষ আর আমি দু'জনে মিলে কাজিদার দু'খানা গান রেকর্ড করি। ঢাকায় যখন সাম্প্রদায়িক দাংগা বাঁধে কাজিদা তখুনি এ গান লিখে দিয়েছিলেন—"ভারতের দুই নয়নতারা হিন্দু মুসলমান", আর একখানা 'হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই'।

একবার দার্জিলিংয়ে কাজিদার সাথে দেখা। তিনি বললেন, "আব্বাস, রবীন্দ্রনাথ (তিনি বলতেন গুরুদেব) এসেছেন এখানে, চল দেখা করতে যাই।' আমি বললাম, "চলুন।" একদল যুবক চলেছি। ম্যল-এর কাছে এসে আমি চট করে অন্য পথ ধরে একদম হাওয়া হয়ে গেলাম। পরদিন কাজিদা আমাকে খুব গালাগালি করে বললেন, "দেখ আমি গুরুদেবকে প্রণাম করেই বলে উঠেছি—গুরুদেব আজ একটি ছেলের অপূর্ব কণ্ঠ শোনাব আপনাকে, তারপর হাতড়ে দেখি তুমি একদম নাই। কি আশ্চর্য!"

কলকাতায় আরো দু'বার আমাকে কাজিদা কবিগুরুর কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যাইনি কেন তাই বলছি।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে তখন আমি রেকর্ডিং এক্সপার্টের কাজ করি। বাড়ী যাব বলে কয় দিনের ছুটী নিয়েছি। সেই রাতেই দার্জিলিং মেইলে রওনা হব। অফিসে এসে দেখি সবাই উম্মনা। কি হবে কি হবে, রবি ঠাকুর বুঝি আজ ....!! কিছুক্ষণের মধ্যেই সাড়া পড়ে গেল, রবি-রশ্মি চিরতরে নির্বাপিত। অফিসের সব লোক ছুটছে ঠাকুর-বাড়ীর দিকে। গিয়ে দেখি জন-সমুদ্র। কার সাধ্য ভিতরে ঢোকে? তিন চার ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আবার ফিরে এলাম অফিসের দিকে। অফিস একদম জনমানবশূন্য। কে একজন বললে, "তোমাকে টেলিফোনে ডাকছে।" ধরলাম ফোনটা। কলকাতা রেডিওর ষ্টেশন ডিরেক্টর নৃপেন মজুমদার বলছেন,' "আব্বাস এক বার রেডিও অফিসে এসো। সবাই রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে গান দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন, তুমিও এসো।" আমি কেমন যেন তখন উম্মনা। আমার ভিতরে কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। রবীন্দ্রনাথ আমার অন্তর জুড়ে বসেছিলেন, তিনি নেই একথাটা যেন ভাবতেই পারছি না। লালদীঘির ঘাটে কতক্ষণ বসেছিলাম মনে নেই। প্রায় ছ'টার সময় রেডিও অফিসের দিকে এগিয়ে গেলাম। এক এক জন শিল্পী গাইছেন আর গানের শেষে চোখ মুছতে মুছতে ষ্টুডিও থেকে বেরিয়ে আসছেন। আমাকে গাইতে বলা হল, গাইলাম, "ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে, বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে আঁচলখানি দোলে।' প্রায় দশমিনিট ধরে গাইলাম। জানি না প্রকৃতির এই শান্ত সমাহিত ভাবাবেশ কেন সেই মুহূর্তে অশান্ত হয়ে উঠেছিল। ওদিকে যখন রবীন্দ্রনাথকে চিতায় তোলা হয়েছে, এদিকে তখন চলেছে আমার বরষার গান, আর ঠিক সেই মুহূর্তটিকে আকাশও অশ্রুসম্বরণ করতে পারে নি। এসেছিল এক ঝাঁক বৃষ্টি অশ্রুধারা রূপে। নৃপেনদা সমস্ত আর্টিষ্টকে জানিয়েছিলেন এই স্বতঃস্ফূর্ত আত্ম-নিবেদনের জন্য ধন্যবাদ। আমাকে বলেছিলেন, "আব্বাস, তুমিই কিন্তু হার মানিয়েছ সবাইকে। ধরেছ বর্ষার গান। মেঘশূন্য আকাশ। বৃষ্টি হল ঠিক সেই সময়টাতে যখন চলছে তোমার গান আর গুরুদেবের দেহ ঠিক চিতার উপরে।"

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে কাজিদা বড় ভালো গান লিখলেন একখানা। গাইল সেখানা যূথিকা রায়! কাজিদা দুঃখ করে বললেন, "আব্বাস, কতদিন তোমাকে বলেছিলাম গুরুদেবের কাছে চল, গেলে না, জীবনে এ আফশোষ আর যাবে না।" আমি বললাম, "কাজিদা একটা গল্প শুনবেন? আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে ময়মনসিংহ গিয়েছিলাম মহাত্মা গান্ধীকে দেখবার জন্য। তিনদিন অঝোর ধারায় বৃষ্টি। পচা এক হোটেলে খাই আর সারা রাত মশার জ্বালায় ছটফট করি। তিনদিনের পর বৃষ্টি থামল, মহারাজ শশীকান্ত আচার্যের বাগান-বাড়ীতে মহাত্মা বিকাল চারটায় দর্শন দেবেন। বেলা দুটোয় গিয়ে মঞ্চের কাছাকাছি আসন নিলাম। মানে দাঁড়িয়ে রইলাম। অতঃপর যেদিকে চাই শুধু লোক আর লোক। ভাবছি এই লোক-পারাবার পার হয়ে বের হব কি করে? যাক্ গোটা পাঁচেকের সময় মহাত্মার আবির্ভাব হল। মুণ্ডিত মস্তকই মনে হল। কৌপিন পরিহিত, আবক্ষ উন্মুক্ত। এই-ই মহাত্মা গান্ধী!! ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'চরকা কাটো, খদ্দর পিন্‌হো, বারিষ হো রহি হ্যায়, ঘর যাও'।"

ঘরে মানে হোটেলে এলাম। এসে পুঁটলি নিয়ে সোজা ষ্টেশনে এবং ঘর মুখো টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসলাম।

"বিশ্বাস করবেন কাজিদা, সারাটা পথ কি বিরাট আলোড়ন মনের মধ্যে? প্রতিজ্ঞা করতে লাগলাম জীবনে বিরাট ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনীষীকে আর সান্নিধ্যে এসে দেখব না। তাই আমার ধ্যানের কবিগুরুকে ধ্যানের রাজ্যেই রেখেছি। আমার রবীন্দ্রনাথ সুনীল আকাশের গায়ে রজত-শুভ্র মেঘের সিংহাসনে বসে অবিরাম লিখে চলেছেন, কাশপালকের শুভ্র লেখনি দিয়ে মহাকালের শুভ্র খাঁতায়। দুগ্ধফেননিভ ঝরণার জলের স্রোতের মত নেমে আসছে সেই কবিতার কলকাকলি নৃত্যের ছন্দে অবিরাম। মর্তের মুগ্ধ শিষ্য আমি; দু'হাত ভরে অঞ্জলী পুরে সেই কবিতার মদিরা পান করে বুঁদ হয়ে আছি। মহাত্মা গান্ধী সন্দর্শনে ধ্যান আমার ভেঙে গিয়েছিল। কল্পলোকের রবীন্দ্রনাথকে তাই আমার কল্পলোকেই রেখেছি।"

কাজিদা বললেন, "বড় চমৎকার, কিন্তু আব্বাস রবীন্দ্র-দর্শনে তোমার সে ধ্যান ভাঙত না। অমন সুপুরুষ ......।" আমি বাধা দিয়ে বললাম, "কাজিদা রবীন্দ্রনাথের ফটোও তো দেখি, বাস্তবের রবীন্দ্রনাথের চাইতেও আমার অশরীরী রবীন্দ্রনাথ কত সুন্দর, এ আপনাকে বোঝাই কি করে? জানেন কাজিদা, 'দেবদাস' বই দেখে আমি কি কান্নাটাই কেঁদেছি। আমার কল্পনার পারুল কি এই মর্তবাসিনী যমুনা? না না কাজিদা—

'সে কেন দিলরে দেখা
না দেখা ছিল যে ভালো।'

যুদ্ধের বাজারে ভারত সরকার থেকে একটা ডিপার্টমেণ্ট খোলা হল—সং পাবলিসিটি অর্গানাইজেশন। কলকাতায় বোমা পড়ার আতংকে তখন অনেকেই পলায়ন-তৎপর। বাঙালীর এই গুণের সদ্ব্যবহার করতে আমিই বা পশ্চাৎপদ হব কেন? পনের দিনের ছুটী নিয়ে বাড়ী গেলাম। ছুটীর পর ছুটী অর্থাৎ দরখাস্ত দিয়ে দিয়ে প্রায় তিন মাস বাড়ীতে কাটিয়ে কলকাতা ফিরে এলাম ভয়ে ভয়ে। চাকুরী আমার আছে, মিঃ আবু হেনা তখন পাবলিসিটির ডিরেক্টর। তিনি তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বেশ বকুনি দিয়ে বললেন, "যুদ্ধের ভয়ে দেশে গিয়ে লুকিয়ে আছেন আর এদিকে যে আপনার জন্য একটা চাকুরী নিয়ে বসে আছি। এই দেখুন ফাইল। সং পাবলিসিটি অর্গানাইজার, আর একজন অতিরিক্ত অর্গনাইজার নেয়া হবে। আমি ঠিক করে রেখেছি কাজি নজরুল ইসলাম আর আপনাকে যথাক্রমে পোষ্ট দুটো দেব। আপনি কাজিকে একবার অফিসে নিয়ে আসুন।"

তখুনি ছুটলাম কাজীদার বাড়ীতে। আমি দেশে যাওয়ার আগে শুনেছিলাম যে 'নবযুগ' অফিসে তিনি হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু এই অসুস্থতার জের যে তিনি তখনো টেনে চলেছেন সেটা ধারণাও করতে পারি নি। আমি জানতাম সাংসারিক অর্থকৃচ্ছতার জন্য তিনি খুবই মনমরা হয়ে থাকতেন ; কিন্তু চিরবিদ্রোহী বীরের কাছে সরকারী চাকুরীর কথা কি করে প্রস্তাব করব সেই সমস্যায় দিশেহারা হয়ে তাঁর সামনে বসে ভাবছি। তিনি বেশী কথা বলছেন না, হাতে একখানা রুমাল। লোকজন সামনে এলে ঘন ঘন সেই রুমালে

মুখ মোছেন, অন্য সময় নাকি ঘরের দেয়াল, মেঝে থুথু দিয়ে ভরিয়ে ফেলেন। শুনেছিলাম একটু মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। সেটা প্রমাণ পেলাম যখন তাঁকে বললাম, "কাজিদা, 'নবযুগ' আর কত টাকা দেয় আপনাকে, তা ছাড়া খবরের কাগজ তো আজ আছে কাল নেই। আচ্ছা যদি ধরুন এই পাঁচশ' টাকা মাইনের একটা সরকারী চাকুরী হয় আপনি করতে রাজী আছেন?" তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠল কি আনন্দোচ্ছল ভাব, যেন দেখতে পেলেন চোখের সামনে পাঁচশ' টাকা। আমার হাতটা তিনি চেপে ধরলেন, মুখচোরা সেই সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে তিনি সমর্থন জানালেন এ প্রস্তাবকে। কাজিদার বড় ছেলে সানি সামনে দাঁড়িয়ে। বললাম, "আসছে কাল অমি ঠিক দশটার সময় এসে এঁকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাব, তোমরা কাজিদাকে সাজিয়ে রাখবে।"

পাশের ঘরে এলাম—সানির মা আমাকে বললেন, "আব্বাস চাকুরী ওঁর হবে?" আমি তখন কোন সুদূরে—হায়, এই কাজিদা, যাঁর হাতে ছিল বিষের বাঁশী, যিনি বীণাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন অগ্নিবীণা, ইংরেজের পরাধীনতার শিকল ভেঙে যে নির্ভীক সেনানী সারা বাংলার তরুণদের হাইদরী হাঁকে ডেকে গেছেন—দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারবার পার হয়ে অমৃতের দ্বারে পৌঁছুবার জন্য, যে বীর দেশের মুক্তির জন্য প্রথম পথ প্রদর্শন করেছেন দীর্ঘ ৪৫ দিন কারাগারে অনশন-ব্রত উদ্‌যাপন করে—পায়ের বেড়ী, হাতের নির্মম শিকলকে যে শিল্পী নূপুরের মত মনে করে গেয়েছেন শিকলপরার গান, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, শহর থেকে উপপ্রান্তিকে যে চারণ গেয়ে ফিরেছেন চরকার গান, সেই কবি কিনা দাসখতে নাম লেখাতে বলায় তিলমাত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন না, একি সত্যি মস্তিষ্ক বিকৃতি নয়?

ভাবী বলে উঠলেন, "আব্বাস কাল তো তুমি নিতে আসবে ওকে, কিন্তু ও তো বেশী কথা বলতে পারে না।" আমার যেন চমক ভেঙে গেল। আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কি বললেন ভাবী?" ভাবীর চোখে পানি এল। চোখ মুছে বললেন, "জানি ভাই ওঁকে চাকুরী করতে হবে এই কথাটাই ভাবছিলে, কেমন?" আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "ভাবী দুনিয়ায় মানুষ অবস্থার দাস। কিছুই ভাববেন না। কাজিদার শারীরিক অসুস্থতার মূলই তো হচ্ছে সাংসারিক অভাব অভিযোগ। দেশের জন্য তিনি এত করেছেন, কিন্তু দেশ যখন এগিয়ে এল না, তখন যেমন করেই হোক টাকা তাঁকে রোজগার করতেই হবে। তবে ওঁকে এক মুহূর্তও খাটতে দেব না, ওঁর সহকারী হব আমি।" একথায় তিনি যেন আশ্বস্ত হলেন। আবার সেই প্রথম কথাই বললেন, "উনি তো বেশী কথা বলেন না। ইন্টারভিউতে —।" আমি বাধা দিয়ে বললাম, "ইনটারভিউ কিছুই নয়। আমার সাথে উনি থাকবেন, যা বলবার আমিই বলব।"

পরদিন ওঁকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে নিয়ে এলাম। হেনা সাহেব কাজিদাকে দেখে চেয়ার থেকে উঠে এসে অতি সম্মানে তসলিম করে তাঁকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। কাজিদার মুখে রুমাল, কারণ সেই রুমালে ঘন ঘন থুথু ফেলতে হয়, ইশারায় বললেন, "পানি খাব।" তখুনি তাঁকে পানি দেওয়া হল। ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল। পরম আনন্দে চা পান করছেন। হেনা সাহেব ওঁকে বললেন, "কাজি সাহেব পারবেন তো কাজ করতে?"

মাথা দুলিয়ে তিনি বললেন, "হাঁ," আর আমার দিকে আংগুল দেখিয়ে বললেন, "ও।" হেনা সাহেব হেসে বললেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই আব্বাস সাহেবই আপনার সহকারী হবেন। ছুটোছুটি এটা ওটা সবি উনি করবেন, আপনি শুধু আমাদের ফরমাস মত দুটো গান, কবিতা লিখবেন, ব্যস।"

হয়তো চাকুরীটা হলে তাঁর অভাব ঘুচত, সাময়িক মস্তিষ্কবিকৃতি হয়ত কেটে যেতে পারত, কিন্তু মানুষ ভাবে এক খোদা করেন আরেক। পুলিনবিহারী মল্লিক তখন প্রচার দফতরের মন্ত্রী। জানি না কি করে কাজিদার এই সামান্যতম অসুস্থতার খবরটি তাঁর কর্ণমূলে প্রবেশ করে। তাঁর স্বজনকে এই স্থলাভিষিক্ত করা যায় কি করে এই নিয়ে তাঁর জল্পনাকল্পনা চলল। হেনা সাহেবের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলল। যে চাকুরীতে বিনা দ্বিধায় কাজিদা ও আমাকে বসিয়ে দেবার কথা সেখানে পোষ্ট দুটোর জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। বলাই বাহুল্য কাজিদাকে ইন্টারভিউ-বোর্ডের সামনে উপস্থিত করা মানে ঐ কবি-প্রতিভার চূড়ান্ত অপমান। কাজিদার বাসায় গিয়ে ভাবীকে বললাম মন্ত্রীর চক্রান্তের কথা। তিনি বললেন, "না চাকুরীর জন্য দরখাস্ত দেওয়া হতেই পারে না। তুমি ঠিকই বলেছ।"

আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা দরখাস্ত করলাম। বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ দরখাস্ত করেছেন ইন্টারভিউয়ের দিনে দেখলাম। একে একে কুড়ি-পাঁচিশ জন ইন্টারভিউ দিলাম। চাকুরী আর আমার হবে না জানি তবু ইন্টারভিউতে ভালো করলাম মনে হল। ফল বের হল। মন্ত্রীর প্রার্থী সুরেশবাবু প্রথম, জসিম দ্বিতীয়, আর আমি তৃতীয় নমিনেশন পেলাম।

।। নানা জনের টুকরো স্মৃতি ।।

জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সে চা-বাগানে একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক বন্ধুর বাসায় হেমন্ত মুখার্জির প্রথম গাওয়া একখানা রেকর্ড শুনি। অতি চমৎকার লাগল।

একদিন কলকাতা রেডিও ষ্টেশনে বন্ধুবান্ধবের সাথে গল্প করছি। হঠাৎ বলে উঠলাম, "হেমন্ত নামে একটি ছেলের একখানা রেকর্ড বেরিয়েছে, তোমরা শুনেছ?" একজন বলে উঠল, "ঐ তো হেমন্ত বসে আছে, আজ রেডিওতে অডিসন দেবে।" ছেলেটিকে কাছে ডাকলাম। বললাম, "একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো?" ছেলেটি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি সবাইকে লক্ষ্য করে বলে উঠলাম, "তোমরা দেখে নিও এই ছেলেটি একদিন বাংলাদেশ, শুধু বাংলাদেশ কেন সারা ভারতের মধ্যে সব চাইতে জনপ্রিয় গায়ক হবে।" এই কথা শোনা মাত্র ছেলেটি আমার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলে উঠল, "আশীর্বাদ করবেন।" আমি বললাম, "অপূর্ব শিল্পী-সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তোমার মধ্যে। আর কেউ দেখুক বা না দেখুক আমি দিব্যচোখে দেখতে পারছি।" পরবর্তীকালে আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে।

আর একটি শিল্পী আমাকে বড়ই মুগ্ধ করেছে। তিনি হচ্ছেন কুমার শচীনদেব বর্মণ। জানি না তাঁর কণ্ঠে কী যাদু লুকানো আছে, ওঁর গান শুনলেই আমি যেন কোন্ দেশে চলে যেতাম। একবার শচীনদেব বর্মণের সাথে দিনাজপুর শহরে একটা বৈঠকে গান গাইতে যাই। দু'-দিন একসাথে একই ঘরে ছিলাম। এমন মিষ্টি ব্যবহার খুব কম দেখেছি। আমার ভাওয়াইয়া গান শুনে ভদ্রলোক পাগল। একটা গানের কলি দিনে পঞ্চাশবার বলতেন আমাকে আওড়াবার জন্যে। "হলো না আব্বাস ভাই, ঐ যে ঐ জায়গাটায় কী করে গলাটা ভাঙলেন? হলো না আমার, আর একবার—প্লিজ!" এমনি করে গোসল করার সময়, ঘুমুবার আগে, বেড়াতে গিয়েছি সেখানেও, "গান আর একবার আব্বাস ভাই ও মোর কালারে কালা!" গান শেখার কী আন্তরিকতা আর শিল্পীর জন্য কী প্রশংসা, কী দরদ যে তাঁর অন্তরে জমা করে রেখেছেন! সে সময়কার তাঁর গাওয়া 'যদি দখিনা পবন আসিয়া ফিরে গো দ্বারে', 'এই মহুয়া বনে মনের হরিণ হারিয়ে গেছে', 'কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া', 'গোধূলির ছায়াপথে', 'পদ্মার ঢেউ রে' ইত্যাদি গান সংগীত-জগতে এক যুগান্ত সৃষ্টি করেছিল। এককথায় তিনি বাংলা গানের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-সংগীতে পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত, সীতা দেবী এঁরাই তখনকার দিনে নাম কিনেছিলেন বেশী। শুধু তাই নয়, আমার মনে হয় রবীন্দ্র-সংগীত প্রচারের জন্যও এঁদেরই কৃতিত্ব ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে।

রাইচাঁদ বড়াল এককালে কলকাতা রেডিওতে তবলা বাজাতেন। বড়লোকের ছেলে, এই তবলা বাজানোর জন্য টাকা-পয়সা নিতেন কিনা জানি না। অমন দিব্যকান্তি এবং নিত্য পরিষ্কার পরিপাটী সাজে আর কাউকে নজরে পড়ত না। ব্যবহারও তাঁর বড় মধুর। আমরা তখন কী আর এমন গাইতাম, বেশী জোর দাদ্‌রা কাহারবা তালে ;কিন্তু আমার সাথে তিনি বহুদিন তবলা নিয়ে বসতেন। তিনি বলতেন, "গলাটি বেশ মিষ্টি, গান শুনবার জন্যই তবলা ধরেছি।" পরবর্তীকালে নিউ থিয়েটার্সে সংগীত পরিচালকরূপে ইনি ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন।

যখন ভবানীপুরে থাকতাম তখন অনিল বিশ্বাসের সাথে পরিচয়। দিনরাত গান সাধত। ক্ল্যাসিকাল গানই গাইত বেশী। হঠাৎ শুনলাম থিয়েটারে যোগ দিয়েছে সে। তারপর অকস্মাৎ একদিন শুনি বম্বে চলে গেছে। বাঙালী ছেলেদের মধ্যে সেই বোধ হয় সংগীত পরিচালকরূপে বম্বেতে বেশী যশ ও অর্থ উপার্জন করে। উত্তরবংগ প্লাবনের সময় অনিল বিশ্বাসও আমাদের সাথে কলকাতা চক্রবেড়ে নর্থ থেকে হারমোনিয়াম গলায় বেঁধে 'ভিক্ষা দাওগো পুরবাসী' গাইতে গাইতে সারা দক্ষিণ কলকাতা প্রদক্ষিণ করে।

গ্রামোফোন কোম্পানীতে একসাথে উনিশ-কুড়ি বছর কাটালাম যাদের সাথে তাদের কারুর কথাই ভুলিনি। এই শিল্পী-গোষ্ঠীর মধ্যে এমন একটা অন্তরংগতা গড়ে উঠেছিল যে কারো রেকর্ডের জন্য রিহার্সেল না থাকলেও সেই রাজেন, সেই টোপা, সেই পরিতোষ,

সেই কমল এদের সাথে দেখা করবার জন্যও দু'একদিন পরে পরেই রিহার্সেল-রুমে গিয়ে আড্ডা জমাতাম। সেই রিহার্সেল-ঘরের প্রকাণ্ড বাড়ীটায় একজন দ্বারোয়ান ছিল। সে শিল্পীদের জন্য চা পান সিগারেট আনিয়ে দিত, তা ছাড়া রেকর্ডিংয়ের দিনে দমদমে যাবার সময় জলযোগের জন্য যাবতীয় মিষ্টান্ন, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি মোটরে উঠিয়ে দিয়ে সেও আমাদের সাথে দমদম যেত। উড়িষ্যা দেশের অধিবাসী পঞ্চাশ বছরের এই বৃদ্ধ 'দশরথ' ছিল বহু দুঃস্থ শিল্পীর গোপন সাহায্যদাতা। "দশরথ পাঁচটা টাকা দেবে?" ব্যস, তক্ষুণি সে দিল পাঁচ টাকা, অবশ্যি ধার হিসেবে। কী সুন্দর হাসিখুশী ব্যবহার! দশরথকে চেনে না এমন শিল্পী কলকাতায় খুবই বিরল। কারো হয়ত রেকর্ডের পারিশ্রমিক কিছু বেড়েছে, কারো হয়ত রেকর্ড ভালো বিক্রি হচ্ছে, দশরথ সে খবরটি শিল্পীকে ঠিক সবার আগে জানিয়ে দিল। সব খবর সে কী করে রাখত আশ্চর্য ব্যাপার! দশরথের একটী পোষা ময়না ছিল। বাইরে থেকে কেউ যদি ডাকত—'দশরথ', অমনি পাখীটাও ডেকে উঠত 'দশরথ'। শুধু তাই নয়, পরিষ্কারভাবে পাখীটাও বলত, 'দশরথ দমদম গেছে'।

কলকাতায় তখন রক্তক্ষয়ী দাংগা। বউবাজারের স্যাভয় হোটেল থেকে বেনিয়াপুকুর লেনে বাসায় এসেছি। স্যাভয় হোটেলে আমার রুমে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় কাগজপত্র ছিল। দাংগা তখনো পুরোদমে চলছে। কবি-বন্ধু আজিজুর রহমানকে বললাম, "স্যাভয় হোটেলে আমার রুমে কতকগুলো দরকারী কাগজ-পত্র আছে, কী করে আনা যায়?" তিনি বলে উঠলেন, "বেশ তো আমি নিয়ে আসব আজ।" আমি মনে করেছিলাম এ একটা বাত্ কি বাত্ বললেন তিনি। কিন্তু ঠিক সেই দিনই বিকেলে তিনি আমার কাগজপত্রগুলো নিয়ে এসে হাজির। আমি একটু বিস্মিত হলাম। তিনি যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে বলে উঠলেন, "এই গেলাম আর আপনার রুম খুলে জিনিষগুলো নিয়ে এলাম, ব্যস।"

কিন্তু এতদিন পরে জানতে পারলাম কী অসীম সাহসিকতার কাজ করেছেন তিনি। এক হিন্দু বন্ধুর মোটরে চড়ে তিনি বউবাজারে গিয়ে পৌঁছুলেন। মোটর থেকে নামার সংগে সংগে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর পরিচিত দু'চারজন লোকের সাথে দেখা। তারা কবির দিকে শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করেই সরে পড়ল। কবিকে সংগে নিয়ে মোটর থেকে তাঁর হিন্দু বন্ধুটি তাঁকে সোজা স্যাভয় হোটেলে নিয়ে গেলেন। ম্যানেজার তাঁকে চিনতে পেরেই মহা উৎকণ্ঠায় চাপা কণ্ঠে বলে উঠলেন, "কী সর্বনাশ করেছেন কবি, কেন, কেন আপনি এলেন?" কবির হিন্দু বন্ধুটি বলে উঠলেন, "কোন কথা নয়, চলুন সোজা শিল্পীর ঘরে।" খটখট শব্দে কবি আমার রুদ্ধকক্ষের দ্বার খুলে আমার নির্দেশমত কাগজপত্র নিয়ে তাঁর বন্ধুর সাথে নীচে নেমে এলেন। ইতিমধ্যে স্যাভয় হোটেলের বহির্দেশ লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। তাঁর বন্ধুর দুইই হাতে দুই পিস্তল। বন্ধু বলে চলেছেন, "সাবধান, আন্দামান-ফেরৎ নৃপেন সেন আমি। যদি এগুবেন তবে বুঝতেই পারবেন।" শাঁ করে মোটরে উঠে মোটর ষ্টার্ট দিয়ে রওনা। পিছনে রক্তপিপাসু নরখাদকের শত চক্ষু জিঘাংসায় চকচক করে উঠল।

কবি-বন্ধুর জীবনে সেদিন এতবড় দুর্যোগ নেমে এসেছিল, এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি। এ গল্প করলেন তিনি এই সেদিন, অর্থাৎ ১৯৫৮ সনের মার্চ মাসে। কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরে উঠল।

কলকাতায় কড়েয়া রোডে থাকি। পনের ষোল বছরের একটি সুদর্শন যুবক আমার বাসায় এল। আমাকে বললে, "আমি গান শিখতে চাই, একটা উপায় বাতলে দিতে পারেন?" বললাম, "গাও দেখি একখানা গান।" হারমোনিয়াম বাজিয়ে ছেলেটি সুন্দর একখানা রবীন্দ্র-সংগীত শোনালে আমাকে। আমি লক্ষ্য করলাম এর কণ্ঠে রবীন্দ্র-সংগীতেরই ভাব এবং আবেদন চমৎকার ফুটে উঠবে। বললাম, "তোমার যদি সত্যি গান শেখার ইচ্ছা থাকে এবং পরিণামে শিল্পীজগতে নিজের একটা বিশিষ্ট আসন প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প মনে জেগে থাকে তা হলে তুমি কলকাতা ছেড়ে সোজা চলে যাও শান্তিনিকতনে—সেখানে গিয়ে একাগ্রচিত্তে রবীন্দ্র-সংগীত শেখো।" আমার এ-কথা সে সত্যি কার্যে পরিণত করেছিল এবং বেশ কয়েক বছর শান্তিনিকতনে কাটিয়ে কলকাতায় এসে অল্পদিনের মধ্যেই রবীন্দ্র-সংগীতের ট্রেইনার, চিত্রজগতে সুর-শিল্পী হিসেবেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রেডিও পাকিস্তানে সুরশিল্পী হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়েই বিরাজ করছে এখনো—এঁর নাম আবদুল আহাদ।

কড়েয়া রোডে থাকতেই আর একটি বারো তের বছরের ছেলের সাথে পথে একদিন আলাপ হল। খোকা বললে, "এই তো আমাদের বাসা, চলুন না।" বাসায় গেলাম, পরিচয় পেলাম সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আবু লোহানীর ছেলে। ওর একটি ছোট বোন আছে, বয়স হবে সাত আট বছরের। খুকী সুন্দর গান গাইল, আর খোকাটি আবৃত্তি করল অতি চমৎকার। আবৃত্তি শুনেই মনে হল এর ভেতরেও লুকিয়ে আছে অপূর্ব শিল্পী-সম্ভাবনা। বললাম, "খোকা পড়াশুনোর সাথে সাথে এই আবৃত্তি করাটা কিন্তু ছাড়বে না।" লক্ষ্য করলাম দু'টি ভাইবোন কি মিল! ওদের ভাইবোনের মিঠে ঝগড়া, মান, অভিমান, রাগ, আদর এত সুন্দর লাগত যে প্রায়ই ওদের দেখতে যেতাম।... বড় হয়ে এই ছেলে কলকাতায় চিত্রজগতে অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েছিল, কলকাতায় দাংগা শুরু হওয়ায় সে বাসনা সে চরিতার্থ করতে পারে নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রেডিওতে কাজ পেল। বাংলায় খবর বলত খুব সুন্দর করে। করাচী থেকে সুযোগ পেয়ে গেল বিলাতে বি, বি, সি-তে। পাঁচ ছ'বছর সেখানে কাটিয়ে এল পূর্ব পাকিস্তানে। চিত্রশিল্প গড়ে উঠছে, ইতিমধ্যেই সে দু'তিনখানা ছবি পরিচালনা করবার ভার পেয়েছে। চির হাসিখুশী, মিষ্টি ব্যবহার এই ছেলেটি, বর্তমানে যুবকের নাম—ফতেহ্ লোহানী।

রাণাঘাটে এলাম একটা গানের জলসায়। সিনেমা হল জনাকীর্ণ। প্রোগ্রামের মাঝখানে একটি তরুণ ছেলে ভারী মিষ্টি সুরে গান গাইল। কেন যেন মনে হল ছেলেটির মাঝে

লুকিয়ে রয়েছে শিল্পী সম্ভাবনা। জলসাশেষে ছেলেটির খোঁজ করলাম। রেলওয়ে কলোনীতে আমাদের রাত্রি প্রবাসের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেখানে ছেলেটি এল। গান গাইতে বললাম। অপূর্ব মিষ্টি কণ্ঠ। গলা সূক্ষ্ম কাজে ভর্তি। ঠিকানা দিলাম কলকাতায় গিয়ে আমার সাথে দেখা করার জন্য। নির্দিষ্ট দিনে ছেলেটি গিয়ে হাজির হল। আমি তখন সং পাবলিসিটিতে কাজ করি। ছেলেটিকে চাকুরী দিলাম আমার অধীনে। তার অমায়িক ব্যবহারে বড়ই প্রীত হলাম। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে সে শিল্পীজগতে তার নিজস্ব আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে। সে হচ্ছে সোহ্‌রাব হোসেন।

পার্কসার্কাস—কলকাতা। রাস্তাটার নাম মনে পড়ছে না। সকালবেলা সেই পথ দিয়ে চলেছি। এক সৌম্যদর্শন যুবক আমার সামনে এসে বললেন, "কিছু মনে করবেন না, একটু দয়া করে এই, এই পাশের বাসায় আসবেন?" আমি বললাম, "কি দরকার বলুন তো?" তিনি বললেন, 'আপনাকে দেখবার খুব সখ ছিল, কাল ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটে আপনার গান শুনেছি। আপনি আব্বাসউদ্দীন না?"

—"হ্যাঁ।"

তাঁর সাথে সাথে এক বাসায় গেলাম। দরজায় নাম-প্লেট ঝুলছে—ডাঃ কুদরতে খুদা। আমি বললাম, "এ বাসা ডক্টর সাহেবের?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তিনি উপরের ফ্ল্যাটে থাকেন, আর আমি—আসুন—এই যে নীচের ফ্ল্যাটে—।" ঘরে ঢুকলাম। সারা ঘরটায় অজস্র ছবি টাঙানো। বললাম, "আমাকে তো চিনেইছেন, এবার দয়া করে আপনার পরিচয়টা—।" তিনি বললেন, "আমার পরিচয় এমন কিছুই নেই, তবে ছবি আঁকি—জয়নুল আবেদীন।" একদম তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। কী সুপ্রভাত, কী সৌভাগ্য আমার, আমিও যে কতদিন থেকে দুনিয়ার দুঃস্থ মানবতাকে মহীয়ান করেছে যাঁর সার্থক তুলি তাঁকে দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আজ সে বাসনা আমার পূর্ণ হবে একি ভাবতে পেরেছি? আলাপ হয়ে সত্যি মুগ্ধ হলাম, এমন নিরহংকারী মাটীর মত মানুষের পক্ষেই সম্ভব দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকা।

নলিনী সরকার হাসির গানের রাজা। কলকাতা কর্পোরেশনের এক লেডি কাউন্সিলরের বাসায় গানের জলসা। কাজিদা, নলিনী সরকার আর আমাকে নিয়েই এই জলসার আয়োজন। কাজিদা হারমোনিয়াম ধরেছেন—ছাড়তে চান না—গানের পর গান গেয়েই চলেছেন। এক ঘণ্টার ভেতর চার পাঁচ কাপ চায়ের পেয়ালা কাজিদার মুখের পানে চেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ পেয়ালা চা সামনে রাখা হল। নলিনীদা বলে উঠলেন, "কাজি তোমার গানের গরম সমঝদার আর এক পেয়ালা সামনে হাজির। একেও কি একটু ঠোঁট দিয়ে সোহাগ দেখাবে না?" যেই কাজিদা চায়ের কাপ হাতে নিয়েছেন অমনি নলিনীদা হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে গান জুড়ে দিলেন। তিনি কাজিদার ওপর আর এক কাঠি। দেড়ঘণ্টা ধরে আমাদের নাড়ীভুড়ি কতখানি শক্ত তার পরখ করলেন। এই হাসির গানের পর কি আর

গান জমে? কিন্তু আমার গানের সুর কাউন্সিলরের সাজানো প্রকোষ্ঠে এনে দিল ভরা নদীর বাঁকে কাশের বনের ওপরকার বাউরী বাতাস। সেই ভিজে মিঠে হাওয়ায় নিজ নিজ গাঁয়ের বাড়ীর হারিয়ে-যাওয়া শৈশবের স্মৃতি ফিরিয়ে এনে এক একজন দেখছি অশ্রুসজলনেত্রে এ ওর পানে চাইছে। আমি পাঁচ ছ'খানা গান গেয়ে নলিনীদার দিকে হারমোনিয়ামটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, "নলিনীদা, এবার মধুরেণ সমাপয়েৎ।" তিনি ধরলেন, "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।"

এরপর খাবার ঠাঁই করা হল। 'মহাভোজ্যং মে সমুপস্থিতম' বলে নলিনীদা প্রবল বিক্রমে কচি পাঁঠার হাড় চিবোতে আরম্ভ করলেন। নলিনীদা ইশারায় বললেন, "জল।" জল খেয়ে তিনি আর কথা বলতে পারছেন না। একি! চোখ যে তাঁর উল্টে আসছে! তখনো সবাই তাঁর এই ভূমিকাকে অভিনযই মনে করে বসে আছি, কিন্তু হাতে ইশারায় তিনি বুঝিয়ে দিলেন গলার ভেতরে হাড় ঢুকেছে, ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। ক্রমশঃ দেখছি গলা ফুলে উঠছে। কারো আর খাওয়া হল না। তিন চার জনে ধরাধরি করে মেডিক্যাল কলেজমুখো ধাওয়া।

হায়রে অদৃষ্ট! এই একটু আগেই কিনা ঐ গলা বা কণ্ঠ দিয়ে গান বেরুচ্ছিল, "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।"

কার্টরোড ; কার্সিয়াং রেলষ্টেশন থেকে একটু নীচেই। ঘরে দোস্ত মশারফ হোসেন, দোস্তাইন আর আমি। গান গাইছি। প্রায় ঘণ্টাখানেক গাওয়ার পর বাইরের দরজা খুলতেই দেখি খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে, খদ্দরের ধুতি পরে মাথায় একঝাঁক বাবরী চুল সুদর্শন এক যুবক ঠিক আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, "কাকে চাই?" সুন্দর একটু হেসে বললেন, "কাউকেই চাই না। বড় মিষ্টি গান ভেসে আসছিল শীতের কুহেলী ভেদ করে এই ঘর থেকে, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম।" যাক্, ভদ্রলোককে ঘরে নিয়ে এলাম। নিজেই পরিচয় দিলেন, "আমি ফরিদপুরের লালমিয়া।".....তিনিও প্রায় মাসখানেক কার্সিয়াংয়ে ছিলেন। বেশ হৃদ্যতা হয়েছিল। বড়লোক। এক একদিন এক এক পোষাকে বের হন। পাহাড় থেকে সমতলভূমিতে নেমে গিয়ে দু'তিনমাস পরে খবরের কাগজে বিরাট খবর, ফরিদপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা দরদী জমিদার গ্রেফতার। বুঝলাম ব্যক্তিটি বন্ধুশ্রেণীয় হয়েছেন শিল্পীগোষ্ঠীকে সম্মান ও ভালোবাসা দিতে জানেন বলেই, দেশপ্রেমিক বলেও এবার মনের কোণে আর একটু জোরে আসন পেতে বসলেন। তারপর কলকাতার কর্মজীবনে বহু সহস্রবার তাঁর সাথে মেলামেশা। জমিদার-নন্দন আর আমার কাছ আপনি রইলেন না, 'তুমি'র পর্যায়ে এসে গেলেন। কত সভা-সমিতিতে তাঁর ডাকে ফরিদপুর গিয়েছি। তাঁর বাড়ীতে পুকুরে গোসল করা, রাতে বাসায় গানের আসর, সর্বশেষে মহাভোজের আসর, সবই স্মৃতির মণিকোঠায় আছে উজ্জ্বল হয়ে।

হাতেম আলী নওরোজী নামে এক কবি এসেছিল আমার জীবন-পথে বন্ধুরূপে কলকাতায় ঠিক যুদ্ধের সময়কার ঘটনা। তখন আমি বউবাজার স্যাভয় হোটেলে থাকি

চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক যুবক—কালো চেহারা—মুখে দাড়ি, আমার ঘরে এসে আদাব করে ঢুকলেন। বসতে বললাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কি দরকার ভাই?" হেসে বললেন, "কোনও দরকার নেই, বাংলার গীতশিল্পীকে দেখতে এলাম। জীবনে তিনটি জিনিষ দেখবার সাধ। দু'টি পূর্ণ হয়েছে, আর একটির জন্য আপনার কাছে এসেছি।" বললাম, "কি ব্যাপার ভালো করে খুলে বলুন।" তিনি বললেন, "কাজি নজরুলকে দেখবার ইচ্ছা ছিল তাঁকে দেখেছি, আলাপ করেছি। আপনার সাথে দেখা করে আলাপ করব ইচ্ছা ছিল, আজ পূর্ণ হল। আর তৃতীয়টি হচ্ছে কাননবালার সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় করব।' আমি অবাক হলাম। বললাম, "আমার সাথে এইটুকুমাত্র আলাপ করতে এসেছেন—ব্যস, এর পরেই কাননবালার কাছে যাবেন?" একটু হেসে বললেন, "না, কাননবালার কাছে আমি কি করে যাব, আপনি নিয়ে যাবেন আমাকে?" এইবার সত্যি হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম, "কাননবালার সাথে দেখা করতে হলে আজই তো হয় না, এর জন্য বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে।"

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক চলে গেলেন। ভাবলাম আপদ গেল, কিন্তু এরপর রোজ এসে আমাকে দস্তুরমত বিরক্তই শুরু করে দিলেন। "কৈ, কাননবালার কাছে তো নিয়ে গেলেন না?" আমি বললাম, "আপনি কি কাজ করেন?" বললেন, "কোনও কাজ করি না, কবিতা লিখি, সাহিত্য সাধনা করি।" "তা তো করেন, কি করে কলকাতায় চলে?" বললেন, "চলে একরকম করে তা দিয়ে আপনার দরকার কি?" সত্যি কথাই তো, জিজ্ঞেস করা ভালো হয়নি!

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, একবার না একবার তিনি চুপচাপ ঘরে বসে থেকে চলে যেতেন। একদিন কাজিদা আমাকে বললেন, "আচ্ছা আব্বাস, নওরোজী তোমার ওখানে যায়?" আমি বললাম, "কেন বলুন তো?" তিনি বললেন, "বড় ভালো ছেলে, আর আধ্যাত্মিক জগতে বেশ অনেকদূর অগ্রসর; কিন্তু ও আমার কাছে আর আসে না কেন বলো তো?" আমি বললাম, "আচ্ছা পাঠিয়ে দেব।" কাজিদা যখন বললেন আধ্যাত্মিকতা সমৃদ্ধ ওর জানাশোনা আছে, আমার একটু সম্ভ্রম জাগল।

আমার ঘরে এসেছেন নওরোজী।.......হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কোনো পীর ধরেছেন জীবনে?" বললেন, "ধরিনি তবে ধরব।" বললাম, "এমন কোনো কামেল লোকের দেখা পেয়েছেন?" বললেন, "খুঁজে বেড়াচ্ছি আজ দশ বারো বছর থেকে, কত সন্ন্যাসী, সাধুবাবা, পীর-আউলিয়ার সংগ, মাজার, গোরস্তান—নাঃ, সব জায়গায়ই শুধু বুজরুগি। খাঁটী মানুষ থাকে সংসারের ছাল গায়ে—চিনবার যো নেই।"—এই কথা বলে একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন! তারপর এক নাটুকে ব্যাপার। আমার ঘরের দরজাটা অকস্মাৎ বন্ধ করে দিয়ে আমার হাত দু'টো ধরে আঁখি ছল ছল করে বলে উঠলেন, "আমার মনে হয় কাননবালাকে যেমুহূর্তে দেখতে পাব সেই মুহূর্তে আমার দিব্যজ্ঞান খুলে যাবে।"

আমি বললাম, "দরজা খুলে দিন। বলেছি তো অপনাকে ঠিক নিয়ে যাব, তবে এজন্য প্রস্তুতি চাই। আপনাকে আরো কিছুদিন ধৈর্য ধারণ করে থাকতে হবে।"

এর সম্বন্ধে ভালো করে খবর নিয়ে জানতে পারলাম শিরাজীর বাড়িতে বহুদিন ছিলেন,

একরকম ঐ বাড়ীতেই মানুষ। সাহিত্য-চর্চার গোড়াপত্তন বা হাতে খড়ি হয়েছিল ঐ বাসাতেই। মারফতি লাইনও ঐখান থেকেই শুরু হয়েছিল, তারপর স্বদেশী আন্দোলনে জেল খেটে কলকাতার পথে পাড়ি দিয়ে ভবঘুরে জীবনযাপন করছেন। কিন্তু আমার কেমন যেন ভদ্রলোকের উপর দিন দিন একটা নতুন আকর্ষণের সৃষ্টি হতে লাগল। আমি ঘরে কাজ করছি, ভদ্রলোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে বসেই আছেন। কোনো কোনো সময় বিরক্ত হয়ে বলতাম, "আপনি যেতে পারেন এখন।" তিনি হয়ত হেসে বলতেন, "আপনার তো কোনো ক্ষতি করছি না।" একদিন বললাম, "কাননবালাকে যে দেখতে যাবেন, এই একগাল দাড়ি নিয়ে কি করে যাবেন? জানেন তো কাননবালার কত নাম, কত ষ্টাইলে থাকে সে। অন্ততঃ আপনার বেশভূষাও তো ভালো হওয়া দরকার।"

আশ্চর্য, তার পরদিন থেকে আমার এখানে যখন আসতে শুরু করলেন কে বলবে তিনি বাংলার দুঃস্থ কবি? সাদা ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবী, পাজামা, পায়ে পাম্পশু—দেখলেই মনে হয় জামাইবাবু! হোটেলে রোজ আসা-যাওয়া করায় অনেকের সাথে পরিচয়ও হয়ে উঠেছিল। এখন তাকে দেখলেই সবাই বলে উঠত, "এই যে জামাইবাবু যে!"

আমি আর একদিন বললাম, "হ্যাঁ পোষাক-পরিচ্ছদ ঠিক হয়েছে বটে, কিন্তু দাড়িটা না কাটলে কাননবালার কাছে—।" ব্যস, আমার সেফ্‌টি রেজর বের করে বলে উঠলেন, "দিন কামিয়ে, আমার দৃঢ় ধারণা কাননবালাকে দেখা মাত্রই আমার আত্মদর্শন ঘটবে।" আমি সেদিন সত্যি সত্যিই কাননবালাকে একখানা চিঠি দিলাম—

সুচরিতাষু—

"আপনাকে দেখবার জন্য এই ঋষি-তুল্য বন্ধুটি যাচ্ছেন, আশাকরি দেখা দেবেন।"

বলাই বাহুল্য কাননবালার সাথে দেখা করে এসে ভদ্রলোক কী কৃতজ্ঞতাটাই না জ্ঞাপন করতে লাগলেন! বললাম, "কি হল আপনার? কী দেখলেন, কেমন লাগল? আত্মদর্শনের কতদূর?" কি এক রহস্যময় দৃষ্টি যেন ওঁর চোখে আবিষ্কার করলাম। যেন সত্যি সত্যি ভদ্রলোক কোন এক অচেনা অজানা রাজ্যে চলে গেছেন। তন্ময় হয়ে শুধু বলতে লাগলেন, "রূপ, রস, গন্ধ—দেহাতীত! ওর চেয়েও সুন্দর আছে, কানন আর কতটুকু সুন্দর? পাব নিশ্চয়ই পাব তাকে।" আমাকে বললেন, "হ্যাঁ, এই তো কানন, যার জন্য বাংলা দেশ পাগল।"

যাক্, পরবর্তীকালে এই বন্ধুটি কাজিদার জীবনী লিখবার জন্য হিন্দুমুসলিম মারামারির সময়েও কলকাতায় হিন্দু-অধ্যুষিত জায়গায় গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করেও বহু সাহিত্যিকের কাছ থেকে কাজিদার সম্বন্ধে বহু লেখা সংগ্রহ করেন। সেগুলো ছাপিয়ে পুস্তক আকারে বের করবার আগেই ঢাকা এসে শুনতে পাই কলকাতার হাসপাতালে দুরন্ত বসন্ত-রোগে বেচারী দেহত্যাগ করেন। সে লেখাগুলো যে কার হেফাজতে আছে আজো তার হদিস বের করা গেল না।

বেনিয়াপুকুর লেনে থাকি তখন। সন্ধ্যায় বাসায় মিলাদ হবে। লোকজন আমন্ত্রিত। বাসার চাকরটা হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেছে সেদিন সকাল থেকে। বিকালে বাসার সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, চৌদ্দ পনের বছরের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কি রে, কি চাস? চাকুরী করবি?" ছেলেটি উত্তর করল, "জি হ্যাঁ।" তাকে বাসায় নিয়ে এলাম। কথাবার্তায় বেশ সভ্যভব্য ভদ্র মনে হল। নাম আমজাদ। কাজে ভর্তি হয়ে গেল তক্ষুণি।

বাজার খরচের পাই পাই হিসাব মিলিয়ে দেয়। একটা পয়সা বাঁচলেও বিবি সাহেবার কাছে ফেরৎ এনে দেয়। তারপর লক্ষ্য করছি, ঐটুকু ছেলে, পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজও পড়ে। ছেলেটির জন্য দিন দিন মায়া জমতে লাগল মনের কোণে। ভালোভাবে খাওয়া দাওয়া করে শরীরটা বেশ দিন দিন সুডোল হচ্ছে। গিন্নীর কাছে শুনলাম ভাতের ফেন গালা হলেই আমজাদ এসে সেই ফেন রেখে দেয়। পরে একটু লবণ মিশিয়ে সবটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলে। সে নাকি বলে, "ভাতের সার জিনিষগুলোই ফেলে দেন আপনারা।" আমি নিজে যখন গান গাই বা ছেলেমেয়েরা গান আরম্ভ করলে আমজাদ শত কাজ ফেলে দরজার আড়ালে বসে তন্ময় হয়ে শোনে।

ওর বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে অফিসে আমার আর্দালির কাজে ওকে ভর্তি করে নিলাম। মাস মাস যা মাইনে পেত সব টাকা আমার গিন্নীর কাছে জমা দিত। দু'বছর ধরে বেশ টাকা জমিয়েছে। অকস্মাৎ একদিন বিবিসাহেবার কাছে বলে, "টাকাগুলো দিন, আমার এক চাচাত' ভাই পার্ক সার্কাসে ব্যবসা করবে।" গিন্নী অনেক নিষেধ করেছিলেন, শোনে নি, পরে জানতে পারলাম টাকা নিয়ে তার ভাই চম্পট দিয়েছে।

কলকাতার দাংগার সময় স্ত্রীপুত্র সবাইকে কুচবিহারের বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছি। একদিন বেনেপুকুরের বাসার ছাদে গ্রীষ্মের রাতে ছেলেটাকে বললাম, "আমজাদ আমার গা হাত পা একটু টিপে দিবি, বড্ড ব্যথা করছে।" ছেলেটি আমার পা টিপছে। আকাশ নির্মেঘ, কিন্তু পায়ে কয়েকফোঁটা পানি পড়ল। পানি গরম। প্রথমে বৃষ্টিই মনে হচ্ছিল, পরে আমজাদের দিকে তাকিয়ে দেখি ছেলেটা অঝোরধারে কাঁদছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বাবা, কাঁদবার কারণ কি? কোন কথাই বলতে পারে না। কান্নার প্লাবন নেমেছে ওর চোখে। প্রায় আধঘণ্টা পরে সে ভাংগা গলায় বললে, "সাহেব, আমার এ কাঁদার কারণ আমি মুখ ফুটে বলতে পারব না, বড় লজ্জা করে। তবে—" এই পর্যন্ত বলে একখানা কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললে, "এইটা পড়বেন ঘরে গিয়ে।" আমার কৌতুহল আর থামে না। বলে উঠলাম, "নে বিছানাপত্র ঘরে নিয়ে বিছিয়ে দে, অনেকরাত ছাদে থাকতে নেই।"

আমজাদের লেখা পড়ে বাকী রাতটুকু আমার আর ঘুম হল না। তার ছোট্ট বুকে যে এত আশাকে সে এই দু'বছর কিভাবে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল সেইটে ভেবেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। তার লেখাতে ছিল, "আমি গরীবের ছেলে নই। বাবা নাই, মা আছেন দেশে। মা জানে আমি নিরুদ্দেশ হয়েছি। বড় আশা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি আব্বাসউদ্দীনের বাসায় চাকর হয়ে থাকতে হলেও তাঁর কাছে গান শিখব। কিন্তু এই দু'বছর ধরে বলি বলি

করেও বলতে পারি নি, জানি না চাকরকে আপনি গান শেখাবেন কিনা।" এইসব লিখে তারপর এক সুন্দর কবিতা!!

সক্কালে উঠেই আমজাদ আমার ঘরে চা নিয়ে এল। আমি বলে উঠলাম, "হারমোনিয়ামটা এই দিকে নিয়ে আয়। বোস্ আমার কাছে।" সংকোচে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, "আমার বিছানার ওপর আমার পাশে বোস্। তোকে চাকর মনে করব না আজ থেকে, আমার ছেলের মত করেই তোকে গান শেখাব।" ছেলেটি কী আদব-কায়দা দুরস্ত, তখুনি আমার পা ছুঁয়ে সালাম করে উঠল। আমিও অপত্যস্নেহে তাকে সিঞ্চিত করলাম। বললাম, "একখানা গান যে কোনরকমের গা দেখি।" আমার বহুগান ইতিমধ্যে তার কণ্ঠস্থ হয়েছে। সে গানের পর গান গেয়ে চলল। চোখে মুখে স্বর্গীয় আনন্দের আভা ফুটে উঠেছে। প্রতি গানের আরম্ভে এবং শেষে তার মনে গায়ক হবার আশার নব নব সূর্য আলো বিকীরণ করছে।

আমি তার আশা-আলোকোজ্জ্বল তরুণ প্রাণে আর একটু আশার বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বললাম, "বেশ বাবা বেশ, এবার দুলু, তুলু, মীর্ণা বাড়ী থেকে এলে ওদের সাথে তুই বস্বি একসাথে গান শিখতে।"

বাড়ীতে গিন্নী নেই, সেই বর্তমানে পাচক এবং আমার সাথেই যখন অফিসে যায় তখন আর্দালির পোষাক পরে সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামে ওঠে।

আমজাদের গান শোনার পর থেকে আমার মনে তিলমাত্র শান্তি নেই। সে যে আমার শান্ত মনের গহীন গাঙে কী অশান্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তা কি করে বোঝাই? আমার বহু গান সে মুখস্থ করেছে বটে, কিন্তু সেসব গানের একটা লাইনও যে সুরসমেত তার কণ্ঠে ক্ষণস্থায়ী আসন পেতে বসবার জন্য নারাজ, এ তাকে কি করে বলব? কাজেই অপেক্ষা করতে লাগলাম ছেলেমেয়েরা বাড়ী থেকে কলকাতা আসা পর্যন্ত। অবশেষে তারা আবার কলকাতায় এল এবং এক সন্ধ্যায় ওদের সবাইকে নিয়ে হারমোনিয়ামের পাশে বসা গেল। আমজাদকে বললাম, "তুমি একটু লক্ষ্য করে যেয়ো তো, এই গানটা এরা কিভাবে গাইছে, তুমিও ঠিক অমনি করে গাও।" কিন্তু এদের গলা যখন শ্যামবাজারের সিধে রাস্তায় চলেছে আমজাদের কণ্ঠ তখন রাধাবাজারের অলিগলি ঘুরেও পথ খুঁজে পায় না। হায়রে সুর জিনিষটা যে আল্লার নেয়ামত। সুরজ্ঞান যার নেই তার পেছনে লক্ষ টাকা খরচ করে শত শত কোকিল বেটে খাওয়ালেও কিছুতেই তার অসুরত্ব ঘুচবে না যে!

আমজাদ বুঝল তার গান হবার নয়। তাই সে বৃথা কসরৎ ছেড়ে দিয়ে একদিন গিন্নীর কাছ থেকে তার বাকী পাওনা নিয়ে অলক্ষ্যে কেটে পড়ল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হিজ মাষ্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানী যন্ত্রপাতি নিয়ে এল নারায়ণগঞ্জ ইউরোপীয়ান ক্লাবে। ঢাকায় রিহার্সেলের ভার দিল আমার উপর। কুচবিহার থেকে ভাওয়াইয়া গানের জন্য কয়েকজন শিল্পীকে আনা হল। আমার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাওয়াইয়া গানের কবি আবদুল করিম তখন কুচবিহারে, তাকেও আনালাম। ভাওয়াইয়া গান ছাড়াও একখানা ভাওয়াইয়া পালা গান ঠিক করলাম, তাতে আমার ছেলে মেয়ে, ভাই,

স্ত্রী, আমি এবং বেদারউদ্দীন আহ্‌মদ এই ক'জনেই অভিনয় করেছি। পালা গানটির নাম 'মহুয়া সুন্দরী'।

হবিবুল্লা বাহার তখন মন্ত্রী। কলকাতার গ্রামোফোন কোম্পানীর হেমচন্দ্র সোম মশায় আমাকে বলে গেলেন বাহার সাহেবের একটা বক্তৃতা রেকড করাবার জন্য। বাহার সাহেবকে বললাম। সাহিত্যিক মানুষ, রাজী হয়ে গেলেন। সময় দিলেন, পাঁচ দিনের মধ্যেই তিনি তাঁর বক্তৃতাটা লিখে ফেলবেন। রোজই গিয়ে তাকে মনে করিয়ে দিই, কিন্তু তাঁর সময় কোথায়? দশ বারো দিন পর তিনি বললেন, "হ্যাঁ, কাল রেকর্ড করার জন্য নারায়ণগঞ্জ যাব।" আমি বললাম, "তাহলে মেহেরবাণী করে বক্তৃতাটা একটু পড়ুন। এই যে ষ্টপ ওয়াচ নিয়ে এসেছি, সময়টা ঠিক করে নিই, কারণ সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে বক্তৃতা শেষ করতে হবে তো।" তিনি বললেন, "ঠিক আছে, কাল ষ্টুডিওতে গিয়েই ঠিক করে নেব।"

তার পরদিন সাত আট জন শিল্পীর রেকর্ড করার দিন এবং বাহার সাহেবেরও। অন্যান্য আর্টিষ্টদের বললাম, "আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, বাহার সাহেবের রেকর্ডখানাই আগে করে নিই।" বাহার সাহেবকে বললাম, "এবার পড়ুন, আমি ঘড়ি ধরে টাইমটা—।" তিনি হেসে বললেন, "আরে দূর বক্তৃতা কি আর লিখেছি, এই আরম্ভ করলাম লিখতে—" বলেই তিনি কাগজ-কলম বের করলেন।

আমি হাসব কি কাঁদব—কি বা আর বলতে পারি? তিনি বললেন, "আপনি অন্য শিল্পীদের গান রেকর্ড করতে থাকুন, এই ধরুন ঘণ্টা দুয়েকের ভেতরেই আমার লেখা হয়ে যাবে আর কি!"

সময় তো আর নষ্ট করা চলে না। শিল্পীদের মাইকের সামনে বসিয়ে দিয়ে যন্ত্র-বাজিয়েদের পজিশন-মত বসানো হল। ফাইন্যাল রেকর্ডিংয়ের আগে দু'একবার রিহার্সেল দিতে হয়। যেই রিহার্সেলের যন্ত্রপাতি বেজে উঠেছে, বাহার সাহেব অন্য ঘর থেকে ছুটে এসে আমাকে বললেন, "এই একটু খানিক, ধরুন মিনিট বিশেক একটু চুপ করলে হয় না, এমন গানবাজনার শব্দ এলে তো লেখাটা—।" কি আর করি বন্ধ রাখলাম। মনে পড়ল কাজিদার কথা। কলকাতা রিহার্সেল রুমে সুর আর অসুরের দাপাদাপি তার ভেতর নির্বিকারচিত্তে লিখে চলেছেন কাজিদা। একদিন ধীরেন দাস কাকে যেন গান শেখাচ্ছিলেন, কাজিদাও সে ঘরে বসে বেশ খানিকক্ষণ গান শুনছেন, তারপর তিনি কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসলেন। আমি আস্তে বললাম, "ধীরেন দা, আঃ, থামুন না দেখছেন না কাজিদা গান লিখছেন।" কাজিদা শুনতে পেয়েছেন। বলে উঠলেন, "আরে না না—গান চলুক। স্রষ্টা কি হট্টগোলেও তার সৃষ্টির কাজে এক মিনিটও বসে থাকে? তোমরা কাড়ানাকাড়া বাজালেও আমি যখন ডুব দেব তখন এগুলোর শব্দ আমার কানের কাছে এসে ওরাই বধির হয়ে যাবে।"

কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম বাহার সাহেবের ব্যাপার দেখে। সত্যি সত্যি আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, "একবার শুনুন দেখি লেখাটা।" কি চমৎকার। এত অল্প সময়ে এমন অভিনব বক্তৃতা লিখে আমাকে তাক লাগিয়ে দিলেন, যেমনি ভাষা তেমনি তার বিষয়বস্তু।

আধ ঘণ্টার ভেতরেই তাঁর রেকর্ড হয়ে গেল। আমি বললাম, "এটা তো আর গবর্ণমেন্টের প্রোপাগাণ্ডা বক্তৃতা নয়, কাজেই আপনার সাথে কোম্পানীর একটা কন্ট্রাক্ট হওয়া দরকার এবং এজন্য পাঁচ পারসেন্ট রয়্যালটির ব্যবস্থা করে দিই।" তিনি রাজী হলেন।

জয়নুল আবেদীন রেডিও পাকিস্তান ঢাকার রিজিওনাল ডিরেক্টর। শিল্পী হিসেবে রেডিওতে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন আমাকে। রেডিওতে তাঁর কাজকর্ম দেখে যখন তিনি প্রোগ্রাম এ্যাসিষ্টান্ট তখন থেকেই প্রায়ই বলতাম, "আপনার কিন্তু এ চাকুরী নয়, এর চেয়েও বড় পোষ্ট আছে ভাগ্যে।" তাই যেদিন তিনি রেডিওর ডিরেক্টর হলেন সেদিন অভিনন্দন করতে গিয়ে বলেছিলাম, "হ্যাঁ আমি খুশী বটে, কিন্তু এর চেয়েও বড় চাকুরী আপনার অদৃষ্টে আছে।" এরপর একদম ডিরেক্টর পাবলিসিটি। সেদিন বলেছিলাম, "আজ একটা চাকুরীর মতো চাকুরীতে এলেন বটে, কিন্তু কে জানত যে আপনি আমার বস হবেন।" তিনি সেদিন বলেছিলেন, "আপনি আমাকে দোওয়া করবেন, আপনাকে মুরুব্বীর মতোই শ্রদ্ধা করি।" এই সম্বন্ধও কোনদিন তিনি নষ্ট করেন নি। তাঁর কর্মদক্ষতার গুণে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে গেজেটেড পোষ্টে আজ এতগুলো লোক—তিনিও তাঁর পদমর্যাদাকে তুলেছেন জয়েন্ট সেক্রেটারীর র্যাংকে, এটা কম কৃতিত্বের নয়। তা ছাড়া এত শীঘ্র একটি জিনিষ বুঝে তার নোট দেওয়া, সব কাজ শেষ করে ফেল, এককথায় এ গুণ শুধু দু'টো লোকের ভেতর দেখেছি—এক প্রাক্তন 'ডন' সম্পাদক মিঃ আলতাফ হোসেন আর জয়নুল আবেদীন।

জয়নুল আবেদীন ব্যক্তিগতভাবে আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন। ম্যানিলা সংগীত সম্মেলনে তিনিই আমাকে প্রতিনিধিদলের নেতা করে পাঠিয়েছিলেন ১৯৫৫-এ। তারপর ১৯৫৬-তে আন্তর্জাতিক লোকসংগীত কাউন্সিলের অধিবেশনে তিনিই আমার নাম প্রস্তাব করেন ফাইলে। শুধু তাই নয়, আমার অসুস্থ অবস্থায় বাড়ী থেকে অফিসের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য অনুমতি দিয়ে তিনি আমাকে যে কৃতজ্ঞতা-পাশে বেঁধেছেন তার জন্য আমি আজীবন তাঁর কাছে ঋণী। খোদা তার মংগল করুন।

আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে কলকাতায় আমার বাসায় এক ভদ্রলোক এসে আমায় বললেন, "আপনার সাথে পরিচিত হতে এলাম। আপনার গানের আমি একজন ভক্ত।" ....অনেক আলাপ-আলোচনার পর ভদ্রলোক বললেন, "দয়া করে আমার বাসায় একদিন আসবেন, আমার মেয়েরা গান গায়, ওদের গান শুনে আপনি ওদের গান শেখাবার বন্দোবস্ত করে দেবেন।" যথাসময়ে একদিন তাঁর বাসায় এলাম। ছোট ছোট ফ্রক-পরা তিনটি মেয়ে কাছে এল। মেজোটির বয়স এই ছ'সাত বছর হবে। বললাম, "খুকী একটা গান শোনাও তো।" খুকী অমনি হারমোনিয়ামটা ধরে দিব্যি বেশ দরাজ কণ্ঠে একখানা বাংলা গান ধরল। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম, গলাটি বড় সুরেলা। মেয়েদের গান শুনে আমি ওদের বাবাকে বললাম, "দেখুন আপনার মেজো মেয়েটিকে যদি সত্যি সত্যি গান শেখান তবে ভবিষ্যতে খুব নামকরা শিল্পী হবে। তবে আমার অনুরোধ মেয়েকে আধুনিক, রবীন্দ্র-সংগীত এসব না শিখিয়ে উচ্চাংগ-সংগীত যথা ধ্রুপদ, খেয়াল এইগুলো শেখাবেন।"

দু'মাস পরে ভদ্রলোক আমার বাসায় আবার হাজির। বললেন, "ভাই বড় আশা করে কলকাতায় এলাম, কিন্তু থাকা হল না, চাকুরীজীবীর ভাগ্যে সুখ কোথায়? আমাকে ঢাকায় বদলি করেছে, কাজেই ঢাকায় যেতে হচ্ছে।" আমি বললাম, "আপনার কথা শুনে সত্যিই দুঃখিত হলাম, কিন্তু মনে রাখবেন মেয়েকে ঢাকায় বড় ওস্তাদকে দিয়ে ক্ল্যাসিকাল গান শেখাবেন।"

কলকাতার জনস্রোতে ভদ্রলোক একদিন তাঁর হৃদয়ের আশা-তরণী ভাসিয়ে দিয়ে আমার কথার ঘাটে এসে ভীড় জমিয়েছিলেন। আবার কর্মস্রোতে ভাসতে ভাসতে বুড়িগংগার তীরে এসে তিনি তাঁর জীবন-নৌকার নোঙর ফেলেছেন। এরপর কালস্রোত স্মৃতির টুকরোগুলোকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে জানি না।

ঢাকায় রেডিও স্টেশন খুলেছে। কলকাতা থেকে ঢাকা রেডিওর গান-বাজনা শুনবার মওকা আর পাই না। দু'একজন বন্ধুবান্ধবের কাছে শুনি, "ওহে ঢাকা রেডিও থেকে একটি মেয়ে বেশ গাইছে, মেয়েটির নাম লায়লা আর্জুমান্দ।" আমি মনে মনে পুলকিত হই এই ভেবে যে একটি মুসলমান মেয়ে গানে নাম করেছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছু আগে ঢাকায় আসি। এক ভদ্রলোক একদিন আমার নারিন্দার বাসায় এসে হাজির। আস্‌সালামো আলায়কুম, ওআলায়কুম আস্‌সালাম। "চিনতে পারলেন না? ভদ্রলোক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। আমার স্মৃতিশক্তিকে মনে মনে অজস্র ধিক্কার দিতে দিতে অতি সলজ্জ কণ্ঠে বললাম, "মাফ করবেন, মনে করতে পারছি না আপনাকে।" তিনি বললেন, "আমি তৈফুর, মনে নেই কলকাতায় আমার মেয়ে লায়লা..... ." আর বলতে দিলাম না। তাঁর হাত ধরে মাফ চাইলাম। গদগদ কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, "আপনার উপদেশমত ঢাকায় এসে লায়লাকে ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খাঁর হাতে ওকে মানুষ করবার জন্য তুলে দিয়েছি।" আমি বিস্ময়বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলাম, "লায়লা, সেই ফ্রক-পরা ন্যাড়ামাথা লায়লা—আজ অপূর্ব কণ্ঠের অধিকারিনী? যাক, মেয়ে এখানে কাছে নেই কাজেই প্রশংসা করছি। কলকাতা থেকে বহু বন্ধুবান্ধব এই মেয়ের গলা ও গানের অজস্র তারিফ করেছে আমার কাছে; কিন্তু কতদিনের কথা বলুন তো, আমি ওর নামটা ভুলেই গিয়েছিলাম। কাজেই কলকাতায় থাকতে ঢাকা রেডিওর যশস্বিনী লায়লা যে আপনারই সেই ন্যাড়া-মাথা ফ্রক-পরা লায়লা তা কি করে মনে হত বলুন?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ এতদিন থেকে ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খাঁর কাছেই খেয়াল ঠুংরী শিখে আসছে। এখন রেডিওতে সব রকম গানই গাইছে।"

রেডিওতে যাই, একটা জিনিষ লক্ষ্য করি কোনো ব্লক প্রোগ্রামের জন্য প্রডিউসার লায়লাকে গান শেখাতে বসেছেন, লায়লা একটা গান একবার বেশী জোর দু'বারেই ঠিক তুলে নিল তার কণ্ঠে। শুধু তাই নয়। শিক্ষকের কাছ থেকে সুরের কাঠামোটি তুলে নিপুণ শিল্পীর মত সেই সুরের কাঠামোর চারধারে সুরের জাল বুনতে বসল। তাইতে লায়লার কণ্ঠের গান হয়ে ওঠে অনবদ্য।

পশ্চিম পাকিস্তানে কোন একটা ফিল্মে প্লে-ব্যাক গাইবার জন্য লায়লার আমন্ত্রণ এল।

তৈফুর সাহেব একদিন লায়লাকে নিয়ে এলেন আমার বাসায়। বললেন, "ভাই দু'চারখানা পল্লীগীতি শিখিয়ে দিন, পশ্চিম পাকিস্তানে এই দিককার দু'চারখানা গান জানা থাকলে ভালো হয়।" একঘণ্টার মধ্যে প্রায় সাত-আটখানা গান শিখে ফেললে। সত্যি আমি অবাক হয়ে গেলাম ওর প্রতিভা দেখে।

লায়লা একবার তুরস্কে গেল পাকিস্তানের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধিদলের সাথে। তুরস্ক থেকে এ, ও, সে নিয়ে এসেছে হরিযালি কিসিমের জিনিষ, কিন্তু লায়লা এনেছে ওখান থেকে ডজন খানেক ওদেশের গ্রামোফোন রেকর্ড।

বাংলা, উর্দু, ফারসী সব ভাষায় গান এবং বিভিন্ন দেশের সুরও এত সহজে সে করায়ত্ত করতে পারে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

চীনা সাংস্কৃতিক মিশনের নাচগান দেখার জন্য একদিন গিয়েছিলাম। পাঁচ টাকার আসন—মঞ্চ থেকে বহু দূরে। নাচ কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না বললে অত্যুক্তি হবে না, কিন্তু চীনা মেয়েরা যখন আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের একটি বিয়ের গান বিশুদ্ধ তালে মানে উচ্চারণে গেয়ে উঠল, তখন মনে পড়ল লায়লার কথা। সে তখন অসুস্থা। ভালো থাকলে চীনা শিল্পীদের গান শিখে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে চীনা শিল্পীদের অভ্যর্থনা জানাত ঠিক তাদেরি গান দিয়ে।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বহুবার বহু ডেলিগেশন এসেছে, অনেক উজির-নাজির এসেছে, ইরাণ থেকে প্রতিনিধি এসেছে, লায়লার উর্দু-ফারসী গজলের বিশুদ্ধ উচ্চারণভংগী দেখে সবাই একবাক্যে স্বীকার করে গেছেন, অপূর্ব প্রতিভার স্বাক্ষর বয়ে নিয়ে চলেছে এই প্রখ্যাতনাম্নী শিল্পী।

শুধু তাই নয়, খেয়াল, ঠুংরী, গজল, গীত, কীর্তন, আধুনিক বাংলা গান, ভজন, পল্লীগীতি, রবীন্দ্র-সংগীত, নজরুল-গীতি—গানের সব বিভাগেই লায়লার অপূর্ব দক্ষতা।

বেসুরো জিনিযকে লায়লা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করতে পারে না। রেডিওতে একদিন মিলাদুন্নবী প্রোগ্রাম হচ্ছে। নাতে রসুল, গজল গেয়ে চলেছে লায়লা, আমিও গাইছি। এরপর হযরতের জীবনী আলোচনা করে চলেছেন একজন, মাঝে মাঝে সমস্বরে আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা দরুদ পড়ার ব্যবস্থা। মাইক্রোফোন চালু, দরুদ পাঠ হচ্ছে। এর মধ্যে এক ভদ্রলোক এমন বেসুরোভাবে দরুদ পড়লেন দেখে আমি লায়লার দিকে শুধু একবার তাকিয়েছি, আর যায় কোথায়? মুখে রুমাল গুঁজে খুক খুক করে হাসছে লায়লা। শুধু ওতেই যদি পরিসমাপ্তি ঘটত তাহলেও রক্ষে। তার ভেতরকার হাসি আর কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারছে না। ষ্টুডিও থেকে ছুটে বাইরে গেল। মিলাদ শেষ হলে সে যখন ষ্টুডিওতে ঢুকল আমিও উচ্চহাসিতে ষ্টুডিও মাতিয়ে তুললাম। অন্যান্য সবাই তো অবাক, হাসির এতে কি আছে? আমি বললাম, "এবার সবাই দরুদ পড়ুন তো।" সেই বেসুরো ভদ্রলোকও যোগ দিলেন—সবাইকে দেখিয়ে দিলাম, "দেখুন, এঁর গলা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে।" তখন সবাই বুঝল হাসির অর্থ কি!

এই দরুদ পড়ার প্রসংগে একটা কথা মনে হল—ইউরোপে কম্যুনিটি সং বলে একরকমের গান আছে। সে সব গানের একটা কলি কেউ কোন থিয়েটার হল বা যে কোন জায়গায়

আওড়ালে সবাই মিলে গাইতে থাকে। আর এ গাওযাটাও সমতালে সমলয়ে। সাধারণতঃ এসব জাতীয়তাবোধক গান এবং গীর্জায় উপাসনার গান। লক্ষ লক্ষ লোক একসাথে এসব গান গায়।

১৯৫৫ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সংগীত সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনি হিসাবে মোহম্মদ হোসেন, লায়লা আর আমি ম্যানিলায় যাই। যাবার দিন ওর বাবা তৈফুর সাহেব আমাকে বললেন, 'ভাই একটু দেখবেন, লায়লা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বড় উদাসীন।"

ম্যানিলা হোটেল। তিন জনে এক টেবিলে বসে খাচ্ছি। লক্ষ্য করছি আমরা যা খাই তার সিকিভাগও লায়লা খায় না। বললাম, "এত কম খেলে বাচবে কি করে?" সে বলে যে বেশী খেলে গলা খারাপ হবে যে!" আমি বললাম, "বেশী খেলে গলা খারাপ হয় কে বললে তোমাকে? তবে হ্যাঁ গান গাইবার আগে স্বল্প আহার করতে হয়।" জোর করে তখন এটা খাও ওটা খাও বলে হুকুম চালাতে লাগলাম।

গান গাইবার সময লায়লা খুব আন্তরিকতার সাথে গান গায। এইটাই সত্যিকারের শিল্পীর লক্ষণ। একদিন লায়লাকে বললাম, "আচ্ছা, রেডিওতে তুমি যখন গাইতে শুরু কর তখন মাঝে মাঝে যন্ত্রপাতি-বাজিয়েদের বাজাবার সুযোগ দাও না কেন? তাতে তুমিও তো একটু বিশ্রাম পাও!" সে বললে, "তাহলেই হয়েছে আর কি' আমি গানটা ছাড়লাম হয়ত 'নি'-তে যন্ত্রীরা এর পর যখন যন্ত্র নিয়ে 'পা'-তে দাঁড়াবে তখন আমি কোথায় যাই বলুন?"

আর একটা বড় জিনিস। সেটা হচ্ছে শিল্পী যদি গানের বাণী সম্পূর্ণ হৃদয়ংগম করতে না পারে তাহলে তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবে কি করে? এদিক দিয়েও লায়লা উচ্চশিক্ষিতা— এম. এ. পাশ। রীতিমত লেখাপড়া চালিয়ে গান বাজনার সাধনা অব্যাহত রাখা এ-ও কম কৃতিত্ব নয়। কাজেই গানের বাণীকে সুরের মূর্ছনায় দোলা দেওয়া উচ্চশিক্ষিতা সুর-সাধিকার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

বহু কবি. শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী, সাংবাদিক, যন্ত্রশিল্পী— এঁদের সাথে আজীবন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি। এঁদের সবার কথা সবিস্তারে বলতে ইচ্ছা হয়. কিন্তু শারীরিক দিক থেকে আমি অক্ষম। তাই শুধু সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁদের নামগুলো লিখে গেলাম। আমি যে তাঁদের আজো ভুলিনি শুধু সেইটুকু এঁরা মনে রাখবেন, এই কামনা।

কবি ও আমার শৈশবের শিক্ষক, আজীবন শুভাকাঙ্ক্ষী ডাঃ সেরাজুদ্ দাহার, বিখ্যাত ক্ল্যারিওনেট-বাজিয়ে বা বাঁশুরিয়া নৃপেন মজুমদার, গোপাল লাহিড়ী, রাজেন সরকার, ত্রিপুরা-ফ্লুট-বাজিয়ে বাজাবাবু, চানু, পরেশ ভট্টাচার্য, কেরামত আলী খাঁ, বেহালা-বাজিয়ে পরিতোষ শীল, ম্যাণ্ডোলিন-বাজিয়ে টোপাবাবু, সুরশিল্পী কমল দাশগুপ্ত, চিত্ত রায়, হিমাংশুকুমার দত্ত সুরসাগর, অনিল ভট্টাচার্য, গিরীণ চক্রবর্তী, পঙ্কজকুমার মল্লিক, অহীন্দ্র চৌধুরী, নট-সূর্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, জহর গাংগুলী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, ভূমেন রায়. মন্মথ রায়, প্রণব রায়, অসিত, জয়নারায়ণ,

তুলসী লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্তী, ওস্তাদ গিরিজা চক্রবর্তী, নরেশ মিত্র, বিধায়ক ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, মনোজ বসু, শৈলেন রায়, অনুপম ঘটক, নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত, শচীন সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, রবীন চ্যাটার্জী, কাননবালা, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, আশ্চর্যময়ী, হরিমতী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, শচীন দাস, মতীলাল, রেণুকা রায়, সরযূবালা, রাণীবালা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, উমাপদ ভট্টাচার্য, ধীরেন দাস, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি ঘোষ, ভবানী দাস, চন্দ্রাবতী, কঙ্কাবতী, রাজলক্ষ্মী, উমাশশী, তকরীম আহমদ, চিন্ময় লাহিড়ী, বাঁশরী লাহিড়ী, নীলিমা সান্ন্যাল, প্রমথেশ বড়ুয়া, সুধীরলাল চক্রবর্তী, সুপ্রভা সরকার, কল্যাণী দাস, যূথিকা রায়, বিজন ঘোষ দস্তিদার, দক্ষিণারঞ্জন ঠাকুর, অনাথ বসু, জ্ঞান গোস্বামী, কে. এল. সাইগল, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, শৈল দেবী, ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁ, আবদলু করীম (বালি), ওস্তাদ এনায়েত খাঁ, মেহেদী হোসেন, আবদুল গফুর খাঁ, ডাঃ সুরেশ চক্রবর্তী, তারাপদ চক্রবর্তী, ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু, জ্ঞান দত্ত, প্রবোধকুমার সান্ন্যাল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, এস. ওয়াজেদ আলী, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, কবি বন্দে আলী মিঞা, ওস্তাদ রবিশঙ্কর, তিমিরবরণ, জগন্ময় মিত্র, তালাত মামুদ, ওস্তাদ ছোটে খাঁ, প্রফুল্ল রায়, অনাদি ঘোষ দস্তিদার, বিপিন গুপ্ত, কালোবরণ দাস, সন্তোষ সেনগুপ্ত, রতনবাবু, গল্পদাদু, রবীন মজুমদার, নীতিশ এবং আরো অনেকে।

'আল্লা মেঘ দে পানি দে' গানখানা বহুবার গেয়েছি। যতদিনই গেয়েছি, গানের শেষে 'ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে' উপাখ্যান বা প্রবাদ-বাক্য কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার একটী ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন্ লাই ঢাকায় এলেন। আমরা এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গুলিস্তান সিনেমা হলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাই। সন্ধ্যা সাতটায় নাচ-গান আরম্ভ হল। রাত ন'টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানে আমি 'আল্লা মেঘ দে পানি দে' গানখানি পরিবেশন করেছিলাম।

অনুষ্ঠান শেষে প্রতিটি শ্রোতা হলের বাইরে এসে থমকে দাঁড়ালেন। বাইরে আরম্ভ হয়েছে ঝমঝমাঝম বৃষ্টি। অথচ প্রেক্ষাগৃহে যখন সবাই ঢুকছিলাম তখন ছিল তারকাখচিত নির্মল আকাশ।

মিঃ চৌ এন্ লাই ঢাকা পরিত্যাগের পূর্বমুহূর্তে বিমানঘাঁটীতে বলে গিয়েছিলেন, "এদেশের অনেক কিছুই হয়ত ভুলে যাব কিন্তু স্মৃতির মণিকোঠায় একটি চিত্র বহুদিন দাগ কেটে থাকবে। সেটা হচ্ছে—তোমাদের দেশের শিল্পী গান দিয়ে আকাশের পানি আনতে পারে।"

।। রোগশয্যায় ডাইরী থেকে ।।

২১শে মার্চ ১৯৫৯

সামান্যতম অনুগ্রহভিখারী হতে চাই না কারুর কাছে। গবর্ণমেন্টের স্বীকৃতিই জীবনে অনেকের কাম্য হতে পারে, কিন্তু আমি জীবন-ভর চেয়েছিলাম দেশবাসীর স্বীকৃতি। সে স্বীকৃতি কি পাই নি? গবর্ণমেন্টের পরিচালক আজ এ-মন্ত্রী, কাল ও-মন্ত্রী, পঞ্চাশ বছর পর অন্য মন্ত্রী হবে, কিন্তু দেশের জন্য আমার যদি কিছু অবদান থাকে তাহলে দেশবাসী কিছুতেই তা ভুলবে না। শতাব্দীব পব শতাব্দী ধরে তারা শ্রদ্ধার সাথে ভালোবেসে তা স্মরণ করবেই।

নজরুলের ইসলামী গান দিয়ে যদি বাংলার মুসলমানকে জাগিয়ে থাকি, হৃতসর্বস্ব চাষী ও মাঝির কণ্ঠের গানকে যদি ভদ্রসমাজে পরিবেশন করে তাদের পাংক্তেয় করে রাখি, সর্বশেষে যদি আমার পল্লীমায়ের মেঠো সুরকে বিশ্ব-সংগীতসভায় শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে থাকি, তাহলে দেশ, জাতি, জনগণ কিছুতেই আমাকে ভুলবে না।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

....শরীর দিন দিন দুর্বল। ডান হাতও দুর্বল। কথা তো বলতেই পারি না। ডান হাত গেলে মনের কথা কালির আঁচড়ে আর বলতে পারব না।....

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

......সারাদিনরাত শুয়ে শুয়ে আর ভাল লাগে না। কি সুন্দর আস্তে আস্তে অজানা দেশে চলেছি। কারো ক্ষমতা নেই সে দেশ যাওয়া থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে।......চলমান দুনিয়ায় কোনো শক্তি নেই সেই মহা আকর্ষণ থেকে কোনো উপায়ে ঠেকিয়ে রাখে।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

......দু'দিন পরে আমি যখন এ-ধরার আনন্দ কোলাহল থেকে চিরদিনের মতো চলে যাব তখন তো দুনিয়াই আমাকে ভুলে যাবে। চিরকাল জেগে আছে এবং থাকবে শুধু আকাশের ঐ চন্দ্রসূর্য অগণিত তারকা সজাগ প্রহরীর মত। চলমান হয়ে থাকবে আলো-বাতাস, দখনে হাওয়া, পাখীর কলতান, কুলকুলুনাদিনী স্রোতস্বতী—আমার, এর, তার বাগানের হাসনুহেনা, যুঁই, চামেলী। এরা ফুটবে—ঝরবে—আবার ফুটবে। আমি ফুটেছিলাম—দিন কয়েক হেসেছিলাম—এবার ঝরার পথে—ঝরব, কিন্তু আর ফুটব না।।